ডঃ ফজলুর রহমান

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব

১৯৪৭-৭১

১৯৯০ সালে আমার পিএইচডি অভিসন্দর্ভ Culture Conflicts in East Pakistan, 1947-1971 (A study in the attitude of Bengali Muslim Intelligentsia towards Bengali literature and Islam)টি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে সুধী পাঠকমহল বইটির অনুবাদ প্রকাশের জন্য তাগাদা দিয়ে আসছিলেন। পাঠকদের আগ্রহ দেখে আমিও বইটির অনুবাদ প্রকাশে অনুপ্রাণিত হই। কিন্তু নানা কারণে এতদিন তা সম্ভবপর হয়নি।

বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব মুহাম্মদ বাকের হোসাইন অক্লান্ত পরিশ্রম করে বইটির অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। অন্যদিকে কম্পোজ থেকে শুরু করে মুদ্রণ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের যাবতীয় কাজগুলো অত্যন্ত যত্নের সাথে সম্পন্ন করেছেন এ জেড কম্পিউটারের স্বত্বাধিকারী জনাব আবুল কালাম আজাদ। আমি তাদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বইটিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পূর্ব যে সব ঘটনা আলোচিত হয়েছে তা পাঠক হৃদয় বিশেষ করে সংস্কৃতি সেবীদের আকৃষ্ট করবে বলে আমি আশাবাদী।

-ডঃ ফজলুর রহমান

www.pathagar.com

জিন্নাহ এবং তার অনুসারীরা মনে হয় উপলব্ধি করেননি যে ভূগোল তাদের বিপক্ষে। .....দুই অঞ্চলের (পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তান) মধ্যে কোন ক্ষেত্রেই বাস্তব যোগাযোগ নেই। একমাত্র ধর্ম ছাড়া দুই অঞ্চলের জনগণ সবদিক দিয়ে পরস্পর থেকে ভিন্ন। ধর্মীয় সাদৃশ্য ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিকভাবে পৃথক বিভিন্ন অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে এমন কথা বলা জনগণের সাথে একটি বড় ধরনের প্রতারণার শামিল। ....পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান তাদের সব পার্থক্য দূরীভূত করে একটি জাতি গঠন করবে এমন আশা কেউ করতে পারে না।

- মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

...প্রশ্ন হচ্ছে তারা কোন সংস্কৃতি অনুসরণ করবে– ইতিহাস নির্ধারিত ভাষাভিত্তিক স্থানীয় সংস্কৃতি নাকি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রাজনৈতিক-ভাবে নির্ধারিত ইসলামী ধারণাভিত্তিক সংস্কৃতি? এই প্রশ্নে সৃষ্ট বিরোধে ভাষাভিত্তিক বিবেচনা ধর্মীয় বিবেচনাকে ছাড়িয়ে যায়। এতে আঞ্চলিক সত্তা জোরদার হয় এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে তা পরিণতি লাভ করে।

-লেখক

www.pathagar.com

তৎকালীন
পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব
(১৯৪৭-৭১)

(বাংলা সাহিত্য ও ইসলামের প্রতি বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গির সমীক্ষা)

ডঃ ফজলুর রহমান

পি এইচ ডি অভিসন্দর্ভ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মার্চ ১৯৮৮

www.pathagar.com

প্রকাশক
এম এ গনি
১৭২/১, ওয়াপদা রোড, পশ্চিম রামপুরা
ঢাকা-১২১৯

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
ইংরেজী মূল অভিসন্দর্ভ : ১৯৯০
অনুবাদ সংস্করণ : জুন, ১৯৯৮

প্রচ্ছদ
হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণ
এস খান প্রিন্টার্স
৪৯৪ বড় মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট
ঢাকা-১২১৭।

পরিবেশক
মোঃ আফসারুল হুদা
আফসার ব্রাদার্স
৩৮/৪, বাংলা বাজার (দোতালা)
ঢাকা -১১০০

মূল্য
২০০.০০ টাকা

Culture Conflicts in East Pakistan 1947-71 (A study in the attitude of Bengali Muslim Intelligentsia towards Bengali Literature and Islam) by Dr Fazlur Rahman, Published by : M A Ghani, 172/1, Wapda, Road, West Rampura, Dhaka-1219. Translated and Edited by : Mohammad Baker Hossain, Eminent Journalist. Composed by : Abul Kalam Azad, Proprietor, A. Z. Computer & Printers, 435/A-2, Bara Magh Bazar, Dhaka 1217, Phone : 9342249, Printed by : S Khan Printers.494 Bara Moghbazar, Dhaka-1217. Published : Original Thesis in 1990. Present translated version in June, 1998. Cover Design : Hamidul Islam. Distributor : Md. Afsarul Huda, Afsar Brothers, 38/4, Bangla Bazar (1st Floor), Dhaka -1100.
Price : Tk. 200.00

www.pathagar.com

পরম শ্রদ্ধেয়

মা-বাবা

এবং

শ্বশুর-শাশুড়ীর

উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

আমার গবেষণার বিষয় ছিল মূলত ১৯৪৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা, যা দু'দেশের কূটনৈতিক বা রাজনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে নির্ণিত হয়নি। বিশেষ কারণে আমি মূল পরিকল্পনা পরিহার করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিক বিরোধকে বুঝার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠি। যে প্রশ্নে তাদের মধ্যে বিরোধ চলছিলো, তা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীরা কোন সংস্কৃতির অনুসারী হবে– ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত আঞ্চলিক সংস্কৃতির নাকি পাকিস্তানের ধারণা থেকে সৃষ্ট নয়া রাজনৈতিক সংস্কৃতির?

সংস্কৃতি ও রাজনীতি পরস্পর পরিপূরক এটা সার্বজনীন সত্য। একটি সম্পর্কে জানতে হলে অপরটিকে বিশদভাবে জানতে হবে। তাছাড়া সংস্কৃতি ও রাজনীতির মৌলিক প্রবণতা গঠনে ধর্মও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই সত্যকে সামনে রেখে আমি মূল বিষয়ের গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করি এবং গবেষণার প্রকৃত বিষয়বস্তু ঠিক করি।

গবেষণার বিভিন্ন সহায়ক উপাদানসমূহের উপর ব্যাপক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি হই। আমার ধারণা, চলমান সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনার বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে রাজনীতি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এ জন্য দু'বাংলার অভিন্ন সংস্কৃতির প্রকৃত চিত্র কি তা নিরপেক্ষ মতামতের ভিত্তিতে তুলে ধরার মাধ্যমে সংস্কৃতির রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অস্তিত্ব তুলে ধরার চেষ্টা অসার বলে মনে হয়েছে। কেননা এ ক্ষেত্রে প্রকৃত সাংস্কৃতিক সত্তাকে তুলে ধরতে অনেক বেশী সময় লাগবে।

তাই এই গবেষণায় আমি রাজনৈতিক দিকটা যতটা সম্ভব পরিহার করে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের উপর আমার আলোচনা নিবদ্ধ রাখি যাতে গবেষকরা প্রকৃত সমস্যা ও সমাধান সঠিকভাবে নিরূপন ও তার গভীরে পৌছতে পারেন। তাছাড়া পাকিস্তান

www.pathagar.com

আমলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি ধর্মীয় অনুভূতিতে আটকে পড়ে ফলে তা মূলধারা থেকে দূরে সরে যায় এবং প্রকৃত পরিচয় হারিয়ে ফেলে। সংস্কৃতিতে ধর্মীয় প্রবণতা এত প্রবল ছিল যে তা সংস্কৃতির মূল বিষয়বস্তুতে ভাঙ্গন ধরিয়ে দেয়। এই ভাঙ্গনের সংস্কার এখনো হয়নি এবং ভাঙ্গনকে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গভাবে সংস্কার না করা হলে কোন রাজনৈতিক মতামত দেয়া বা গবেষণা করা আদৌ সম্ভব নয়।

গবেষণা কাজকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ, নির্ভরযোগ্য দলিলপত্র এবং বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত তথ্য কেন্দ্রসমূহে সংরক্ষিত পত্র-পত্রিকার ফাইল ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছি।

মূল ইংরেজী অভিসন্দর্ভটি ১৯৯০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। অনুবাদ সংস্করণটি বর্তমানে প্রকাশিত হল।

ফজলুর রহমান

প্রকল্প পরিচালক
নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের
নবায়ন ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
ফোন ঃ অফিস - ৯৫৫ ৩৯৬৫
বাসা - ৯৩৩ ৫৭৭৩

জুন, ১৯৯৮/জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫ বাংলা

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

(অভিসন্দর্ভের মূল ইংরেজী সংস্করণ)

আমার এই গবেষণা কর্মে গভীর আগ্রহ ও আন্তরিকতা প্রদর্শনের জন্য আমার তত্ত্বাবধায়ক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর বিনয় ভূষণ চৌধুরীর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ধৈর্য, বিচক্ষণতা ও স্নেহ এই গবেষণা কর্মে সবসময় আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আমি মিসেস তৃপ্তি চৌধুরীর কাছেও ঋণী। কলকাতা অবস্থানকালে তিনি আমাকে উদারতা, স্নেহ ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে প্রতিনিয়ত সাহায্য করেছেন। অন্যান্যের মধ্যে যারা আমাকে মূল্যবান পরামর্শ ও তাদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন তারা হচ্ছেন ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর অমলেন্দু দে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর কে এম মহসিন, এ রশিদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান বিআইএসই, ঢাকা, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ হেদায়েতুল ইসলাম খান, পটুয়াখালী গার্লস কলেজের প্রফেসর এম ফারুক, প্রফেসর এম এ হাই এবং প্রফেসর শওকত আলম সিদ্দিকী, ঢাকা। আমি এদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

আরো অনেকেই আমার অভিসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপিটি বা তার অংশবিশেষ অত্যন্ত আগ্রহ ও যত্নের সাথে পড়েছেন এবং সন্দর্ভটির উৎকর্ষতার বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত পরামর্শ প্রদান করে অভিসন্দর্ভটিকে একটি সুন্দর গবেষণা কর্মে রূপ দিতে সহায়তা করেছেন। এদের মধ্যে কলকাতা বিশবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শ্রী অরুণ বন্দোপাধ্যায় এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শ্রী অলক ঘোষ অন্যতম। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচডি বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ডঃ দীনেশ সিনহার কাছে তার আন্তরিক প্রয়াস এবং আমার প্রতি নিরবচ্ছিন্ন সহানুভূতির জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রিসার্চ ফেলো' থাকাকালীন আমার প্রতি সহানুভূতি এবং সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের সচিব নারায়ণচন্দ্র পাল, হিসাব বিভাগের শ্রী সত্যভূষণ মাইতী এবং ইউজিসি বিভাগের পীযূষকান্তি গুহকে ধন্যবাদ জানাই। আমি ইতিহাস বিভাগের শ্রী মানস ঘোষ এবং শ্রী

www.pathagar.com

তপন শী-র সক্রিয় সহযোগিতার কথাও ভুলবো না। আমি ইলা দিদির যত্ন ও স্নেহের জন্য কৃতজ্ঞ।

আমি অত্যন্ত যত্ন ও ধৈর্যসহকারে যারা আমার গবেষণা নিবন্ধ টাইপ করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। অভিসন্দর্ভটি টাইপ শেষে বাঁধাই করে পূর্ণাঙ্গরূপ দেয়া পর্যন্ত মোরলী, কমলা এবং সোমার আন্তরিক সহায়তা ও ধৈর্য ধরে আমাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ফেলোশীপে আমি আমার গবেষণালব্ধ অভিসন্দর্ভের জন্য ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছি। আমাকে এই সুযোগ প্রদানের জন্য আমি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছে কৃতজ্ঞ।

আমার শ্বশুর জনাব মুহাম্মদ জহুরুল হক আমার কাজকে সফল করার জন্য সদা সচেষ্ট থেকে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তার প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। আমার অবর্তমানে মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান ও এবিএম সিদ্দিক বাংলাদেশে অবস্থানরত আমার পরিবারবর্গের সর্বাধিক যত্ন নিয়েছেন এবং যখনই ঢাকা এসেছি তারা আমার গবেষণার বিষয় নিয়ে আমার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ফলে আমার গবেষণা নিবন্ধ অনেকাংশে সমৃদ্ধ হয়েছে। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি ধন্যবাদ জানাই মিসেস আসগিরুন্নেছা, স্বপন, টিপু, নাসরিন এবং জগলুলকে। এরা সবসময় আমার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছেন।

সর্বোপরি আমি আমার স্ত্রী নাজনিনের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি দীর্ঘ বিচ্ছেদ-বেদনা ধৈর্যের সাথে সহ্য করেছেন। তাঁর প্রচন্ড তাগাদা ও সহৃদয় ভর্ৎসনা না থাকলে এই কাজ সম্পন্ন করা আমার পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হতো না। আমার কন্যা সেঁজুতি সম্পর্কে শুধু এটুকুই বলবো যে, তাকে পিতৃস্নেহ থেকে দীর্ঘদিন দূরে রাখার বিনিময়েই আমি এই গবেষণা কর্ম সম্পাদনের আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছি।

গবেষণাকালীন সময়ে আমি আমার মাতা-পিতা এবং কয়েকজন নিকট আত্মীয়কে হারিয়েছি। তাদের মধুময় স্মৃতি আর স্নেহাশীর্বাদ আমার এই গবেষণা কর্মের অন্যতম অনুপ্রেরণা।

ফজলুর রহমান

কলকাতা
মার্চ, ১৯৮৮

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ভূমিকা ১৩

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ভাষা ও ইসলামী মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়া ৩৫

তৃতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভব ঃ লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০) ৪৭

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাতিষ্ঠানিক করণ (১৯৪৭ পরবর্তীকাল) ও প্রতিক্রিয়া ৭১

ভাষা কমিটি ৭৬

সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন ৭৯

পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ঢাকা (১৯৪৮-৪৯) ৭৯

পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস ৮০

সংস্কৃতি সংসদ ৮১

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ৮১

পূর্ব-পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন, চট্টগ্রাম ৮২

পূর্ব-পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন, কুমিল্লা ৮৩

ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ঢাকা ৮৫

পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ঢাকা (১৯৫৪) ৮৬

পঞ্চম অধ্যায়

জাতীয় ভাষা প্রসঙ্গ ৮৯

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৯৫২ সালের পরবর্তী সময় ১১১

সাংস্কৃতিক সম্মেলন, কাগমারী ১১৯

সিপাহী বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তি ১২২

রঁওনক সাহিত্য গোষ্ঠী ১২৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সাহিত্য সেমিনার ১২৪

পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সেমিনার, চট্টগ্রাম ১২৫

রোমান হরফ প্রচলন ও জাতীয় ভাষা সৃষ্টির উদ্যোগ ১২৮

পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড প্রতিষ্ঠা ১৩০

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশত বার্ষিকী পালন ১৩২

ছায়ানট প্রতিষ্ঠা ১৩৪

ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৫

পহেলা বৈশাখ (বাংলা নববর্ষ) ১৩৬

নজরুল একাডেমী ঃ প্রতিষ্ঠা ও তৎপরতা ১৩৮

রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে বিতর্ক ১৩৯

বাংলা ভাষা সংস্কার এবং জাতীয় ভাষা প্রনয়নের উদ্যোগ ১৪২

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎপরতা ১৪২

খ. আবার রোমান অক্ষর প্রসঙ্গ ১৪৩

গ. পাকিস্তানী ভাষা প্রনয়নের জন্য পুনরায় প্রেসিডেন্টের সুপারিশ ১৪৩

রাইটার্স গিল্ড পূর্বাঞ্চলীয় শাখার তৎপরতা ১৪৪

ক. মহাকবিদের স্মরণ অনুষ্ঠান ১৪৪

খ. আফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠান ১৪৫

নবরূপে ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকন্সট্রাকশন ১৪৭

বই বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে আন্দোলন ১৪৭

পাকিস্তান ঃ দেশ ও কৃষ্টির বিরুদ্ধে আন্দোলন ১৪৯

বাঙালীদের দমনের জন্য পাকিস্তানীদের শেষ চেষ্টা ১৫০

উপসংহার ১৫৫

www.pathagar.com

ভূমিকা

দুর্বল রাজনৈতিক ভিত নিয়ে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সৃষ্টি আর তার রাজনীতিবিদ ও নেতৃবৃন্দ ধর্মকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ঐক্যের একমাত্র বন্ধন হিসেবে বিবেচনা করতে থাকেন। নতুন এ রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে পশ্চিম-পকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা যেভাবেই হোক ক্ষমতা হস্তগত করে নেন এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাঙালীদের ন্যায্য অধিকারকে অস্বীকার করে চলতে থাকেন। ফলে ১৯৪৭-৭১ সাল পর্যন্ত বাঙালী সংস্কৃতিকেও দমিয়ে রাখতে অব্যাহত প্রয়াস চালিয়েছে পাকিস্তানী শাসকবর্গ। তাদের এই সুপরিকল্পিত হামলার প্রথম শিকার বাংলা ভাষা। এছাড়া আরো বিভিন্ন সূক্ষ্ম পন্থায় তারা বাঙালী সংস্কৃতিকে অবদমনের চেষ্টা চালাতে থাকে। যেমন পূর্ব-বাংলার দীর্ঘদিনের নাম পরিবর্তন করে পূর্ব-পাকিস্তান করেন, অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের পূর্বনাম বহাল রাখা হয়। বহু বাঙালী কবি ও সাহিত্যিক এবং তাদের লেখাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এই অজুহাতে যে তারা পাকিস্তানী নন তাদের আদর্শিক ভিত্তি বা ধর্মীয় বিশ্বাস পাকিস্তানী মুসমানদের চাইতে ভিন্ন। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাবী, গুরুমুখী, গুজরাটী বা উর্দু কোন সাহিত্যিক, কবি অথবা তাদের রচনার বিরুদ্ধে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সার্বজনীন আবেদন থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা পূর্ব পাকিস্তানীদের পোশাক ও আচার-আচরণেরও বিরূপ সমালোচনা করতে থাকে। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে এই হামলা আরো প্রকট আকার ধারণ করে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দীর্ঘ ২৩ বছরের সহ-অবস্থানের পর একটি কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, এই বসবাস পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ও সমমর্যাদাপূর্ণ ছিল না। বাঙালীদেরকে তাদের ১২ শতাংশ জনগণের ভোটাধিকার হরণসহ তাবৎ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে এবং পরবর্তীতে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতায় তাদের অংশ গ্রহণের অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানীদের মতো কোন ত্যাগ পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকে স্বীকার করতে হয়নি। ২৩ বছরে এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ব্যাপারে বাঙালীরা সবসময় গভীরভাবে আগ্রহী ছিল সেই গণতন্ত্রের পথ পশ্চিম পাকিস্তান বরাবরই রুদ্ধ করে রেখেছিল। প্রতিরক্ষা বিভাগের সদস্য ও রাজনীতিকরা এই প্রবণতাকে বাধা তো দেয়নি বরং কৌশলে উৎসাহিত করেছেন। ফলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই দু'পৃথক অঞ্চলের মধ্যে

www.pathagar.com

শুধু মুখের ভাষায় নয়, রাজনৈতিক ভাষায়ও কোন মিল ছিল না। ভাষা ও সাংস্কৃতিক অধীনতা চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস, অর্থনৈতিক শোষণের প্রকৃতি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা দেখে পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে পাকিস্তান আন্দোলনের স্মৃতি ভেসে ওঠে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান মিলে যেমন জাতি গঠিত হতে পারেনি, তেমনি পাকিস্তান আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণের পূর্ববর্তী ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও জাতিসত্তার স্থায়ী বাঁধন গড়ে ওঠেনি। ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি বৈরিতার প্রেক্ষাপটে দু'অঞ্চলের লোকদের মধ্যকার ধর্মীয় ঐক্য পাকিস্তানীদের জোটবদ্ধ করেছিল কিন্তু বৃটিশ-ভারত বিভক্তির পর এই নেতিবাচক কারণ দু'অঞ্চলের পাকিস্তানীদের ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত ছিল না। ক্ষমতা সামরিক বাহিনীর অনুকূলে চলে গেলে এই প্রত্যাশাও বৃদ্ধি পায় যে হয়তো বা দেশে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া গড়ে উঠবে এবং দেয়া-নেয়া ও বৃহত্তর সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান হচ্ছে সংঘাতের ক্ষেত্র সংকোচিত করা এবং যোগাযোগ বৃদ্ধি। ফলে ব্যাপক ভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী ভিত্তি লাভ করে।[১] পাকিস্তানের দশ বছর পূর্তিতে বাঙালীদের অবস্থান সম্পর্কে কিথ ক্যালার্ড-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। পরবর্তী তের বছর শুধুমাত্র সেই ধারণা নির্দেশিত পরিণতি নিশ্চিত করেছে।

> "বাঙালীদের ব্যর্থতা কিংবা তাদের প্রতিপক্ষের ম্যাকিয়াভেলী ধাঁচের চাতুরির কারণে বাঙালীদের প্রভাব কখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে পৌছতে পারেনি। নাজিমুদ্দিন গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল লিয়াকত আলী খানের কাছে। নাজিমুদিন প্রধানমন্ত্রী হন কিন্তু তার দৃঢ়তার অভাব ছিল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পাঞ্জাবী গভর্নর জেনারেল কর্তৃক বরখাস্ত হন। প্রধানমন্ত্রী পদে বগুড়ার মুহাম্মদ আলীকে আনা হয় কিন্তু একজন বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতের ক্রীড়নক এবং পশ্চিম পাকিস্তানীরাই ছিল তার সরকারের মূল চালিকা শক্তি। বাঙালী সদস্যরা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তি কাজে লাগিয়ে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা খর্ব করতে চেয়েছিলেন কিন্তু উল্টো নিজেরাই ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পড়েন। পূর্ব বাংলার নির্বাচকমন্ডলী মুসলমানদের ভাষা ত্যাগ করে, ফল হিসেবে তাদের উপর এক বছরেরও বেশী সময়ের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী আমলাদের শাসন চেপে বসে। সশস্ত্র বাহিনী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী, জাতীয় সিভিল সার্ভিসেও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রাধান্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানাও ছিল অনেকাংশে অবাঙালীদের হাতে। সংক্ষেপে বলা যায়, বাঙালীরা ছিল পাকিস্তানের প্রথম দশ বছরের ইতিহাসের নীরব দর্শক। ফলে

---

১. A. M. A. Muhith. Bangladesh : Emergence of a Nation (Dhaka. 1978). PP. 39-67.

www.pathagar.com

জাতীয়ভাবে তাদের প্রতি বৈষম্য দেখে তারা নিজ প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রতি ঝুঁকে পড়ে।"[২]

বস্তুত সাংস্কৃতিক আন্দোলন বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই পূর্ব পাকিস্তানে প্রাগ্রসর রাজনৈতিক আদর্শ গড়ে উঠে। পরবর্তীতে এই রাজনৈতিক মাত্রা আরো আনুষ্ঠানিক, স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠে।

পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের পরপরই যখন জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা তেমন গভীর ছিল না– ভাষা আন্দোলনের মতো সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠায় রাজনৈতিক অঙ্গনে তা দিক-নির্দেশিকায় পরিণত হয়। এই আন্দোলনের রাজনৈতিক দিক বিচার করলে দেখা যাবে এই আন্দোলনের ভিত্তি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও অনেকাংশে বিস্তৃত ছিল। জাতীয় ভাষার দাবীতে সূচিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন রাজনৈতিক মর্যাদা অর্জন করে। উপরন্তু এর ফলে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের নতুন ভিত রচিত হয়। এভাবে ভাষা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের উপর গবেষণা করতে গিয়ে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়– পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর পরস্পর বিরোধী মনোভাব– গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেছি। বিষয়টি হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীরা কোন সংস্কৃতির আনুগত্য করবে– ইতিহাস আশ্রিত আঞ্চলিক সংস্কৃতির যেখানে রয়েছে একই বাংলা ভাষাভাষী সমাজ (বাঙালী), নাকি পাকিস্তান সৃষ্টির পর নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির? এই উদ্দেশ্যে আমি পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৭-এর পরবর্তী সময়ে গঠিত সংগঠনগুলোর অধিকাংশ সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধান চালিয়েছি এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও পশ্চিম বাংলায় প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য-প্রমাণ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে কাজে লাগিয়েছি। এজন্য গবেষণাপত্রের নামকরণ করা হয়েছে "পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব (১৯৪৭-৭১) ঃ বাংলা সাহিত্য ও ইসলামের প্রতি বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গির সমীক্ষা"।

ভূমিকা ও উপসংহার বাদে এই গবেষণা নিবন্ধে ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আমি উনিশ শতকের বাংলার মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা তুলে ধরেছি এবং তাদের মাতৃভাষা নিয়ে 'আশরফ' (বহিরাগত মুসলমান যারা নিজেদেরকে উচ্চ শ্রেণী বলে মনে করেন) এবং 'আতরফ' (নিম্ন মর্যাদার মুসলমান অর্থাৎ স্থানীয় মুসলমান। এই শ্রেণীতে অবহেলিত হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমানও রয়েছে)-এর মধ্যকার দ্বন্দ্বকেও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বাংলা সাহিত্য ও ইসলামের প্রতি মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মনোভাব পরিবর্তনের ধারাও আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি।

---

২. K. Callard. Pakistan - A Political Study. P. 173. (Quoted in Bangladesh : Emergence of a Nation by A. M. A. Muhith)

www.pathagar.com

মুসলমান বুদ্ধিজীবীগণ পর্যায়ক্রমে বাংলা সাহিত্য চর্চা শুরু করেন এবং সাহিত্য জগতে তাদের অবদান রাখেন। এতে সমকালীন হিন্দু সাহিত্যিকদের সাথে তাদের বিরোধ বাঁধে। এর পেছনে গুরত্বপূর্ণ কারণ ছিল এই যে, চলতি শতাব্দীর প্রথম চার দশক মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা ক্রমবর্ধমান হিন্দু জাতীয়তাবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। হিন্দু ও মুসলিম লেখকদের এই বিরোধ মুসলিম লেখকদের মধ্যে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিয়ে তোলে এবং সাহিত্য জগতে নবাগত মুসলিম লেখকরা হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকেন। এই বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সাধারণভাবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের আলোকে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছি। এসময় রাজনীতি অত্যন্ত নোংরা ভূমিকা পালন করে এবং ধর্মই তখন উপমহাদেশ বিভক্তির একমাত্র যুক্তি ও বিচার্য বিষয়ে পরিণত হয়।

দেশ বিভক্তির পর হিন্দুদের পক্ষ থেকে সৃষ্ট হুমকি স্তিমিত হয়ে যায় বটে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা-চেতনার উদ্ভব হয়। কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালালে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। তুমুল প্রতিবাদের মুখে প্রাদেশিক সরকার একটি 'ভাষা কমিটি' গঠন করে। এ বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে জাতীয় ভাষা বিতর্ক। বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে সরকার শেষ পর্যন্ত বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমি ১৯৭১ সাল পর্যন্ত নানা প্রতিকূলতার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছি। পাশাপাশি জনগণের লক্ষ্য নির্ধারণে বুদ্ধিজীবীদের মনোভাব ও ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

শেষ অধ্যায়ে গবেষণার আলোকে আমি নিজস্ব উপসংহার টেনেছি।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ভাষা ও ইসলামী মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

"বাংলাদেশ হিন্দু মুসলমান উভয়ের আবাসভূমি– কেবলমাত্র হিন্দুদের নয়। কিন্তু বর্তমানে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে ব্যবধান অনেক। বলা যায় ভিন্ন মেরুতেই উভয়ে অবস্থান করছে– পরস্পরের প্রতি তারা সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন। বাংলার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য হিন্দু-মুসলিম ঐক্য অপরিহার্য। কিন্তু যতদিন প্রভাবশালী মুসলমানরা নিজেদেরকে ভিন্ন দেশের নাগরিক বলে গৌরব বোধ করবে এবং এই ধারণা পোষণ করবে যে বাংলা তাদের ভাষা নয় সুতরাং বাংলায় লেখাপড়া করা তাদের উচিত নয় বরং উর্দু-ফার্সিই তাদের একমাত্র ভাষা ততদিন হিন্দু-মুসলিম ঐক্য হতে পারেনা, কেননা মূল উৎসের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠে।"[১] ১৮৭৩ সালে মীর মোশারফ হোসেন রচিত 'গড়াই ব্রিজ' গ্রন্থের সমালোচনায় অক্ষয় কুমার সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। "মুষ্টিমেয় অভিজাত লোক অতীত গৌরব-গাঁথার সমাধিতে বসে এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না যে বাংলা বা উর্দু কোনটি বাংলার মুসলমানদের ভাষা হওয়া উচিত। কিছুদিন পর তারা ভাষা ভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং সভা-সমাবেশে বাংলায় বক্তৃতা করে বাংলার মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে বাংলার মুসলমানদের ভাষা বাংলা বা উর্দু মিশ্রিত বাংলা নয় বরং খাঁটি উর্দু।"[২] এই কথাটি বলেছেন মুহাম্মদ এনামুল হক। উপরোক্ত দু'টি মন্তব্যই অভিন্ন– একটি বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ অপরটি গবেষণালব্ধ। বাংলার মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু এ নিয়ে বিতর্ক চলেছে দীর্ঘদিন। অনেক সময় এই বিতক হয়েছে অভিজাতদের প্রভাবে, কোন কোন সময় উদীয়মান বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে, আবার মাঝেমধ্যে এই বিতর্ক হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। মোঘল সম্রাট আকবরের আমলে বাংলা ছিল বিস্তৃত প্রশাসনিক ইউনিটের একটি অংশ মাত্র। ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগের আগ পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী যাবৎ উড়িষ্যা, বিহার ও ছোটনাগপুর ছিল বাংলার

১. বঙ্গ দর্শন, পৌষ, ১২৮০ বাংলা।

২. মুহাম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৫, (২য় সংস্করণ) পৃঃ ৩০৩।

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত। বাংলার এই প্রশাসনিক মর্যাদার কারণে এখানে প্রশাসনিক চাকুরি সংশ্লিষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। তখন প্রশাসনিক চাকুরিবাকুরিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সৈয়দ গোলাম হোসেন রচিত 'সিয়ারুল মোতাখখেরীন' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ থেকে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ জানা যায়। উল্লেখিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী 'আশরফ' তথা উত্তরাধিকারসূত্রে অভিজাত হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাদের অধিকাংশই বাংলাদেশের মুসলমান ছিলেন না। তারা নিজেদের ভাগ্যান্বেষণে মোঘল প্রশাসনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে বাংলায় আসেন। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের নবাবদের পৃষ্ঠাপোষকতায় তারা সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদায় আসীন ছিলেন। মুসলমানদের এই অংশ যদিও এক সময় নিজেদেরকে বাঙ্গালী হিসেবে পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের মাতৃভাষা ছিল ফার্সি। অপেক্ষাকৃত কম সামাজিক মর্যাদার মুসলমানদের সাথে কথাবার্তা এবং কর্মক্ষেত্রে তারা উর্দু ব্যবহার করতেন যা ছিল সেনা ছাউনির ভাষা। খৃষ্টীয় দশম শতক থেকে দীর্ঘ সময়ব্যাপী বিপুল সংখ্যক পীর-দরবেশ এবং ওলামায়ে কেরাম এদেশে সুফীবাদের উদার দর্শন প্রচারকালে সমাজে আশরফ (উঁচু) আতরফ (নিচু) এবং বিদেশী ও স্থানীয় মুসলমানের মধ্যে কোন শ্রেণী বিভাজনের অস্তিত্ব ছিল না। অথচ পরবর্তীতে মোঘল শাসনামলে বাংলায় এই বিভেদ প্রকট হয়ে দেখা দেয়।[৩]

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে মোঘল সৈন্যদের কথ্য ভাষা হিসেবে উর্দু চালু হয়। সম্রাট শাহজাহানের আমলে উর্দু ভাষা আদালতে স্বীকৃতি পায়।[৪] আরবী বর্ণমালা ও লিখন পদ্ধতি এবং আরবী ও ফার্সি শব্দ ও বাকপদ্ধতি আত্মীকরণের মাধ্যমে উত্তর ভারতে স্থানীয় হিন্দি ভাষার মৌল কাঠামো দিয়ে উর্দু ভাষা গঠিত। সর্বপ্রথম কবি গালিবের আন্তরিক চেষ্টায় উর্দুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে কবি হালি এবং সৈয়দ আহমদ ও শিবলী নোমানীর মত আলীগড় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দও এই প্রচেষ্টায় শরীক হন। নবাব, সুবাদার ও মনসবদার এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা উর্দু ভাষাকে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের কেন্দ্রে নিয়ে আসে। তখন থেকে উর্দু ভাষা অভিজাতমহলে শেকড় গাঁড়তে শুরু করে। মোঘল আমলে দিল্লীর সাথে বাংলার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সে সময় বাংলার রাজধানী ও বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহে ভাগ্যান্বেষীদের সমাবেশ ঘটতো। পর্যায়ক্রমে এদেশে একটি উর্দুভাষী অবাঙ্গালী শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। তারা উর্দুকে নিজেদের পারিবারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে।

১৭০২ সালে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। তখন থেকে মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং তা শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। জনগণ যশ-

৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ এপ্রিল, ১৯৮৬ পৃঃ ৫-৬।
৪. আবু মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, (বাংলা একাডেমী ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৭৪), পৃঃ ৭৭।

www.pathagar.com

খ্যাতি ও বিত্ত-বৈভবের আকাংখায় নগর সংস্কৃতিতে আগ্রহী হয়ে উঠে। নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তারা উর্দুকে শিক্ষা ও দৈনন্দিন যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। অবশ্য উর্দু ও আরবী, ফার্সি অগ্রাধিকার পাওয়ার পেছনে শক্তিশালী সামাজিক প্রেষণা কাজ করেছে– বিশেষ করে তখন বাঙ্গালী মুসলমান পরিবারকে প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রাখা হত। হিন্দু রাজা ও জমিদারগণ ফার্সি ভাষা শিখে নবাবী চালচলন ও সংস্কৃতি অনুসরণ করতেন। এমনকি ইংরেজরা পর্যন্ত প্রথম দিকে নবাবী জীবনযাপন পছন্দ করতো।[৫]

আরো একটি কারণে উর্দুভাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কলকাতা যখন আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে উঠে, তখন সেখানে জীবিকা উপার্জনের সুযোগ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। জীবিকার সন্ধানে ভারতের আনাচে-কানাচে থেকে মানুষ এসে কলকাতায় ভিড় জমায়। এমনকি নগর জীবনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্য বুদ্ধিজীবী ও বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত লোকও কলকাতায় আসেন। ফলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের উর্দুভাষী লোকদের প্রভাবও অব্যাহতভাবে পড়তে থাকে। ১৭৫৭ সালের পর মুর্শিদাবাদ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। ১৭৯৯ সালে মহীশূরের পতন ঘটে। ১৮৫৬ সালে পতন ঘটে অযোধ্যার। বিদ্রোহ এড়ানোর জন্য বৃটিশ কোম্পানী তাদের খরচায় রাজপরিবারগুলিকে কলকাতায় নিজেদের হেফাজতে রাখে। মুর্শিদাবাদ, মহীশূর এবং অযোধ্যার নবাবগণ বিপুল সংখ্যক চাকর-বাকর ও সমর্থকসহ যথাক্রমে কলকাতার গার্ডেনরিচ, টালিগঞ্জ, ও মেটিয়াবুরুজে বাস করতে থাকে। বলাবাহুল্য যে তারা সবাই উর্দু ভাষার সমর্থক ছিলেন।

নব প্রতিষ্ঠিত ঢাকার নবাব পরিবারের ভাষা ছিল উর্দু। তাদের পূর্ব পুরুষরা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কাশ্মীর থেকে এই অঞ্চলে আসেন। প্রথমে তারা সিলেটে বসবাস শুরু করেন, পরে ঢাকায়। পরবর্তীতে নবাব পরিবারের একজন হাফিজুল্লাহ বিপুল পরিমাণ জমিজমা ক্রয় করে ১৮১২ সালে ঢাকায় একটি জমিদারী ষ্টেট প্রতিষ্ঠা করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তারই চতুর্থ পুরুষ আবদুল গনি চৌধুরী বৃটিশদের সক্রিয় সহযোগিতা করেন যার বিনিময়ে তিনি 'নওয়াব' উপাধি পান।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের নতুন ও পুরাতন জমিরদারগণ নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান বজায় রাখার জন্য মোঘল সংস্কৃতির সাথে নিজেদের খাপখাইয়ে নেয়। তারা উর্দুকে নিজেদের পারিবারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে এবং আরবী-ফার্সি শিক্ষাকে সভ্য ও ভদ্র লোকদের শিক্ষা বলে মনে করতে থাকে। রংপুর-পায়রাবন্দের 'সাবের' পরিবার, টাঙ্গাইল-করটিয়ার 'পন্নী' পরিবার, দেলদুয়ারের 'গজনভী' পরিবার, মোমেনশাহী-ধনবাড়ি, বগুড়া এবং শায়েস্তাবাদের 'চৌধুরী' পরিবার এবং মেদিনীপুরের

৫. গোপাল হালদার, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, ১ম খন্ড, (৩য় সংস্করণ), পৃঃ ১৮৩।

www.pathagar.com

'সোহরওয়ার্দী' পরিবার তাদের সাংস্কৃতিক মাধ্যম হিসেবে উর্দু-ফার্সি ব্যবহার করতো। অন্যদিকে আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, আবদুর রহীম, খান বাহাদুর আবদুল জব্বার, সৈয়দ শামসুল হুদা প্রমুখের মত নব্য শিক্ষিতরা উর্দু, ফার্সি এবং ইংরেজীকে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মাদ্রাসা শিক্ষিত 'মৌলবী' ও 'মওলানারা' ছিলেন উর্দুর সমর্থক। তাদের শিক্ষার মাধ্যম উর্দু । তারা ওয়াজ-নছিহত করতেন উর্দুতে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বক্তৃতাও করতেন উর্দুতে। তারা বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা মনে করতেন।

১৮৩৭ সালে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজীকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করা হয়। মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেন। তখন থেকে সরকার একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি গ্রহণ করে। কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজী-ফার্সি অনুষদ খোলা হয়। হুগলী মাদ্রাসায় খোলা হয় ইংরেজী-আরবী অনুষদ। ১৯৩৫-৩৮ সালে এ্যাডাম তার শিক্ষা রিপোর্টে শহর এলাকার মুসলমানদের জন্য উর্দু এবং পল্লী অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য বাংলা চালু করার সুপারিশ করেন। উডের রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দেয়া হয়। ফলে গ্রামাঞ্চলে স্কুলের সংখ্যা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। ঠিক সেই সময় আবদুল লতিফ ও আমীর আলী ইংরেজী শিক্ষার আন্দোলন শুরু করেন। তারাই সমাজে আধুনিকতার বীজ বপন করেন। শিক্ষিত তরুণরা বাংলা সাহিত্যচর্চা শুরু করে। বাংলা ভাষাই বাংলার লোকদের মাতৃভাষা উর্দু নয় এই কথাটি তখন আবার প্রমাণিত হয়। এতে এই উপলব্ধি জাগে যে বাংলা ভাষা শিক্ষা ও চর্চার মাধ্যমেই জাতি ও সমাজের উন্নতি নিশ্চিত হতে পারে। নব্যশিক্ষিত সমাজ এই মৌলিক সত্য উপলব্ধি করে। ফলে ভাষা প্রশ্নে উর্দুর প্রতিনিধিত্বকারীদের সাথে তাদের বিরোধ শুরু হয়। তৎকালীন সময়ে মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা-উর্দু প্রশ্নটি প্রধান বিরোধের বিষয়ে পরিণত হয়। বাংলার মুসলমান জনগণ– বহিরাগতদের বংশধর ও স্থানীয় ধর্মান্তরিত লোকদের নিয়ে 'বাংলাভাষী সমাজ' গঠিত হয়। জন গুমপার্জের মতে, 'ভাষাভাষী সমাজ' বলতে বুঝায়– "এক মানব সমষ্টি যারা অভিন্ন আক্ষরিক সংকেতগুচ্ছ দিয়ে নিয়মিত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাব বিনিময় করে এবং ভাষা ব্যবহারে সুস্পষ্ট পার্থক্যের মাধ্যমে নিজেদেরকে একই জনসমষ্টি থেকে পৃথক করে ফেলে।"[৬] তাই আমরা বলতে পারি যদিও উর্দু ভাষা উঁচু সামাজিক মর্যাদার মুসলমানদের ভাষা ছিল এবং আরবী ও ফার্সি ইসলামী ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হত কিন্তু তারা কখনো উর্দু, আরবী বা ফার্সি 'ভাষাভাষী সমাজ' গঠন করতে পারেনি, যেটা বাংলার ক্ষেত্রে ঘটেছিল। অবশ্য এটা ঠিক যে সাধারণভাবে বাংলার মুসলমান ও হিন্দুদের কথ্য ভাষায় পার্থক্য তেমন নেই। পার্থক্য যেটুকু দেখা যায় তা নিছক আঞ্চলিক। এই পার্থক্য সাম্প্রদায়িকও নয় বা সাহিত্য ও

৬. John Gumperz. The Speech Community ' In The International Encyclopaedia of Social Sciences (New York. 1968) রফিউদ্দিন আহমদ তার The Bengal Muslims : 1871-1906-A Quest for Identity. Oxford University Press. Delhi. 1981- র গ্রন্থে এই উদ্ধৃতি দেন।

www.pathagar.com

কথ্য ভাষার তফাৎও নয়। একই ধরনের প্রভেদ বহিরাগত বংশানুক্রমিক মুসলমান ও ধর্মান্তরিত মুসলমানের বাচন ভঙ্গিতেও দেখা যেত। বংশানুক্রমিক মুসলমানরা মিশ্র ভাষা ব্যবহার করতো, পক্ষান্তরে ধর্মান্তরিত মুসলমানরা তাদের হিন্দু পূর্বপুরুষদের ভঙ্গিতে কথা বলতো'।[৭]

বাঙালী মুসলমানদের মাঝে শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলন শুরু করেন আবদুল লতিফ। তার শিক্ষা কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি ছিলেন আরবী-ফার্সী-উর্দু ভিত্তিক প্রাচ্য শিক্ষার সমর্থক। যদিও এটা ঠিক যে, তিনি ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও সমর্থন করতেন কিন্তু তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অধিকতর সুবিধা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা। বাঙালী মুসলমানদের জীবনবোধ ও চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন সাধনে তিনি তেমন মনোযোগী ছিলেন না। তিনি ছিলেন পুরোপুরি রক্ষণশীল। তিনি বরাবরই মাদ্রাসা শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। ১৮৮০ সালে মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ক এক পুস্তিকায় সৈয়দ আমীর হোসেন মাদ্রাসা শিক্ষা বাতিল করে আধুনিক কলেজ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। এর প্রতিবাদে আবদুল লতিফ 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির' এক সভা আহবান করেন।[৮] তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র আবদুর রহমান তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির'র মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে আন্দোলন চালিয়ে যান। আবদুল লতিফ আরবী-ফার্সি ভিত্তিক শিক্ষার সমর্থনে যুক্তি পেশ করতেন। হুগলী মাদ্রাসা রিপোর্টে তিনি বলেন, আরবী-ফার্সিতে পারদর্শী না হলে কোন মুসলমান তাদের সমাজে মর্যাদা পেতে পারে না অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিকে জ্ঞানী বিবেচনা করা হবে না। আর সে ধরনের সম্মান ও মর্যাদা না থাকলে মুসলমানদের সমাজে তার কোন প্রভাব থাকতে পারে না এই কারণে কোন মুসলমান যিনি ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, কিন্তু ফার্সি বা আরবী শিখেননি, তিনি নিজের শিক্ষাকে সমাজের লোকদের উপকারে কাজে লাগানোর তেমন সুযোগ পেতেন না। তবে তিনি যদি ইংরেজীর সাথে ফার্সি ও আরবী জানতেন, তাহলে সমাজে তার প্রভাব থাকতো এবং এই প্রভাব নিশ্চিতভাবে তিনি সরকারের স্বার্থে কাজে লাগাতেন। সেজন্য সরকারও এমন কৌশল অবলম্বন করতো যাতে মুসলমানরা ইংরেজীর সাথে সাথে ফার্সি ও আরবী শিখেন।[৯] লতিফের উক্ত মন্তব্যে শিক্ষা সম্পর্কে শুধুমাত্র তাঁরই মনোভাব ফুটে উঠেনি, বরং তৎকালীন অভিজাত মুসলমানরাও যে একই মনোভাব পোষণ করতেন তার আভাস পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ 'হিতকরী'তে 'আমাদের শিক্ষা' (Our Education) নামক এক নিবন্ধে

৭. রফিউদ্দিন আহমদ, পৃঃ ১০৬-১৩২।

৮. Syed Ameer Hossain, A Pamphlet on Mohammadan Education in Bangal. Bose Press Calcutta. 1880.

৯. Enamul Huq (Ed). Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents. Samudra Prokashani. Dhaka. 1968.

www.pathagar.com

মোশারফ বলেন, "আমাদের সমাজের দিকে তাকিয়ে শিক্ষা বিস্তার ত্বরান্বিত করা দরকার। সমাজে স্থানীয় মধ্যবিত্ত লোকদের কোন চাহিদা নেই। একই অবস্থা সমাজে তাদের প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রেও। এটা প্রকৃতই দুর্ভাগ্যজনক যে, তারা জাতীয় শিক্ষা, রাজনীতি ও জাতীয় নীতির সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে পারছে না। তাই উর্দু ও ফার্সি শিক্ষা অত্যাবশ্যক, শুধুমাত্র ইংরেজী শিক্ষা কোন কাজে আসছে না। উর্দু-ফার্সিকে অবহেলা করে কেবলমাত্র ইংরেজী-বাংলা শিখে কেউ সমাজে মর্যাদা নিয়ে থাকতে পারে না। পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে উর্দু ও ফার্সিকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।"[১০]

আবদুল লতিফ দেশবাসীর মধ্যে পশ্চিমা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। সোসাইটির মাসিক, বার্ষিক এবং জরুরী সভাসমূহে উর্দু, ফার্সি ও আরবী ভাষার উপর আলোচনা ও বক্তৃতা এবং এ উপলক্ষে নিবন্ধ প্রকাশ করা হতো। সেখানে বাংলা ভাষার কোন স্থান ছিল না। ১৯৬৩ সালের ২ এপ্রিল সোসাইটির প্রতিষ্ঠালগ্নে আবদুল লতিফ ফার্সিতে লেখা এক নিবন্ধে সোসাইটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

সোসাইটির পঞ্চম অধিবেশনে এফ জি টাইল (F.G. Tille) তার 'ইলেক্ট্রিসিটি এন্ড ইলেক্ট্রিক ম্যাসেজ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করার পর বিষয়বস্তু শ্রোতাদের বুঝানোর জন্য উর্দুতে তার অনুবাদ পাঠ করেন। আবদুল লতিফের সব প্রবন্ধ ইংরেজী কিংবা ফার্সিতে লেখা হতো। ১৮৬৩ সালে আলীপুরে সরকারী উদ্যোগে প্রথম কৃষি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনী কমিটির সদস্য হিসেবে আবদুল লতিফ প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উর্দুতে প্রচারপত্র ও পুস্তিকা প্রকাশ করেন। স্যার সেসিল বিডন তা অনুমোদন করেন এবং সেগুলো বাংলায় অনুবাদের পরামর্শ দেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, "আমি তা বাংলায় অনুবাদ করে মফস্বলে হাজার হাজার কপি বিলি করি। তাতে চমৎকার কাজ হয়েছে।"[১১] সম্ভবত এটাই ছিলো তার একমাত্র বাংলা চর্চা। 'রইস ও রায়ত' গ্রন্থে বলা হয়, আবদুল লতিফ ভাল বাংলা জানতেন। মোশারফ হোসেন তার 'বসন্ত কুমারী' নাটক আবদুল লতিফকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ বাণীতে তিনি লিখেছেন বাংলা সাহিত্যের প্রতি আবদুল লতিফের কিছুটা অনীহা ছিল। স্পষ্টত আবদুল লতিফ বাঙলা জানতেন এবং বাংলার প্রতি তার আগ্রহ ছিল। ১৮৮২ সালে তিনি হান্টার কমিশনের কাছে এ মর্মে সুপারিশ করেন যে, মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষার মাধ্যম যেন উর্দু করা হয় আর গ্রামের নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে যেন বাংলাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। আবদুল লতিফের ভাষায়,

---

১০. কাজী আবদুল মান্নান, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা ১৯৬৯ (২য় সংস্করণ), পৃঃ ৩২৬।

১১. Enamul Huq, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৪।

www.pathagar.com

"মোটামুটিভাবে বাংলা সম্পর্কে আমার মতামত হচ্ছে নিম্নশ্রেণীর লোকদের যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতিগতভাবে হিন্দুদের সাথে সম্পর্কিত তাদের প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাংলায়। তবে এই বাংলা হবে শিক্ষিত হিন্দুদের সংস্কৃত ভাষার উপরিকাঠামো থেকে বিশুদ্ধ, যাতে সম্পূরক হিসেবে রয়েছে অসংখ্য আরবী ও ফার্সি থেকে আগত চালু শব্দ। নিম্নশ্রেণীর বাঙালীদের ব্যবহৃত ভাষাকে এ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বা নমুনা হিসেবে পেশ করা যায়। অন্যদিকে, মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের জন্য উর্দুকে স্থানীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে...। মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর মুসলমানগণই বাংলার মূল বিজেতাদের মধ্য থেকে বংশানুক্রমে এসেছেন অথবা তাদের পূর্বপুরুষ হচ্ছে সে সব ধার্মিক, শিক্ষিত ও সাহসী ব্যক্তি যারা আরব, পারস্য ও মধ্যএশিয়া থেকে বাংলার মুসলিম শাসকদের অধীনে চাকুরীর জন্য আকৃষ্ট হয়েছিলেন অথবা তাদের পূর্বপুরুষ হচ্ছে সরকারের সেসব মুখ্য কর্মকর্তাগণ যাদেরকে রাজার সভাসদ থেকে নিয়োগ দিয়ে বাংলায় পাঠানো হয়েছিল, যাদের অনেকেই বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। অধিকাংশ এলাকায় তারা নিজেদের স্থানীয় ভাষা হিসেবে উর্দুকে বহাল রাখে।"[১২]

মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার বিষয়ে এটা ছিল হান্টার কমিশনের কাছে তার চতুর্থ জবাব। বাঙালী মুসলমানদের ভাষার দিক থেকে তিনি জাতিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। বাঙালী মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষা হিন্দুদের থেকে পৃথক নয়। বাঙালী মুসলমানদেরকে সংস্কৃতি ভাষার প্রভাবমুক্ত হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং তাদেরকে পর্যাপ্ত আরবী-ফার্সি শব্দ শেখার জন্য তাগিদ দেয়া হয়। শিক্ষা, ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আবদুল লতিফের এই অভিমতকে সমাজের বর্তমান নেতাদের অনুরূপ বলা যায় এবং এটাই সাংস্কৃতিক সংকট। বাংলার জনগণের ওপর এই সংকটের প্রভাব হচ্ছে, বদরুদ্দিন উমরের ভাষায়, মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে বাঙালী মুসলমানদেরকে বেশ কিছু সময় আরবী, ফার্সি ও উর্দু শিখতে হয়েছে। অথচ এর কারণে এ ধরনের শিক্ষিত মুসলিম তরুণরা জীবিকা অর্জনের জন্য বৃটিশ শাসনের নয়া প্রশাসনিক কাঠামোতে চাকুরি নিতে ব্যর্থ হয়ে মাদ্রাসা ও মক্তবের মৌলভী এবং মসজিদের ইমাম হিসেবে চাকুরি নিয়ে জীবিকা অর্জনে বাধ্য হয়। এভাবে সমগ্র মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি দারুনভাবে ব্যাহত হয়।[১৩]

আবদুল লতিফের পরেই সৈয়দ আমীর আলীর স্থান। তার পিতা সাদত আলী ছিলেন অযোধ্যার অধিবাসী। তিনি প্রথমে অযোধ্যা থেকে উড়িষ্যায় আসেন এবং স্থায়ীভাবে শিনসুরায় বসবাস করতে থাকেন। আমীর আলী উড়িষ্যার কটকে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র এক পুরুষ তাদের মধ্যে উর্দু প্রচলিত ছিল। রংপুরের শেখ রইস উদ্দিন সৈয়দ আমীর আলীর 'হিস্ট্রি অব দি আরবস'-এর বাংলা অনুবাদ করলে তিনি লন্ডন থেকে শেখ রইস উদ্দিনকে লিখেন, "সীমিত বাংলা জ্ঞান দিয়েও আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি

১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৫।
১৩. বদরুদ্দিন উমর, পূর্ববাংলার সংস্কৃতির সংকট, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা ১৯৭১, পৃঃ ১১।

www.pathagar.com

সারাসিনদের (আরবীয় মুসলমান) উপর লেখা ইতিহাস বইটির এক অসাধারণ বাংলা অনুবাদ হয়েছে।"[১৪] আমীর আলী বাংলা শিখেছিলেন কিন্তু কখনো তা চর্চা করতেন না।

তিনি ভারতীয় মুসলমানদের কল্যাণের চিন্তা করতেন। মুসলমানদের গৌরবময় ঐতিহ্য সম্পর্কিত তার সব বই ইংরেজীতে লেখা। তার সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের মাধ্যমে তিনি নব্য শিক্ষিত মুসলমানদেরকে তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। এসোসিয়েশনের যাবতীয় প্রকাশনা ইংরেজী ও উর্দুতে হতো। সেখানে বাংলা ব্যবহার হতো না। হুগলীর দেলোয়ার হোসেন আহমদ, কুমিল্লার সিরাজুল ইসলাম ও সৈয়দ শামসুল হুদা, সিলেটের আবদুল করিম, মেদিনীপুরের আবদুর রহীম ও ওবাইদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, বর্ধমানের খান বাহাদুর আবদুল জব্বার প্রমুখ সবাই উর্দুর ঘোর সমর্থক ছিলেন। সরকারী পর্যায়, অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সভা-সমিতি সর্বত্র তাদের প্রভাব ছিল। গ্রাজুয়েশন লাভের পর আবদুল করিম উর্দু পত্রিকা 'দারুল সালতানাত' এর সম্পাদক হন।[১৫] মুহাম্মদ ইউসুফ এবং সৈয়দ আমীর হোসেন যথাক্রমে উত্তর প্রদেশ ও বিহারের অধিবাসী ছিলেন। পেশাগত কারণে দীর্ঘদিন যাবত তারা কলকাতায় বসবাস করে আসছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা সমাজের নেতৃত্বও দেন। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুর রহিমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কলকাতা মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির এক সভায় করমাতে একটি মক্তব প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কলকাতা মাদ্রাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ এডওয়ার্ড রস উক্ত মক্তবে উর্দুকে শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব দেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, শিক্ষার মাধ্যম বাংলা করা হলে বাংলার মুসলমানরা লেখাপড়ায় অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়বে।[১৬]

সৈয়দ আমীর আলী, স্যার আবদুর রহিম, সৈয়দ শামসুল হুদা, দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সভায় উপস্থিত বাঙালী সদস্যরাও একই মনোভাব পোষণ করতেন। 'মিহির' সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম বলেন, "বাংলাকে পৃথক ভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হলে অনেকে তুমুল আপত্তি জানায়। বিশেষ করে নওয়াব বাহাদুর, খান বাহাদুরগণ, কয়েকজন ডক্টরেট এবং অভিজাত এলাকায় বসবাসকারী মুষ্টিমেয় কয়েকজন অখ্যাত লোক ভাষা হিসেবে বাংলাকে মানতে রাজী ছিলেন না। এ জন্য তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়াও বোকামির নামান্তর ছিলো"।[১৭]

---

১৪. শেখ রইস উদ্দিন আহমদ, আরব জাতির ইতিহাস, ২য় খন্ড ব্রাহ্মণ মিশন প্রেস, কলকাতা ১৩১৯ বাং (৩য় সংস্করণ)।

১৫. Muhammad Ali Azam, Life of Moulvi Abdul Karim, Calcutta, 1939, P-37.

১৬. মিহির ও সুধাকর, ১৩ই আষাঢ়, ১৩০৯ বাংলা।

১৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

মোজাফফর আহমদ এসব উর্দু ভক্তদের সম্পর্কে এক প্রবন্ধে লিখেছেন, "কিছুসংখ্যক অবাঙালী মুসলমান নানা উদ্দেশ্যে কলকাতায় বসবাস করেন। তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তারা উর্দুকে মাতৃভাষা ধরে নিয়ে তা শেখার চেষ্টা করতেন। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বাংলার পরিবর্তে উর্দু চালু করার জন্য তাদের এ চেষ্টা ছিল অত্যন্ত হাস্যস্কর ব্যাপার। তাদের সাথে আরো একটি খাঁটি বাঙালী গোষ্ঠী ছিল যারাও এই আত্মঘাতী প্রয়াস চালাতো"।[১৮] মোল্লারা উর্দু সমর্থন করতেন। মোজাফফর আহমদ বলেন, একটি গোষ্ঠী উর্দু বর্ণমালার আঁকাবাঁকা বৈশিষ্ট্য দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে যেতো। অন্যকথায়, আরবীতে যা কিছুই লেখা হোক না কেন, সেটা তাদের কাছে সত্য ও পবিত্র বলে গণ্য হতো। যেহেতু উর্দু আরবী বৈশিষ্ট্যে লেখা হয়, সেহেতু উর্দুতে যা কিছু লেখা হয় তাই ধর্ম বলে বিবেচিত হতো। আবার অনেকে মনে করতেন, উর্দু সাহিত্য বিশুদ্ধতা অর্জন করেছে তাই বাঙালী মুসলমানদের অবশ্যই উর্দু শিখতে হবে। তারা উর্দু শিখতে না পারলে ইসলামী সভ্যতার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে।[১৯]

কলকাতা, হুগলী, রাজশাহী এবং চট্টগ্রামের মাদ্রাসাসমূহে এ ধরনের মোল্লা তৈরী হতো। বাংলা ও ইংরেজী জ্ঞান না থাকায় তারা সরকারী চাকরি না পেয়ে গ্রামের মক্তব ও মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে চাকুরি করতেন এবং ইসলামী জলসা ও মিলাদে ওয়াজ-নছিহত করতেন। শহুরে অভিজাতদের অনুসরণে তারা উর্দুতে কথা বলে তৃপ্ত বোধ করতেন। নূর-আল-ঈমান এসব উর্দু ভক্তদের 'খেদমতগার' বলে আখ্যায়িত করে মন্তব্য করেছে, "তথাকথিত অভিজাতদের সন্তান এবং তাদের 'খেদমতগাররা' উর্দুতে কথা বলতেন, বাংলাকে ঘৃণা করতেন কিন্তু তাদের মনের কথা ব্যক্ত করার জন্য বাংলা ছিল সহজতর। বাংলা বলা থেকে বিরত থাকার কারণ এই ভাষার প্রতি তাদের ঘৃণা।[২০]

শেখ আবদুস সোবহান বাংলা না জানা এবং বাংলা ভাষাকে এড়িয়ে চলার জন্য মুসলিম জমিদারদের সমালোচনা করেন, আপনারা (জমিদারগণ) কয়েকজন একথা ভেবে গর্ববোধ করেন যে, "আপনারাই প্রকৃত ইংরেজী জানা অভিজাত... আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হতো যদি আমাদের পূর্বপুরুষরা ভারতে না আসতেন। আমরা কি করে বাংলা শিখি? বাংলা কি অভিজাত মুসলমানদের ভাষা হতে পারে?.... অথচ বাংলা ভাষার উপরই আপনাদের সামাজিক অবস্থান নির্ভর করছে। আপনারা নিজেদের ক্ষতি করছেন- তারপরও বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করে যাচ্ছেন"।[২১]

---

১৮. আল-ইসলাম, ১৩২৪ বাংলা।

১৯. মোজাফফর আহমদ, উর্দু ভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান, আল-ইসলাম, শ্রাবণ ১৩২৪ বাংলা।

২০. নূর-আল-ঈমান, ভাদ্র ১৩০৭ বাংলা।

২১. শেখ আবদুস সোবহান, হিন্দু-মুসলমান, ভিক্টোরিয়া প্রেস, কলকাতা ১৮৮৮, পৃঃ ৯৭।

www.pathagar.com

কিছু কিছু বাঙালী লেখক উর্দুর জন্য দরদ অনুভব করতেন। তারা উর্দুকে ভারতীয় মুসলমানদের সাধারণ ভাষা এবং যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মনে করতেন। তাই বাঙালী মুসলমানদের উর্দু শেখার প্রয়াসকে তারা ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। অবিভক্ত বাংলার মুসলিম সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে মুহাম্মদ আকরম খাঁ বলেন, ".....উর্দু আমাদের মাতৃভাষাও নয়, জাতীয় ভাষাও নয় কিন্তু ভারতের মুসলমানদের জাতীয়তা রক্ষা ও বিকাশের স্বার্থে উর্দুর প্রয়োজন খুব বেশী।"[২২] সবচেয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন মুহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন তার 'হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা' গ্রন্থের ভূমিকায়। তিনি লিখেছেন, "উর্দু না শিখলে ভারতীয় মুসলমানদের মুসলিম জাতীয়তাভিত্তিক বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে বিপন্ন হবে। বাংলার মুসলমানরা তাদের মাতৃভাষা বাংলা হওয়ার কারণে বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শুধু এই কারণে তারা জাতীয় চেতনাহীন, হতোদ্যম, দুর্বল ও কাপুরুষ। সংস্কৃত প্রভাবিত বাংলা ভাষা ৩৫০ মিলিয়ন বাঙালী মুসলমানকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা শুধুমাত্র ভাষাগত বাধার কারণে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে"।[২৩] এই উক্তি রসের বক্তব্যের সমার্থক। এভাবেই আমরা অক্ষয় কুমার সরকার এবং এনামুল হকের বক্তব্যের প্রকৃত কারণ খুঁজে পাই। এই প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে বাঙালী লেখকদেরকে তাদের লেখা চালিয়ে যেতে হয়েছে। বাংলা সাময়িকী প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাদের এই প্রচেষ্টা গতিশীল হয়ে উঠে। উনিশ শতকের শেষ দশকে মুসলমানদের সম্পাদিত সাময়িকীর সংখ্যা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। এসব সাময়িকীর নিবন্ধ ও সম্পাদকীয়তে উর্দু বনাম বাংলা বিতর্কে মাতৃভাষা হিসেবে বাংলাকে উর্দুর উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়। 'হিতকরী'তে প্রকাশিত মীর মোশারফ হোসেনের 'আমাদের শিক্ষা' নামক প্রবন্ধে বলা হয়, "বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা। মাতৃভাষার জন্য যার অনুভূতি নেই, প্রকৃতপক্ষে সে মানুষ নয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে মাতৃভাষার অগ্রাধিকার থাকতেই হবে..... ঘরে ও অফিসের কাজে বাঙালীরা বাংলার প্রয়োজন বোধ করে।"[২৪] মীর মোশারফ হোসেন হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি যিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, মাতৃভাষার প্রতি যার বিশ্বাস নেই, সে আদৌ কোন মানুষ নয়। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ হচ্ছেন বাংলা ভাষার এক মহান ব্যক্তিত্ব। বাঙালীদের মাতৃভাষা বাংলা এ ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ ছিল না। বাঙালীদের দৈনন্দিন কাজ ও কথাবার্তায় বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা চালুর ধারণাকে তিনি হাস্যকর মনে করতেন। বাংলা ভাষায় কোনরূপ বিকৃতি তিনি সহ্য করতেন না। তিনিই প্রথম 'বঙ্গদর্শনের' উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন, "কোন পশ্চাৎপদ সমাজ বা জাতি যদি নিজেদের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন

---

২২. বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা, মাঘ ১৩২৫ বাংলা।

২৩. মুহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা, সোলেমানী প্রেস, কলকাতা ১৩৫৫ বাংলা (৪র্থ সংস্করণ) ভূমিকা।

২৪. কাজী আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৭।

www.pathagar.com

চায়, তাহলে তা জাতীয় ভাষার সহায়তা নিয়ে সম্ভব– অন্য কিছুতেই তাদের ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারে না। যদি বাংলা ভাষা ছাড়তে হয় তাহলে আমাদেরকে সহযোগী হিন্দু ভাইদেরও ছাড়তে হবে....। যাই বলা হোক না কেন হিন্দু-মুসলমান হচ্ছে একই বৃক্ষের প্রধান দুটি শাখা– তারা একই দেহের দুটি অঙ্গ।"[২৫] যারা সামাজিক কাঠামোতে বিভক্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালায় আবদুল করিম তাদেরকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে অভিহিত করেছেন। যারা জাতীয় ভাষার নামে মাতৃভাষাকে বিকৃত করতে চায় তিনি তাদেরকে কপট সমাজহিতৈষী বলে আখ্যায়িত করেন। "যদিও বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের দুহিতা বলা হয়, কিন্তু বাংলা ভাষা লালিত ও বিকশিত হয়েছে মুসলিম সেবকদের কোলে।" তাই বাংলা ভাষা হিন্দু ও মুসলমানদের যৌথ সম্পদ। বাংলা ভাষা ত্যাগ করা হচ্ছে নিজকে ত্যাগ করা।[২৬]

নবযুগ পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী মাতৃভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা। এই ভাষা ছাড়া তারা টিকে থাকতে পারবে না। লেখকদের মতে, বহু মুসলিম পদস্থ ব্যক্তিরা মাতৃভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না, বরং তারা উর্দুকে বাঙালীদের মাতৃভাষা করতে চেয়েছিলেন। তাদের মতে, বাংলা হচ্ছে ভীরু-কাপুরুষদের ভাষা এবং নিখিল ভারতে মুসলমানদের জন্য একটি ভাষা হওয়া উচিত এবং সেটা অবশ্যই উর্দু।[২৭] প্রতিবাদে সৈয়দ এমদাদ আলী বলেন, "যে ভাষা বাংলার সাধারণ কৃষককে পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে আপনাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে, সেই ভাষাকে সরিয়ে একটি বিদেশী ভাষা চালু করা কি সম্ভবপর হবে..... না হলে শিক্ষার সুষ্ঠ অগ্রগতিকে বাধা দেয়ার জন্য তথাকথিত নেতাদের এই নিষ্ফল প্রচেষ্টা কেন?[২৮] সৈয়দ এমদাদ আলীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো খুবই বাস্তবধর্মী– যেহেতু শিক্ষা ভাষার সাথে সংশিষ্ট তাই উন্নতি শিক্ষার সাথে জড়িত। কৃত্রিমভাবে তৈরী একটি ভাষা সমস্যার কারণে যদি সমাজের উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে সেটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। 'মাতৃভাষা ও জাতীয় সমৃদ্ধি' শীর্ষক এক প্রবন্ধে ইসমাঈল হোসেন সিরাজী মাতৃভাষাকে পৃষ্ঠপোষকতা ও জাতীয় সমৃদ্ধির মধ্যে কোন বিভেদ রেখা টানেননি। তার মতে, মাতৃভাষা হচ্ছে হৃদয়ের ভাষা। তাই মাতৃভাষা পবিত্র ও ইবাদত সমতুল্য। মাতৃভাষাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচর্যা না করা মহা অপরাধ।[২৯] মুসলমান সমাজে প্রায়ই বাংলা শেখাকে ইংরেজী শেখার মতো ধর্মবিরোধী বলে মনে করা হতো।[৩০] বাংলা না জানাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার

২৫. ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারী ১৯০৩, পৃঃ ২১-২২।
২৬. নব-নূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ বাংলা, পৃঃ ৫৯।
২৭. নব-নূর, পৌষ ১৩১০ বাংলা, পৃঃ ৩৪৮।
২৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৪।
২৯. ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯০২।
৩০. প্রাগুক্ত, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০১, পৃঃ ৩০৮।

www.pathagar.com

দাবী এ সময় থেকে শুরু হয়। এভাবে বাংলাকে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রদান এবং জাতীয় জীবনে বাংলা ভাষাকে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় চেতনা সঞ্চার করা যেতে পারে। বাংলা-উর্দু বিতর্কের পাশাপাশি আরবী-ফার্সি ও সংস্কৃত শব্দ নিয়েও বিতর্ক শুরু হয়। এমন ভাষায় সাহিত্য রচনার জন্য এ সময় বলা হতো যাতে বাঙালী মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিপুল সংখ্যক আরবী-ফার্সি শব্দ থাকে। ভাষা যাতে কোন অবস্থাতেই হিন্দুদের ব্যবহৃত সংস্কৃতের অনুরূপ না হয়। হান্টার কমিশনের কাছে লেখা এক জবাবে আবদুল লতিফ এই বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি আরবী ও ফার্সি শব্দের সংমিশ্রণে বাংলা ভাষায় মুসলিম বৈশিষ্ট্য দিতে চেয়েছিলেন। স্পষ্টত এর ফলে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা সহজতর হতো এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংস্কৃতির সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হতো। সৈয়দ নওয়াব আলী তার 'ভারনাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল' নামক গ্রন্থে স্কুলের পাঠ্য বইয়ে সংস্কৃত ধাঁচের বাংলা চালু করার বিরোধিতা করেন।[৩১] বাংলার মুসলমান লেখকরা এই বিতর্কে অনেকাংশে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। অনেকে পৃথক ভাষা চালুর স্বপ্ন দেখে। যেহেতু মুসলমানদের সামাজিক জীবনে ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতি-নীতির প্রতিফলন ঘটে, তাই আরবী-ফার্সি শব্দের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে উঠে। কিছু কিছু ধর্মীয় শব্দের কোন সমার্থক শব্দ নেই। মীর্জা মুহাম্মদ ইউনুস 'দুগ্ধ সরোবর' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাতে ব্যাপকভাবে আরবী-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করা হয়। ইউসুফ আলী বলেন, "কিছু আরবী, ফার্সি, হিন্দি এবং অন্যান্য ভাষা থেকে উদ্ভূত শব্দ যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলাদেশের পল্লী জনগণের কথ্য ভাষায় মিশে গেছে, সেগুলো 'দুগ্ধ সরোবরে' ব্যবহার করা হয়েছে।" এর সমালোচনায় একজন হিন্দু একটি ইংরেজী পত্রিকায় বিদ্রূপ করে বলেন "মুসলমানদের রান্নাঘরে জ্বাল দেয়া দুধ ছিলো হিন্দুদের জন্য অস্পৃশ্য এজন্য ঐ দুধের স্বাদ বুঝতে পারিনি।"[৩২] মীর্জা ইউসুফ আলী এই মন্তব্যকে সহজভাবে নিতে পারেননি। পরবর্তীতে তার সম্পাদনায় 'নূর-আল-ঈমান' প্রকাশিত হলে তিনি স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে কিছু যুক্তি পেশ করেন।[৩৩]

"আমরা মুসলমান, বাংলা ভাষার যে সব শব্দ আমাদের পরিবারের সদস্য, চাকর-চাকরানী এবং প্রতিবেশীরা ব্যবহার করে তা অবশ্যই আমাদের রচনায় ব্যাপকভাবে থাকতে হবে। আধুনিক বাংলা ভাষার জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষাকে অলঙ্কৃত করার সময় বাদশাহ, দরবার ইত্যাদির পরিবর্তে রাজাধিরাজ, চক্রবর্তী ইত্যাদি

৩১. Syed Nawab Ali Chowdhury. Vernacular Education in Bengal. Calcutta, 1900. P. 10.

৩২. নূর-আল-ঈমান, শ্রাবণ ১৩০৭।

৩৩. ডক্টর মুস্তফা নূরুল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত (১৯০১-১৯৩০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭, পৃঃ ৩২৮-৩২৯।

www.pathagar.com

শব্দ ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। যদি আল্লাহ নূর-আল-ঈমানকে কবুল করেন তাহলে বাংলা ভাষা গোলাপের সৌরভ ছড়াবে।"

এতে আরো লেখা হয়, যারা পাঠশালায় (প্রাইমারী স্কুল) হিন্দু শিক্ষকের কাছে হিন্দুদের লেখা পাঠ্য বইয়ের মাধ্যমে বাংলা শিখে তারা তোতা পাখির মত সংস্কৃত ভিত্তিক শুদ্ধ বাংলা শিখে। সংস্কৃত পন্ডিতরা বলা ও লেখার সময় শুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করেন। তারা অপরিবর্তনীয় এবং ইসলাম ধর্মের সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত ইসলামী শব্দগুলো বাদ দেন এবং তাদের লেখায় ঐসব শব্দের সংস্কৃত সমার্থক শব্দ ব্যবহার করেন।..... সজীব ও স্বাভাবিক বাংলা ভাষাকে পন্ডিতদের কবলমুক্ত করতে পারলে বাংলার গ্রামীণ মুসলমান সমাজে প্রভূত উন্নতির সূচনা হতে পারে।..... বাংলাকে হিন্দুর ভাষা বলে ঘৃণা না করে তাকে সময় ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা দরকার।[৩৪] সৈয়দ এমদাদ আলী 'মাতৃভাষা ও বাঙালী মুসলমান' প্রবন্ধে মুসলমানদের জন্য পৃথক ভাষার প্রয়োজনীয়তার আভাস দেন। তিনি বলেন, বাংলা ভাষার নয়া যুগে আমরা একটা স্থান করে নিতে পারি এবং সেটা আমাদের জন্য অপরিহার্য। যদি আমরা ব্যর্থ হই তাহলে মুসলমান সমাজ ধীরে ধীরে তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলবে এবং হিন্দু চেতনা ও আদর্শে উজ্জীবিত বাংলা পড়াশুনা করে এক অদ্ভুত অবস্থায় গিয়ে পড়বে। বাংলা ভাষার নতুন ধারা সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলমান সমাজকে হিন্দু প্রভাবিত বাংলা ভাষার ধারা থেকে পৃথক করা সম্ভব হবে এবং তাতে বাংলা ভাষা বা দেশের কোন ক্ষতি হবে না বরং তাতে বাংলা ভাষা অধিকতর সমৃদ্ধ হবে। যদিও সম্প্রদায় বিশেষের কারণে বাংলা ভাষাকে ভিন্ন ধরনের মনে হবে কিন্তু তাতে ভাষার মৌলিক কোন পরিবর্তন হবে না।[৩৫] একই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেন 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকা সম্পাদক মুহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন। তিনি লিখেছেন, যেদিন আমরা জাতীয়তাবাদী শব্দ, জাতীয় বিশ্বাসের চেতনা ও ধর্মীয় মনস্কতা বাংলা ভাষায় ধারণ করতে পারবো, সেদিনই মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ব্যবহারের সুফল পুরোপুরিভাবে অর্জিত হবে। আরবী, ফার্সি ও উর্দু ভাষার চর্চা এদেশে বন্ধ হয়ে গেলে আমরা মুসলমানরা হিন্দুতে পরিণত হব। সেই অবস্থায় আমাদের অস্তিত্ব বুদ্ধদের মত হিন্দুত্বের মধ্যে হারিয়ে যাবে।[৩৬] এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিতে শুধু হীনমন্যতাই নয়, বরং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হীন স্বার্থপরতাও ফুটে উঠেছে। নতুন ধরনের বাংলাভাষা চালু করাটা নিজদের অযোগ্যতা ঢাকা দেয়ার কৌশল আর হিন্দুত্বের ভীতিকে এক্ষেত্রে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

---

৩৪. নূর-আল-ঈমান, ভাদ্র ১৩০৭ বাংলা।

৩৫. নব-নূর, পৌষ ১৩১০ বাংলা, পৃঃ ৩৪৯।

৩৬. ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারী ১৯০৩, পৃঃ ২১ (পাদটীকা)।

www.pathagar.com

ভাষা ও শব্দ কোষের মত সাহিত্যের বিভিন্ন দিক ও কাঠামো নিয়েও পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে আলোচনা-সমালোচনা হতে থাকে। 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় নাটকের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা প্রকাশিত হত। ইবনে মা'জ তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেন। তার মতে, নাটকে অভিনয় একটি বড় ধরনের গুনাহ। বিষবৎ এই কাজটি যে দেশের তরুনদের বিরাট ক্ষতি করছে, তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। সাধারণভাবে এগুলো হচ্ছে গুনাহর ক্ষেত্র।[৩৭] নাটকের ফলে সমাজের ক্ষতির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে লেখক আরো বলেন, যদি নাটকের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা মুসলমানদের মানসিক ক্ষতিসাধন করে এবং তাদের নৈতিক অধঃপতনের কারণ হয়, তাহলে সেজন্য কি নাট্যমঞ্চের মালিক ও সম্পাদকরা দায়ী নন?[৩৮] নাট্যসাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত তাই নাটকে অভিনয়ের বিরোধিতা ছিল নাটককে শিল্প হিসেবে অস্বীকার করা। সঙ্গীত ও নৃত্যের মতই যাত্রা ও নাটক ইসলামে বৈধ নয়, এই বিশ্বাসের কারণে নাটক বিরোধী মনোভাব জোরদার হয়েছে।

বাংলা ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে 'লাহিড়ী' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সমালোচনা করে ইসলাম প্রচারক সমিতির সম্পাদক মন্তব্য করেন, সন্দেহ নেই মুসলমান কবি সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা সার্বিক বিবেচনায় রুচিশীল কিন্তু সামাজিক অবস্থার জন্য আমরা শংকিত। বাংলার মুসলমান সমাজ এখনো গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। যাদেরকে শিক্ষিত বলা হচ্ছে, তারা নির্জীব অবস্থায়। আমরা পুরোপুরি ইংরেজী ধাঁচে কবিতা লেখা সমর্থন করি না। মুসলমান ধাঁচে লেখা কবিতা উপেক্ষা করার মত নয়। আমরা আশা করি সম্পাদক সাহেব বিষয়টি বিবেচনায় আনবেন।[৩৯]

ইংরেজী ধাঁচের কবিতা বলতে সমালোচক সম্ভবত আধুনিক গীতি-কবিতার কথা বুঝাতে চেয়েছেন। বাংলার মুসলিম সমাজের সমসাময়িক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি কবিতায় ভাবপ্রবণতার বিরোধিতা করেন। ঘুমন্ত ও নির্জীব জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য তখন জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত কবিতার প্রয়োজন ছিল। এই ধারণায় প্রভাবিত হয়ে ইসমাঈল হোসেন সিরাজীও কল্পনাপ্রবণ, বিষয়হীন নিছক গীতি-কবিতার বিরোধিতা করেন। তিনি একজন সৃজনশীল লেখক ছিলেন, তথাপি কখনো সংবেদনশীল শিল্পভিত্তিক কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেননি। তিনি সময় ও সমাজের প্রয়োজনে ধর্ম, শিক্ষা, এবং বিজ্ঞান বিষয়ে লেখার সুপারিশ করেন। 'নবনূর'-এ তিনি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জাতি গঠন ও সমাজের উন্নয়নে সাহিত্যের ব্যাপক

৩৭. প্রাগুক্ত, মার্চ-এপ্রিল ১৯০০, পৃঃ ২৮৫।

৩৮. পাগুক্ত।

৩৯. প্রাগুক্ত, নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৯৯, পৃঃ ১৯০-১৯১।

www.pathagar.com

অবদান রয়েছে, কিন্তু সব ধরনের সাহিত্য তা করতে পারে না। তার মতে, "সাহিত্যের মূল্য রাজকোষের চাইতে বেশী।" পক্ষান্তরে অপসাহিত্যের কদর্য অনুভূতি, ভাবধারা ও চিন্তা অন্য যে কোন গর্হিত কাজের চাইতে বিপজ্জনক। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ও গল্পের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে তিনি আশংকা প্রকাশ করে বলেন, সাপ্তাহিকী থেকে সাময়িকী পর্যন্ত সব পত্র-পত্রিকা আষাঢ়ে গল্প এবং অবাস্তব প্রেম কাহিনীতে ভরা। এসব উপন্যাস ও গল্পের পরিবর্তে ইতিহাস, দর্শন, মহাকাব্য, বিজ্ঞান, ধর্মীয় সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, জীবনী, প্রত্নতত্ত্ব এবং জীববিদ্যা পড়লে কি বেশী লাভ হতো না?[৪০] হিন্দু লেখকদের অনুসরণে লঘু ভাবধারার কাল্পনিক উপন্যাস ও কবিতা লেখা মুসলমান লেখকদের উচিত হবে না, কারণ মুসলমান সমাজ দুস্থ ও অধঃপতিত। এখন প্রয়োজন বাজে সাহিত্য নয়, চেতনাদীপ্ত উন্নত চিন্তার সাহিত্য। তার আবেদন ছিল, "ভাইসব সাবধান! বাঙ্গালী মুসলমানরা পাপে নিমজ্জিত। দয়া করে প্রেমের বিষ ছড়িয়ে ফসল নষ্ট করবেন না। আপনারা এটা করতে থাকলে বাঙ্গালী মুসলমানদের আর রক্ষা নেই।"[৪১] 'রায়নন্দিনী'র ভূমিকায় ইসমাঈল হোসেন সিরাজী লিখেছেন, একই দেশের বাসিন্দা হিসেবে মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে সুসম্পর্ক কাম্য কিন্তু এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, বাঙ্গালী ভাইয়েরা তাদের আর্য পূর্বপুরুষদের অতীত গৌরবগাঁথার কথা জপে জপে বিরোধের বীজ বপন করছে। দেশের কল্যাণের স্বার্থে তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলার কর্তব্যবোধ থেকে আমি 'রায়নন্দিনী' লিখেছি।[৪২]

মহাকবি কায়কোবাদও ধর্মীয় চিন্তা ও আদর্শবাদ থেকে তার লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। শিব মন্দিরের ভূমিকায় তিনি লেখেন, সুসাহিত্য অবহেলিত ও ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম।..... সাহিত্যে তথাকথিত সাহিত্যিকদের চিত্রিত কদর্য চরিত্র সমাজকে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই গ্রন্থে আমি ভাল ও খারাপ চরিত্রের সংকট তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং পাপাচারের অনিবার্য পতন দেখিয়েছি।[৪৩] হিন্দু লেখকরা দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করার জন্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসেবে তাদের অতীত গৌরবগাঁথা, পৌরাণিক কাহিনী ও ইতিহাসকে টেনে আনেন। একইভাবে মুসলমান লেখকরাও তাদের অতীত গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক চরিত্র এবং ধর্মীয় বিষয়াদিকে প্রতিপাদ্য করে সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। নবজাগরণের মুহূর্তে স্বজাতির বীরদের অতীত গৌরবময় কীর্তি ও মহান চরিত্র জাতিকে অনুপ্রাণিত করে। উদাহরণ স্বরূপ উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে ওহাবী ও ফরায়েজী আন্দোলনের সময় ধর্মীয়

৪০. নবনূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ বাংলা, পৃঃ ৫৯-৬০।
৪১. প্রাগুক্ত, আষাঢ়, পৃঃ ১০৩।
৪২. সিরাজ রচনাবলী (উপন্যাস) কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ১৯৬৭, পৃঃ ৫।
৪৩. কায়কোবাদ, শিব মন্দির, ১৯২১ (ভূমিকা)।

www.pathagar.com

চেতনা পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস চালানো হয়।

উনিশ শতকের সপ্তম দশকে ইসলামী বিশ্বরাষ্ট্র (Pan-Islamism) প্রতিষ্ঠার ধারণা উত্থাপন করেন সৈয়দ জামালুদ্দিন আল-আফগানী (১৮৩৮-১৮৯৭)। বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি তার বাণী হচ্ছে প্রথমত সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলা, দ্বিতীয়ত ভয়-ভীতি ঝেড়ে মুছে সংগঠন ও কৌশলকে কাজে লাগানো। কেননা সংগঠন ও কৌশলই হচ্ছে পাশ্চাত্যের শক্তির মূল উৎস। তৎকালীন সময়ে যাকে কেন্দ্র করে মুসলিম জাহান ঐক্যবদ্ধ হতে পারতো সেটা ছিল ইস্তাম্বুল। এটা এজন্য যে, ইস্তাম্বুল ছিল তখন খেলাফতের কেন্দ্র। এখনও তুরস্কই হচ্ছে তুলনামূলকভাবে আধুনিক ও উন্নত মুসলিম শক্তি।[৪৪]

ইসলামী বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণা উপমহাদেশের মুসলমানদের আলোড়িত করে। বিদেশী শক্তির কাছে স্বাধীনতা হারিয়ে নিজেদের অধঃপতিত মান-মর্যাদা সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন হয়ে উঠা মুসলমানরা ইসলামী বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণায় নতুন আশা ও ভবিষ্যতের ব্যাপারে অসাধারণ আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠে।

ইসলামী বিশ্বরাষ্ট্রের ধারণা জাতীয় রাষ্ট্র বা জাতীয় সীমানাকে স্বীকার করে না– এই ধারণা মুসলিম জাহানের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বকে উৎসাহিত করে। ওহাবীরা বৃটিশ শাসিত ভারতকে 'দারুল-হারব' (বিধর্মী শাসিত জনপদ যেখানে ইসলামী জীবন যাপন সম্ভব হয় না) ঘোষণা করে মুসলিম শাসিত আফগানিস্তানে হিজরত করার জন্য মুসলমানদের আহ্বান জানায়। এসব কারণে ভারতের মুসলমানরা আরব ও ইরানী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে হিন্দু সাংস্কৃতিক উত্থানের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি মুসলমানদের শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয় এবং তাদের মধ্যে ইসলামী জাতিসত্তার অনুসন্ধান শুরু হয়। উনিশ শতক পর্যন্ত তারা বারবার এই জাতিসত্তা অনুসন্ধান করেছে। তবে তা সামাজিকভাবে ঊর্ধ্বমুখী যাত্রার জন্য নয়, বরং পৃথক সাংস্কৃতিক সত্ত্বার জন্য।[৪৫] সাহিত্যে হিন্দুবাদকে পরিহার করার প্রশ্ন তখন জোরদার হয়। মুসলমানদের আত্মসম্মানবোধ এত প্রখর হয়ে উঠে যে নবাব আবদুল লতিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে মুসলমান-বিরোধী ইংরেজী বই অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, "ইলিয়ড পড়ে গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী জানার চেয়ে দেশে ছাত্রদেরকে সোহরাব-রোস্তম পড়িয়ে প্রাচ্যের দুই মহান বীরের সাথে পরিচিত করানো বেশী দরকার।"[৪৬] সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী গ্রামের স্কুলে পাঠ্যসূচীর

৪৪. Struggle for Independence 1857-1947 (A Pictorial Record) Pakistan Publications, Karachi, March, 1958, P-36.

৪৫. রফিউদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২০-১২২।

৪৬. ইনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২০।

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত হিন্দু ধর্মের পরিচিতির বিরুদ্ধেও একই ধরনের আপত্তি তোলেন। হিন্দু লেখকদের রচিত পাঠ্যপুস্তকে হিন্দু দেবী ও দেবতা এবং পৌরাণিক কাহিনী প্রাধান্য পায়। মুসলমান ছাত্ররা তাদের ধর্ম, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে তেমন কিছু জানতো না। হিন্দু সাহিত্য ও ইতিহাসে মুসলমানদেরকে প্রধানত খলনায়ক ও খুনী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে এসব পড়ে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে খারাপ ধারণা জন্মাতো। তাই নবাব আলী চৌধুরী প্রশ্ন তোলেন, "আমাদের সভ্যতা ও পূর্বপুরুষদের গুণের পরিবর্তে শুধু দোষ শেখানোর জন্যই কি আমরা ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে পাঠাচ্ছি?"[৪৭]

১৮৮৬-৮৭ সালে ঢাকার 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর' বার্ষিক সম্মেলনে বলা হয়, "শিক্ষিত মুসলমানদের অনেকে হযরত ঈসার (আঃ) পূর্বপুরুষদের জীবনী পর্যন্ত অনায়াসে বলতে পারে। তারা শ্রীকৃষ্ণের ষোল শত গোপিনীর নাম পর্যন্ত জানে। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা কি তা জিজ্ঞেস করা হলে তারা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। এটা বড় দুঃখের বিষয় যে, স্কুলগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই।..... তাই মুসলমান অভিভাবকদের বলা হচ্ছে তারা যেন ছেলেমেয়েদেরকে ইংরেজী বা বাংলা শিক্ষা না দেন। বস্তুত ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে আমাদের সামাজিক বন্ধন ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।"[৪৮] প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যবইয়ের বিরুদ্ধে 'নূর-আল-ঈমান' পত্রিকায় লেখা হয়, পাঠশালায় যে পাঠ্যবই পড়ানো হয় তা রাম-রাবন ও কুরুপান্ডবের যুদ্ধসহ নানা হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে ভরা। মুসলমান ছাত্রদেরকে এগুলি পড়তে হচ্ছে। ফলে তারা হিন্দু রীতি-নীতি রপ্ত করছে। শুধু তাই নয়, তারা ইসলাম ও ইসলাম রীতি-নীতির প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী বই-পুস্তক পড়তে বাধ্য হচ্ছে। এতসব প্রতিকূলতার মধ্যে তারা কিভাবে আত্মসম্মান ও জাতীয় মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন হবে?[৪৯] একই ধরনের আপত্তি তুলে একজন লেখক 'বাসনা'-তে লিখেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত ইসলামের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, মুসলমান বীর-বীরাঙ্গনাদের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী, মুসলিম দরবেশদের ইতিহাস এবং পয়গম্বরদের জীবনী, বাদশাহ ও সুলতানদের ইতিহাস, ইসলামের আদর্শ, হাদীসের মর্মকথা, নামায-রোযার গুরুত্ব ইত্যাদি সহজ বাংলায় প্রকাশের সর্বাত্মক চেষ্টা করা এবং এসব বিষয় স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা।[৫০]

সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গি লেখকদের মধ্যেও একই ধারণার জন্ম দেয়। তারা লেখায় একদিকে ধর্মীয় অধিকার ও সামাজিক সুবিচারের প্রতি এবং অন্যদিকে সময় ও

৪৭. সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।
৪৮. ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী, ১৮৮৬-৪৮ (কার্যক্রম), পৃঃ ৬-৭।
৪৯. নূর-আল-ঈমান, শ্রাবণ, ১৩০৭ ঢাকা।
৫০. বাসনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ বাংলা।

www.pathagar.com

সমাজের দাবীর প্রতি বিশেষ মনোযোগী হয়েছেন। তৎকালীন সময়ে মুসলমানদের লেখা উপন্যাস ও নাটকের সংখ্যা ছিল খুবই কম এবং সেগুলির মানও তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। বিষয়বস্তু ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা মুক্ত ও প্রাঞ্জল সাহিত্য রচনায় একটি বড় বাধা। যারা সমাজ নির্দেশিত দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য রচনার চেষ্টা করত তারা ক্ষুদ্র ধারণায় আটকা পড়ে যেতো। এ ধরনের মেকি সাহিত্য সমাজের কাজে আসতে পারে কিন্তু তা সজীব ও সাবলীলতা হারিয়ে ফেলে। তৎকালীন সময়ে মুসলমানদের সাহিত্যে এ ধরনের দুর্বলতা দেখা যেতো। চেতনা, ভাষা, শব্দ, আত্মবিশ্লেষণ ও নবজাগরণের আকাংখা সব কিছুই সেখানে ছিল কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার সংস্পর্শে সেগুলি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। যদিও মুসলমান লেখকরা বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করে কিন্তু বিষয়বস্তুর ব্যাপারে তারা নিরপেক্ষ ছিলেন না। ফলে প্রকৃত অর্থে কোন সাহিত্য তারা সৃষ্টি করতে পারেননি। এ জন্য তাদেরকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামই এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম তার অমিয় জীবনী শক্তি ও প্রতিভা দিয়ে সব ধরনের সামাজিক বাধা ও অর্গল অতিক্রম করতে সক্ষম হন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়া

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলার সমগ্র জনগণ মূলতঃ দুটি প্রধান ধর্মীয় শিবিরে বিভক্ত ছিল– হিন্দুবাদ ও ইসলাম। এ সময় মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল মুসলমান।[১] ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। ইসলামের উদার নীতির প্রতি নিম্নবর্ণের হিন্দুরা আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। ফলে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মুসলমানদেরকে নিম্ন মর্যাদার লোক হিসেবে গণ্য করতে থাকে। এমনকি উনিশ শতকের শেষ পর্যন্তও হিন্দুদের ঘরে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের প্রবেশাধিকার ছিল না।[২] উপরন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলোতেও পানি পান করার জন্য মুসলমানদের ঘরের আঙিনায় হিন্দুদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হতো। রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[৩]

তারাচাঁদ ও অন্যান্যদের মতে, উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমানের একেবারে পৃথক সংস্কৃতি যেমন ছিল না, তেমনি দুই সম্প্রদায়ের একক কোন সংস্কৃতিও ছিল না। তবে দীর্ঘদিন যাবৎ একত্রে বসবাসের কারণে উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখা যেত।[৪] কিন্তু দীর্ঘ ছয় বা সাতশ' বছর একত্রে বসবাসের পরও উভয় সম্প্রদায় কঠোরভাবে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতো। এটা সত্য যে, বৈষ্ণবদের উপর সুফীবাদের প্রভাব ছিল এবং মুসলমান কবিরাও বৈষ্ণব পদাবলী লিখেছেন। বাউলরাও হিন্দু ও

---

১. R. C. Majumder. History of Freedom Movement in India. Vol. 1. Calcutta. 1963. P. 32.

২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬-৩৭।

৩. রবীন্দ্র রচনাবালী, চতুর্বিংশ খন্ড, বিশ্ব ভারতী, ১৯৬৫, পৃঃ ২৬২।

৪. Tarachand. Influence of Islam on Indian Culture. Allahabad. 1946. P. 137.

www.pathagar.com

মুসলমানদের দিকে ঝুঁকেছেন। পীরতন্ত্র ও গুরুবাদের মধ্যে মিল রয়েছে তথাপি ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন যাপনে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার ব্যবধান সুস্পষ্ট। এনামুল হকের ভাষায়, হিন্দু-বাংলা সাহিত্যে যেমন আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মুসলমান প্রভাব উপলব্ধি করি, তেমনি মুসলিম-বাংলা সাহিত্যেও একইভাবে হিন্দু প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, হিন্দু বা মুসলমান একে অপরকে ধর্মান্তরিত করেছে। এটা মুসলমানদের সংস্কৃত অধ্যয়ণ এবং হিন্দুদের ফার্সি অধ্যয়ণের ফলশ্রুতি হতে পারে।[৫]

হিন্দু-মুসলমান দীর্ঘদিন একত্রে বসবাসের কারণে পরস্পরের উপর এই প্রভাব পড়েছে। একইভাবে বিভিন্ন স্থানীয় সংস্কার ও সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতির সংমিশ্রণও ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু এসব তেমন উল্লেখযোগ্য বিষয় নয় এবং তা জীবনের অপরিহার্য দিককেও স্পর্শ করতো না। সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই যথারীতি পরস্পর থেকে পৃথকভাবে অবস্থান করতো।[৬]

বাংলায় মুসলমানদের আবির্ভাবের সূচনা থেকে হিন্দু ও মুসলমানগণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে আসছিল। উনিশ শতকের প্রথম দিকে কিছু বিক্ষিপ্ত সাম্প্রদায়িক গোলযোগ সত্ত্বেও হিন্দু এবং মুসলমান শান্তিকামী প্রতিবেশীর মত বসবাস করতো।

শুধুমাত্র নবাব সিরাজদ্দৌলা ও মীর কাসিমের পতনের মাধ্যমেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন নিশ্চিত হতে পারেনি। কোম্পানীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বস্তুত ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত একশ' বছরের কোম্পানী শাসন ছিল রাজস্ব নীতি ও অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমে শোষণ ও নির্যাতনের সময়। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে উপর্যুপরি অসন্তোষ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। প্রতিরোধের এসব ঘটনায় হিন্দু ও মুসলমান যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে। বিদ্রোহী ফকির ও সন্ন্যাসীগণ ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে এবং দীর্ঘদিন তা কোম্পানীর জন্য মাথা ব্যথার কারণ ছিল।[৭] সাংগঠনিক ব্যবধান সত্ত্বেও বৃটিশ-বিরোধী অভিন্ন মনোভাবের কারণে মুসলমান ফকির ও হিন্দু সন্ন্যাসীরা পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি আসেন। ফকির নেতা মজনু শাহের সাথে সন্ন্যাসী নেতা ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরানীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।[৮] স্থানীয় মুসলমান তাঁতীরাও সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে।[৯]

---

৫. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ, ১৩৭০ বাংলা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪, পৃঃ ৪৫।

৬. মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।

৭. J. M. Ghose. Sanyasi and Fakir Raiders in Bengal. Calcutta. 1930. P. 62.

৮. নরহরি কবিরাজ, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা ১৯৫৭, পৃঃ ৫৩।

৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২।

www.pathagar.com

ভারতীয় অর্থনীতিতে শিল্পায়ন বিরোধী নীতি গ্রহণের কারণে সাধারণ মানুষের দুর্দশা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।[১০] দেশের এই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ (স্বাধীনতা যুদ্ধ) সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। বৃটিশরা এই বিদ্রোহকে নিছক সিপাহীদের অবাধ্যতা অথবা সামন্তবাদ উত্থানের চেষ্টা হিসেবে অভিহিত করেছে। পক্ষান্তরে ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান ও ভারতে সিপাহী বিদ্রোহকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম জাতীয় অভ্যুত্থান হিসেবে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে মূল্যায়ন করা হয় এবং উভয় দেশে অত্যন্ত গৌরব ও সম্মানের সাথে সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।

সমসাময়িক বাঙালী হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করেন না। তারা এই বিদ্রোহকে নিজেদের স্বার্থহানিকর মনে করে।[১১] তার একটি কারণ হচ্ছে, ঠিক রামমোহনের পর থেকে শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুরা সাধারণত ইংরেজ বিরোধী কোন আন্দোলনকে সমর্থন করতেন না। ইংরেজদের দমন-নিপীড়ন সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল থাকা সত্ত্বেও রামমোহন ইংরেজদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার কতিপয় সংস্কারমূলক দিক সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন। সুতরাং তার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ– প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন এবং জনগণের মধ্যে কোন প্রকার অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে অধিকতর নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চর্চার উপযোগী করে তোলা।[১২]

বস্তুত রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের আন্তরিক প্রয়াসে হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের ফলে হিন্দু সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন গড়ে উঠে এবং ক্রমান্বয়ে বাংলায় এক শিক্ষিত হিন্দ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। হিন্দুদের মধ্যে তখন তিনটি স্রোত লক্ষণীয় ছিলঃ প্রাচীন রক্ষণশীল, নব্য শিক্ষিত তরুণ বাঙালী এবং ব্রাহ্ম। প্রাচীন রক্ষণশীলরা একটি বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম চেয়েছিলেন। তরুণ বাঙালী হিন্দুরা ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতো। ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকা ছিলো উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলা। ব্রাহ্ম সমাজের সমর্থক রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ। তরুণ বাঙালী হিন্দুদের দেশপ্রেম ছিল প্রশ্নাতীত। কিন্তু তাদের কেউ তখন বৃটিশ শাসনের বিরোধী ছিলেন না। অন্যদিকে, ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাঙালী হিন্দুদের জন্য

---

১০. Ramesh Dutt. The Economic History of India. Vol. II. (2nd Edition). Delhi. 1860. Chapter-VII. PP. 73-79.

১১. Benoy Ghosh. The Bengali Intelligentsia and the Revolt. (Rebellion 1857). New Delhi. 1957.

১২. কাজী আবদুল ওয়াদুদ, 'বাংলার জাগরণ', বিশ্ব ভারতী, ১৯৬৩ বাংলা, পৃঃ ৩৭।

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। ইংরেজী শিক্ষা তাদের জন্য বড় ধরনের সুযোগ এনে দেয় এবং সে সুযোগ হাতছাড়া করে সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করা তখন বাঙালী হিন্দুদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তদুপরি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে গণআন্দোলন বা বিদ্রোহের বিরোধিতা করা। সুতরাং বাঙালী হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা করে নিজেদের শ্রেণী চরিত্রই রক্ষা করেছিলেন।[১৩]

তথাপি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় এবং সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত সিপাহী বিদ্রোহ বিষয়ক লেখায় বাংলা সাহিত্যে সামাজিক জাগরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এসব লেখায় সিপাহী বিদ্রোহকে মুসলমানদের দুষ্কর্ম হিসেবে চিত্রিত করা হয়।[১৪] যেসব হিন্দু সিপাহী বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুরা তাদেরও নিন্দা করে। সিপাহী বিদ্রোহ অবসানের পর কলকাতার ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদকগণ সিপাহী বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী হিন্দু ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেন। ঈশ্বরগুপ্ত এতে উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকারের কাছে এই মর্মে সুপারিশ করেন যে, মুষ্টিমেয় হিন্দু যে অপরাধ করেছে সে জন্য সমগ্র হিন্দু সমাজকে দোষী সাব্যস্ত করা সমীচীন হবে না।[১৫]

কয়েক বছর পর ১৮৬০ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ খানও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় একই সুরে কথা বলেন। তিনি বলেন, ভারতের মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে অনুগত। তিনি বলেন, সিপাহী বিদ্রোহে জড়িত মুষ্টিমেয় দায়িত্বজ্ঞানহীন মুসলমানের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হলে যে কোন সুস্থ চিন্তার মানুষ তাতে খুশী হবে। কিন্তু মাত্র কয়েকজন মুসলমানের অপকর্মের জন্য সমগ্র মুসলমান সমাজকে দায়ী করা যুক্তিসঙ্গত হবে না।[১৬] আত্মরক্ষার এই মনোভাব হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে পরস্পরের প্রতি বৈরী করে তোলে।

সিপাহী বিদ্রোহ অবসানের পর হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক আরো জটিল আকার ধারণ করে। বিদ্রোহের সময় হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে তাদের ঐক্য বিনষ্ট হোক ইংরেজরা মূলতঃ তাই প্রত্যাশা করেছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর তাদের সেই প্রত্যাশা পূর্ণ হয়। হিন্দুরা এই বিদ্রোহের জন্য সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের দায়ী করে। ফলে স্যার সৈয়দ আহমদের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও সিপাহী বিদ্রোহের দায়-দায়িত্ব প্রধানত মুসলমানদেরকেই বহন করতে হয়। সেই সংকটকালে ১৮৫৮ সালে

---

১৩. Benoy Ghosh. Bengali Intelligentsia and Sepoy Mutiny. Natun Shahitya. Part VIII. 1st Issue. Baishakh. 1364. B. S.. P.9.

১৪. The Sangbad Pravakar (Editorial) dated 20-06-1857. বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে 'বাংলার সমাজ চিত্র', ১ম খন্ড, কলকাতা, ১৯৬২, পৃঃ ২২৬-২৩২, ২৩৬-২৩৭।

১৫. ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, পৃঃ ৩২০।

১৬. Syed Ahmed Khan. Loyal Mohammedans of India. 1860. PP. 2-6.

www.pathagar.com

রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশিত হয়। সম্ভবত ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় মুসলিম বিরোধী মনোভাব প্রকাশিত হওয়ার আগেই 'পদ্মিনী উপখ্যান' প্রকাশ পায়। কবি রঙ্গলালের লক্ষ্য ছিল, ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু তরুণদেরকে হিন্দু ঐতিহ্য সম্পকে সচেতন করে তোলা।[১৭] তিনি কেবলমাত্র হিন্দুদের মহাত্ম্য ও আভিজাত্য প্রকাশের জন্য মুসলমানদের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোকে কদর্য হিসেবে চিত্রিত করেন। উপরন্তু 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' তিনি নিজকে বৃটিশদের অনুগ্রহ প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলমানদের চরিত্র সম্পর্কে অসত্য বিবরণ দেন।

রঙ্গলালের এই মনোভাবের পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আরো ভালো অবস্থানে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু এই মনোভাব মাইকেল মধুসূদন দত্তকে স্পর্শও করতে পারেনি। যদিও তিনি এই বিশেষ যুগ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং সময়ের আধুনিকতা তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জন করেছিলেন। এজন্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক মূল্যায়ন করতে হলে মধুসূদন দত্তের প্রতিভাকে মূল্যায়ন করতেই হবে। বস্তুত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্ত হচ্ছেন অনন্য।

মধুসূদন জীবনকে দেখেছেন গ্রীকদের মত সারল্য ও আন্তরিকতা দিয়ে। তিনি ছিলেন সামগ্রিকভাবে সৌন্দর্য সচেতন, মানবতার সুধায় সিক্ত এবং সব ধরনের সংস্কার থেকে মুক্ত।[১৮] মধুসূদন তার মহাকাব্যেও গ্রীক সাহিত্যের মত গভীর আত্মোপলব্ধি নিয়ে সমসাময়িক জীবনের প্রতীক রাবণের চরিত্র অংকন করেছেন।

মহাকাব্যের রাম হচ্ছে মঙ্গলকাব্যের ধার্মিক বীরের পূর্বপুরুষ। বাঙালী জীবনও ছিল বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ অবসানের প্রতীক। অন্যদিকে রাবণের অদম্য চেতনা, বিশাল সম্পদ, দেশপ্রেম এবং সর্বোপরি আত্মবিশ্বাসকে তৎকালীন উঠতি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুপ্রেরণার মানসচিত্রের প্রতীক হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। সে সময় হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লালিত আকাঙ্খা যেমন তাদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে পূরণ হয়নি, তেমনি রাবণও তার অসাধারণ শৌর্য-বীর্য এবং আত্মমর্যাদা সত্ত্বেও অনিশ্চিত গন্তব্যের হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে।[১৯] মধুসূদনের প্রতিভার মহাত্ম্য জীবন ও আত্মসচেতনতার নতুন মূল্যায়নের মধ্যে নিহিত এবং এই উপলব্ধির সমন্বিত ফলশ্রুতি হচ্ছে ভাষা ও নতুন পদ্য।

---

১৭. রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা ১২৬৫ (১৮৫৮) ভূমিকা।

১৮. প্রমথনাথ বিশি (সম্পাদিত) মাইকেল রচনা সম্ভার, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৬৬ বাংলা, ভূমিকা।

১৯. মোহিতলাল মজুমদার, কবি শ্রী মধুসূদন, বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, হাওড়া, ১৩৬৫ বাংলা, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

সৈয়দ আলী আহসান, কবি মধুসূদন, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪।

www.pathagar.com

তাই মধুসূদন প্রচলিত ধরনের বা রঙ্গলালের মত কোন কাহিনী রচনা করেননি। যদিও 'তিলোত্তমা সম্ভব'-এ বিষয়বস্তু গৌণ, 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। মেঘনাদ বধ কাব্যে অধিনায়ক পদে মেঘনাদের অভিষেককে বীরবাহুর মৃত্যুর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং মেঘনাদের মৃত্যু, তার শবদাহ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাহিনীগুলো অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই বর্ণনায় সুনির্দিষ্ট বৈচিত্র্য, ব্যতিক্রমধর্মী অমিত্রাক্ষর ছন্দ, ভাষার বলিষ্ঠতা এবং চরিত্র অংকনে নাটকীয় শৈলীর ফলে তা মহাকাব্যে পরিণত হয়। তাই বলা যায়, তিনি কখনো দেবতা ও দেবীর মহিমা কীর্তন বা পুরানো ইতিহাস বর্ণনা করে কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। সংস্কারমুক্ত এবং সকল ধর্মের প্রতি উদার মনোভাবাপন্ন মধুসূদন হিন্দু ধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠায় আদৌ আগ্রহী ছিলেন না। তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র রাজিয়ার উপর একটি নাটক লেখার চিন্তা করেছিলেন এবং এক চিঠিতে তিনি মোহাররমের ঘটনা অবলম্বনে মহাকাব্য লেখার সম্ভাবনা সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন।[২০]

> "ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যদি কোন মহাকবির আবির্ভাব হতো তাহলে তিনি হযরত হোসাইন (রাঃ) এবং তার ভাইয়ের শাহাদাতের ঘটনা অবলম্বনে একটি চমৎকার মহাকাব্য লিখতে পারতেন। সমগ্র জাতির অনুভূতি তার পক্ষে সমর্থন দিত। আমাদের (হিন্দুদের) এ ধরনের কোন বিষয় নেই।"[২১]

মধুসূদন ও রঙ্গলাল পরবর্তী সময়ে হিন্দু কবিদের সামনে শুধু দু'টি পথ ছিল, সাহিত্যে হিন্দু বীরদের মহাত্ম্য তুলে ধরার জন্য মুসলমান বিদ্বেষী মনোভাব প্রচার করা অথবা মধুসূদনের উদার মানবতাবাদকে ধারণ করা যেখানে ধর্ম বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক প্রবণতার কোন স্থান কবির আবেগ-অনুভূতি ও আদর্শে ছিল না। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, বাস্তব গল্প-সাহিত্যে হিন্দু কবিরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রঙ্গলালের পথ অনুসরণ করেন। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা ও সনেটের উন্নত আদর্শ তাদেরকে তেমন আকৃষ্ট করতে পারেনি।

ইংরেজী শিক্ষার সাথে একদিকে ধর্মীয় সংস্কার, অন্যদিকে সামাজিক আন্দোলন হিন্দু সমাজে পর্যায়ক্রমে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।[২২] নবগঠিত সংগঠন যে আন্দোলন গড়ে তোলে তা ছিল পুরোপুরিভাবে সাংবিধানিক পদ্ধতির। এই রাজনৈতিক সচেতনতার প্রথম ফলশ্রুতি হিসেবে ১৮৩৭ সালে 'জমিদারী এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৩] পরবর্তীতে ১৮৪৩ সালে 'বৃটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

২০. যোগিন্দ্রনাথ বোস, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৪২।

২১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৯।

২২. C. F. Andrews and Girija Mukherjee. The Rise and Growth of The Congress in India. George Allen & Union. London. 1939. P. 22.

২৩. Ram Gopal. British Rule In Inddia. Asia Publishing House. London. 1963. P. 272.

www.pathagar.com

সোসাইটির লক্ষ্য ছিল, শান্তিপূর্ণভাবে দুঃখ-দুর্দশার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরা। উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় এবং সরকারী পদমর্যাদাহীন ইংরেজরাই সোসাইটির সদস্য ছিলেন। কিন্তু অচিরেই ইংরেজরা সোসাইটির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। ১৮৫০ সালে ভারত সরকার নীল চাষীদের উপর নির্যাতন রোধ এবং তাদেরকে ইউরোপীয় এবং স্থানীয় লোকদের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য একই ধরনের বিচার ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসার জন্য ভারত কাউন্সিলে একটি বিল উত্থাপন করে। এই বিলের বিরুদ্ধে ভারতে অবস্থানকারী ইংরেজরা তুমুল আন্দোলন শুরু করে। তাদের আন্দোলনের মুখে শেষ পর্যন্ত সরকার বিল দুটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। এই ঘটনার ফলে ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটে এবং ইংরেজরা 'সোসাইটি' ত্যাগ করে।

১৮৫১ সালে শুধুমাত্র ভারতীয়দের নিয়ে সাবেক বৃটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটির স্থলে 'বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ববর্তী সংগঠনের মত এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল আইনের কাঠামোর আওতায় জনগণের দাবী-দাওয়া সরকারের কাছে তুলে ধরা। সোসাইটির সেক্রেটারী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সংগঠনকে সর্বভারতীয় রূপ দেয়ার জন্য অত্যন্ত উদ্যোগী ছিলেন। ফলে পূর্ববর্তী সংগঠনের চেয়ে এই সংগঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সচেতনতা অনেক বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠে।[২৪] কিন্তু ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর এসোসিয়েশন সকল রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করে দেয় এবং পরবর্তীতে শুধুমাত্র জমিদার শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত হয়।[২৫]

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৮৬১ সালের 'ভারতীয় কাউন্সিল আইন'[২৬] গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করে। তৎকালীন সেক্রেটারী অফ স্টেট এই আইনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন,

> "এই আইনের মাধ্যমে প্রথমবারের মত রাজকীয় আইনসভা সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট নির্দলীয় ইউরোপীয় আইন সভা সদস্যদের প্রতি স্বীকৃতি দেয় এবং ভারতের জন্য আইন প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ কাজে ভারতীয়দের অংশগ্রহণকে স্বীকার করে নেয়া হয়।"

এই আইনে ভবিষ্যৎ স্বায়ত্তশাসনের সম্ভাবনার বীজ বপন করা হয়। যদিও সে সময় স্বায়ত্তশাসনের চিন্তা লালন কিংবা অনুভব কোনটাই হয়নি।[২৭] ইংরেজী শিক্ষিত এবং

---

২৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৪।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৫।

২৬ দি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯শে আগস্ট ১৮৬১।

২৭. Rustom P. Masani. Britain in India. Oxford University Press. London. 1960. P. 53.

www.pathagar.com

উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা পেতো কিন্তু শিক্ষা ও যোগ্যতায় পশ্চাদপদ মুসলমানগণ এ ধরনের সুযোগ পেতো না।

ভারতের মুসলমানদের তুলনামূলক পশ্চাদপদ অবস্থা দূর করার জন্য নবাব আবদুল লতিফের আন্তরিক প্রয়াস এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালান। এই উদ্দেশ্যে তিনি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন।[২৮] তবে রচনা লেখা হতো বাংলায় নয়- ফার্সিতে। ১৮৬৩ সালে কলকাতায় তার 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর লক্ষ্য ছিল পরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে প্রগতির চেতনা সঞ্চার করা।

একই উদ্দেশ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৬৬ সালে উত্তর ভারতে ট্রান্সেশন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। স্যার সৈয়দ আহমদের আজীবন সাধনা ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার। তদুপরি আবদুল লতিফের মত সৈয়দ আহমদ খান মাতৃভাষার প্রতি অনীহ ছিলেন না। এ জন্য তার প্রচেষ্টা অনেক বেশী সাফল্য অর্জন করে। মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ যখন প্রাথমিক পর্যায়ে তখন ১৮৬৭ সালে কলকাতায় 'হিন্দুমেলা' গঠিত হয়। হিন্দুমেলার সদস্যদের মতামত ও প্রবন্ধ তৎকালীন বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। তাই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে হিন্দু মেলার প্রভাবের মূল্যায়ন হওয়া দরকার। "মূলত ঠাকুর পরিবারের সদস্য দেবেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথের আর্থিক ও আন্তরিক সহায়তা এবং নবগোপালের রাজনারায়ণ এন্ড এন্টারপ্রাইজের অনুপ্রেরণায় হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৯] 'হিন্দুমেলা' নামকরণের ব্যাখ্যায় বিপিন চন্দ্র পাল বলেন, "সেই সময়ে উপমহাদেশকে শুধুমাত্র হিন্দুদের বাসভূমি হিসেবে মনে করা হতো। এই দেশের উপর মুসলমান এবং খৃষ্টানদেরও যে সমান অধিকার রয়েছে, সেটা তাদের মাথায় আসতো না। এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চেতনার বশবর্তী হয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্ম সমাজ'কে একান্তভাবে হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেন এবং একই সংকীর্ণ জাতীয় অনুভূতি থেকে নবগোপাল 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠা করেন।[৩০] 'হিন্দুমেলা'র মূল লক্ষ্য ছিল, ভারতীয়দেরকে স্বনির্ভরতা ও জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করা। কিন্তু এই ভারতীয়রা ছিলো হিন্দুবাদের অনুসারী এবং এই জাতীয়তাবাদ ছিলো নিছক হিন্দু জাতীয়তাবাদ। সাহিত্যসেবীরা হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য হিন্দুমেলার আদর্শে প্রভাবিত হয়ে অনেক সময় মুসলমান বিদ্বেষী প্রচারণায় লিপ্ত হতেন। রঙ্গলালের রচনায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের যে সুপ্ত বীজ ছিল হিন্দুমেলা গঠিত হওয়ার পর তা ফলপ্রসূ হয়।

---

২৮. কাজী আবদুল ওয়াদুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯-১২০।

২৯. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৫৩ বাংলা, পৃঃ ৪৬।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭।

www.pathagar.com

রাজপুত মহিলাদের সতীত্ব গুণ দেখাতে গিয়ে রঙ্গলাল তার 'সুরসুন্দরী কাব্যে' (১৮৮৬) মোগল সম্রাট আকবরকে নারীদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনাকারী একজন লম্পট হিসেবে চিত্রিত করেন। জ্যোতিন্দ্র নাথের নাটকে মুসলিম বিদ্বেষ ছিল স্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনীতে' (১৮৬৫) একই ধরনের বিদ্বেষ ছড়ানো হয়।

স্যার সৈয়দ এবং আবদুল লতিফের মত অনুগত লোকেরা যখন নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপৃত হন, তখন বৃটিশদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম শেষ হয়নি। ইংরেজরা নির্দয়ভাবে বাংলায় ১৮৭০ সালের ওহাবী আন্দোলন দমন করে।[৩১] একইভাবে পুনায় হিন্দুদের আন্দোলন এবং দাক্ষিণাত্যের আন্দোলন তারা প্রতিরোধ করে।

অতঃপর মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কিত সরকারী নীতিতে পরিবর্তন আসে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সিপাহী বিদ্রোহের পর ডব্লিউ হান্টার মুসলমানদের অসন্তোষের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা চালান। ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হান্টারের রিপোর্টে ভারতের মুসলমানদের অসন্তোষ ও দুর্দশার কারণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে তার সম্ভাব্য প্রতিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। রিপোর্টে তিনি বাঙলার মুসলমানদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেন যে, বৃটিশ শাসনে বাংলার মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৩২] তিনি বলেন,

> "একশ' সত্তর বছর আগে বাংলার কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের গরীব হওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল; বর্তমানে তার পক্ষে ধনী থাকাই প্রায় অসম্ভব।"[৩৩]

তার মতে, মুসলমানদের দুর্দশার মূল কারণ ছিল দারিদ্র্য ও শিক্ষা বিশেষত ইংরেজী শিক্ষায় তাদের অনগ্রসরতা। মুসলমানদের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য ইংরেজী শিক্ষা নীতিতে আমূল পরিবর্তন সাধনকে অপরিহার্য বলে তিনি মতামত দেন। হান্টারের ভাষায়,

> "এটা ঠিক যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হিন্দুদেরকে কয়েক শতাব্দীর ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগিয়ে তুলেছে এবং তাদের নিষ্ক্রিয় জনগণকে সক্রিয় করে তুলেছে। কিন্তু এই শিক্ষা মুসলমানদের ঐতিহ্য বিরোধী, তাদের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী।"[৩৪]

---

৩১. W. W. Hunter. The Indian Musalmans. The Comrade Publishers. Calcutta. 1945. Ch II & III.

৩২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৯।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৮-১৬৯।

www.pathagar.com

১৮৭১ সালের ৭ আগস্ট ভারত সরকার মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কিত তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এ সম্পর্কিত প্রস্তাবে লর্ড মেও শিক্ষায় মুসলমানরা পিছিয়ে থাকায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং স্কুল ও কলেজে আরবী ও ফার্সি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনামা প্রেরণ করেন। ১৮৭৩ সালের ১৩ জুন এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮৭১ সালের আগ পর্যন্ত শিক্ষায় বাঙালী মুসলমানদের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে বলা হয়,

> "বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় বাংলাভাষী মুসলমানরা বিপুল সংখ্যায় নিম্নস্তরের স্কুলে নিয়মিত আসা-যাওয়া করলেও তারা দেখতে পেল শিক্ষার পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণীতে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত মুসলমান সমাজের রীতিনীতির চাহিদা মাফিক সুনির্দিষ্ট কোনো পাঠ্যসূচী না থাকায় তারা মোটামুটিভাবে উচ্চশিক্ষা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে।"[৩৫]

ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারে মুসলমানদের মনোভাব সম্পর্কে এতে বলা হয়,

> "ইংরেজ সরকার যেসব বিষয় পড়াতে চান তার ব্যাপারে মুসলমানরা ততো অনীহ নয়। তাদের আপত্তি হচ্ছে পড়ানোর ধরন ও পদ্ধতি নিয়ে।[৩৬]

বাংলায় নতুন করে প্রচলিত শিক্ষা নীতিতে বলা হয়, "ছোট লাট বাংলাদেশে বর্তমান পাঠ্য বিষয়ের সুসমন্বিত ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে মুসলমানী শিক্ষা পুনরায় চালু করতে ইচ্ছুক। ১৮৭১ সালে সাধারণ স্কুলসমূহে মুসলমানদের জন্য আরবী ও ফার্সি শিক্ষার বিশেষ ক্লাস চালু করার নির্দেশ জারি করা হয়। যেখানে আরবী ও ফার্সি শিক্ষার বিশেষ এই ক্লাস চালুর দাবী আসবে সেখানে তা চালু করা হবে এবং যেখানে মুসলমানরা উচ্চতর স্কুলের ক্লাসে নিয়মিত পাঠ্য বিষয়ের অতিরিক্ত হিসেবে আরবী ও ফার্সির বিশেষ ক্লাসে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উভয় ধরনের শিক্ষা নিতে চাইবে সেখানে তা চালু করা হবে। কলকাতা মাদ্রাসার কলেজ স্তরের শিক্ষাকে পুনর্বিন্যাস ও জোরদার করতে হবে এবং বর্তমানে হুগলী কলেজে আর্থিক সহায়তা দানকারী মোহসিন ফান্ডকে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাকে উৎসাহিত ও সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশের যেখানে সুবিধাজনক মনে হবে সেখানেই কাজে লাগাতে হবে। সর্বোপরি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রীতে ফার্সি ও আরবী পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।"[৩৭]

---

৩৫. Resolution of the Govt. of India on Muslim Education. 13 June 1873. Selections from the Records of the Govt. of India Home Dept. No. 205 (1866). P. 152. Select Documents. P. 181.

৩৬. Select Documents. P. 183.

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৩-১৮৫।

www.pathagar.com

একই উদ্দেশ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের সক্রিয় প্রচেষ্টায় উত্তর ভারতে 'দি মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড লিটন ১৮৭৭ সালের ৮ জানুয়ারী এই কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। স্বাগত ভাষণে বলা হয়, মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের মুসলমানদেরকে বৃটিশ উপনিবেশের যোগ্য ও কর্মক্ষম প্রজা হিসেবে গড়ে তোলা।[৩৮]

সরকারী শিক্ষা নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সত্ত্বেও মুসলমানরা সরকারী চাকুরি-বাকুরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ে। ১৮৮২ সালে তৎকালীন বড় লাটের কাছে পেশকৃত ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের এক স্মারকলিপিতে মুসলমানদের দুর্দশা লাঘবের আহবান জানানো হয়। সরকারী চাকরিতে মুসলমানদের প্রবেশের পথে এসোসিয়েশন দুটি বাধার কথা উল্লেখ করে (ক) সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সরকারী নীতির বিরোধিতা করা এবং (খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর উপর অহেতুক গুরুত্বারোপ করা। স্মারকলিপির জবাব হিসেবে ১৮৮৫ সালের ১৫ জুলাই গৃহীত সরকারী প্রস্তাবে বলা হয়,

> "এখন থেকে সাধারণভাবে প্রত্যেক প্রদেশের উচ্চতর সরকারী চাকুরিতে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা বা সম্প্রদায় ও শ্রেণী নির্বিশেষে প্রার্থীর যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে।"[৩৯]

অর্থাৎ সরকারীভাবে বলা হয় যে, এক্ষেত্রে সরকারী নীতিতে মুসলমানদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়নি। যে কোন ব্যতিক্রম বা বিশেষ ব্যবস্থার অর্থই হবে প্রশাসনের অবনতি। তৎকালীন সময়ে মুসলমানরা ছিল বাংলার মোট জনসংখ্যার ৩১ শতাংশ, অথচ চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমান চাকরিজীবীর সংখ্যা ছিল অতি নগন্য। ১৮৮২ সালের স্মারকলিপিতে এই বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। এই প্রসঙ্গে সরকারী প্রস্তাবে বলা হয়, মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ার প্রধান কারণ হচ্ছে তাদের ইংরেজী শিক্ষার অভাব। প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্য হচ্ছে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে তাদের অপারগতার অন্যতম কারণ। অবশ্য ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তাদের অনাগ্রহও এ জন্য আংশিক দায়ী। শিক্ষা কমিশনের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে আবদুল লতিফ যে মন্তব্য করেন, এখানে তা উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ও মুসলমানদের শিক্ষার তুলনামূলক মান প্রসঙ্গে নবাব আবদুল লতিফ বলেন,

> "কয়েক লাখ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে কৃষকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে মুসলমান জনগোষ্ঠী। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা স্মরণাতীত কাল থেকে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার সুবাদে সরকারী অফিসের ছাড়পত্র পেয়ে আসছে।"

---

৩৮. G. F. Graham. The Life and Work of Sir Syed Ahmed Khan. 2nd Edn. London. P. 179

৩৯. Select Documents. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৬।

www.pathagar.com

"নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়িয়ে এটা হচ্ছে সবেমাত্র সে পর্যায়ে উপনীত হওয়া যা অন্য সম্প্রদায় ইতোমধ্যে অর্জন করে ফেলেছে অর্থাৎ পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মুসলমানদেরকে যে সুযোগ দেয়া হয়েছে তার মাধ্যমে তারা নিয়োগ লাভের আশা করতে পারে।"[৪০]

যদিও সরকার শিক্ষায় মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণ এবং তার সম্ভাব্য প্রতিকার নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে আগ্রহী ছিল, কিন্তু সরকারী চাকুরিতে মুসলমানদের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা রাখতে ইচ্ছুক ছিল না।

ইংরেজী শিক্ষিত একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয়ের সাথে সাথে তারা নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠে। দীর্ঘ সময়ব্যাপী এই সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ ছিল সাংবিধানিক প্রকৃতির এবং বৃটিশ রাজকে গ্রহণের সুনির্দিষ্ট কাঠামোর আওতায়।[৪১]

উল্লেখিত সময়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। এর কারণ হচ্ছে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার অসম অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত উন্নয়ন। মুসলমানদের মনোভাব পরিবর্তনের কিছু চেষ্টা হয়েছে কিন্তু তাতে পরিস্থিতির তেমন উন্নতি হয়নি। মুসলমানরা তাদের আর্থিক অসচ্ছলতা ও সামাজিক পশ্চাদপদতার কথা বিবেচনা করে ক্রমশঃ ইংরেজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ে। মোটকথা, বিকাশমান হিন্দু জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য ছিল ইংরেজী শিক্ষা আন্দোলনের মূলধারা থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন রেখে তাদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তার দিকে ঠেলে দেয়া।

---

৪০. প্রাগুক্ত।

৪১. S. N. Banerjee. A Nation in the Making. Second Edition. Oxford University Press. London. 1925. PP. 85-86.

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভব ঃ লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০)

১৮৮৩ সালের ১৭ জুলাই প্রথম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স (সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিলো, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বন্ধুত্বপূণ মনোভাব জাগিয়ে তোলা।[১] কলকাতার তিনটি প্রধান প্রতিষ্ঠান- বৃটিশ-ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব দি জমিনদারস, দি ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব দি মিডল ক্লাস এবং দি সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন-এর যৌথ উদ্যোগে দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সালের ২৫, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর। ঠিক সেই সময় বোম্বাইয়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হয়। সুরেন্দ্র নাথের ভাষায়,

> "দু'টি সম্মেলন প্রায় একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সম্মেলনে আলোচনা হয় একই দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং উভয় সম্মেলনে একই সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়।"[২]

কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডব্লিউ সি ব্যানার্জির মতে, সর্বপ্রথম স্যার এ্যালান হিউমই ১৮৮৪ সালে কংগ্রেস গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। হিউমের চিন্তা ছিল, ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি বছরে অন্তত একবার সামাজিক সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনার জন্য একত্রিত হয়, তাহলে সেটা সবার জন্য কল্যাণকর হবে। তাদের এই আলোচনায় রাজনৈতিক চিন্তার সূত্রপাত হোক এটা অবশ্য তিনি চাননি।[৩] কিন্তু হিউম ভারতের নতুন বড় লাট লর্ড ডাফরিনকে তার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করলে বড় লাট একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কংগ্রেস গঠনের জন্য তাকে পরামর্শ দেন। ডাফরিন বলেন,[৪]

---

১. Ram Gopal. British Rule in India. Asia Publishing House. London. 1963. P. 277.

২. S. N. Banerjee. A Nation in the Making. Second Edition. Oxford University Press. London. 1925. PP. 98-99

৩. W. C. Banerjee. Indian Politics. 1893. P. VII.

৪. প্রাগুক্ত, P. VII.

www.pathagar.com

"শাসিতের মত শাসকদের স্বার্থেও এটা দরকার যে, ভারতের রাজনীতিকরা বছরে একবার মিলিত হবেন এবং সরকারের কাছে প্রশাসনের ভুল-ত্রুটি তুলে ধরবেন এবং কিভাবে প্রশাসনকে উন্নত করা যায় সে ব্যাপারে পরামর্শ দেবেন।"

ডাফরিন অবশ্য এই পরিকল্পনার সাথে হিউমের সংশ্লিষ্টতার কথা গোপন রাখার জন্য তাকে পরামর্শ দেন। হিউম যতদিন ভারতে ছিলেন, ততদিন এই গোপনীয়তা রক্ষা করেন। কংগ্রেসের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট দাদাভাই নওরোজী ১৮৮৬ সালের ২৭ ডিসেম্বর বৃটিশ সরকারের সাথে কংগ্রেসের সরাসরি সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন,

"অতঃপর আমি প্রশ্নটি সরাসরি উত্থাপন করলাম, এই কংগ্রেস কি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ বা বিদ্রোহের তরুশালা (চিৎকার উঠলো না না) নাকি এটা বৃটিশ সরকারের স্থিতিশীলতার আরেকটি ভিত্তি প্রস্তর, (চিৎকার উঠলো হ্যাঁ হ্যাঁ)। এই প্রশ্নের জবাব একটাই যা ইতোমধ্যে আপনারা দিলেন, কেননা আমাদের প্রতি বৃটিশ সরকারের অগণিত আশীর্বাদ সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত সচেতন এবং এক কথায় এই কংগ্রেসের অস্তিত্ব সেই আশীর্বাদের অন্যতম প্রমাণ।"[৫]

তিনি আরো বলেন, শুধুমাত্র জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কংগ্রেসে আলোচনা করা যাবে। বিরোধ বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন আঞ্চলিক, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিষয় নিয়ে কংগ্রেসে আলোচনা করা যাবে না।[৬] ১৮৬৬ সালের ৩০ এপ্রিল এলাহাবাদ সম্মেলনে হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য খোলাখুলিভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন,

"গোড়া থেকেই এই উপলব্ধিকে সামনে রাখা হয়েছে যে, এমন প্রশ্ন আসতে পারে বোম্বাই বাংলার সাথে, ইউরোপীয়রা স্থানীয়দের সাথে, হিন্দুরা মুসলমানদের সাথে, সুন্নিরা শিয়াদের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারে। তাই কংগ্রেসের মূলনীতিতে এসব বিষয় বাদ দেয়া হয়েছে। কংগ্রেস কেবলমাত্র সেসব বিষয়ের উপর প্রস্তাব পাস ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, যেসব বিষয়ে সকল শ্রেণীমত ও প্রদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে কার্যকর ঐকমত্য রয়েছে।"[৭]

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ক সম্মেলনের প্রস্তাবে স্পষ্টভাবে বলা হয়,

"বিষয় নির্ধারণ কমিটি এমন কোন বিষয় আলোচনার জন্য অনুমোদন করতে পারবে না অথবা কংগ্রেস সভাপতি আলোচনার জন্য অনুমতি দিতে পারবেন না,

৫. Report of the Second Indian National Congress 1886. Select Document. P. 52.

৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫-৫৬.

৭. Allan Octavian Hume. 'Speech Delivered at Allahabad'. 30 April 1888. Select Documents. PP. 141-142.

www.pathagar.com

যা উত্থাপিত হলে হিন্দু বা মুসলমান প্রতিনিধিরা সবাই সর্বসম্মতভাবে বা প্রায় সর্বসম্মতভাবে আপত্তি জানাতে পারে এবং অনুমোদিত কোন বিষয়ের উপর আলোচনার পর কোন প্রস্তাব পাশ করার জন্য পেশ করার পর সকল হিন্দু বা সকল মুসলমান প্রতিনিধি যদি সর্বসম্মতভাবে বা প্রায় সর্বসম্মতভাবে তার বিরোধিতা করে, তাহলে সেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবে। তবে এই বিধি শুধুমাত্র সেই সব বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেসব বিষয়ে কংগ্রেস ইতোমধ্যে কোন মতামত দেয়নি।"[৮]

এই প্রস্তাবের ফলে একদিকে কংগ্রেসকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠন হিসেবে দেখার সুযোগ হয়। অন্যদিকে মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে সাম্প্রদায়িক বলে প্রত্যাখ্যান করা সহজতর হয়। যদিও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে এটা করা হয়েছিল কিন্তু এতে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষিত হয়।

আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি যে, সরকার মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা ও উদ্যোগ নিয়েছে। ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমান যারা তৎকালীন সময়ে ছিল সংখ্যায় নগণ্য–সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। তবে তারা উপলব্ধি করে যে, ইংরেজী শিক্ষার পাশাপাশি বাঙালী মুসলমানদেরকে ভালভাবে বাংলা শেখা এবং নিজেদের স্বার্থে তা চর্চা করা উচিত। তারা ইংরেজীর সাথে সাথে বাংলা শেখার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য মুসলমান লেখক ও সংবাদপত্রকে অনুপ্রাণিত করতে থাকে। ১৮৭৩ সালে মোশারফ হোসেনের 'গড়াই ব্রিজ' এবং কায়কোবাদের 'কুসুম কাননে' প্রকাশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের সেই কঠোর পরিশ্রম সার্থক এবং প্রত্যাশা পূর্ণ হয়। 'গড়াই ব্রিজ' 'বঙ্গ দর্শনের' প্রশংসা লাভ করে। তবে এই প্রশংসা বইটির সাহিত্য মানের জন্য নয়, এটা ছিল মীর মোশারফ হোসেনের বিশুদ্ধ বাংলা লেখায় পারঙ্গমতার জন্য। অবশ্য 'গড়াই ব্রিজ' মীর মোশারফ হোসেনের প্রথম প্রকাশনা ছিল না। ইতোপূর্বে ১৮৬৯ ও ১৮৭৩ সালে যথাক্রমে তার 'রত্নাবলি' উপন্যাস ও 'বসন্ত কুমারী' নাটক প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ সালে তার 'গড়াই ব্রিজ' প্রকাশিত হওয়ার পর একই বছর তার 'জমিদার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। তার এই পর্যায়ের প্রকাশনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি। কায়কোবাদও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তার কাব্য 'কুসুম কাননে' থেকে এটা স্পষ্ট। কবির মতে, দু'টি অধীন জাতি হিসেবে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের প্রতি আত্মম্ভরিতা দেখানো বা পরস্পরকে ঘৃণা করার কোন কারণ নেই।

১৮৭০ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত হিন্দু কবিদের রচনায় ঐতিহাসিক বিষয়ের সংখ্যা

৮. Resolution XIII. Reports of the Indian National Congress. 1888. Select Documents. P. 153.

www.pathagar.com

ছিল ব্যাপক। এসব লেখায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে রঙ্গলালের কাব্য শৈলী অনুসৃত হয়। হিন্দু মেলার প্রভাব এসব লেখায় উপলব্ধি করা যেত। দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধ্বনি' কাব্যে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে ঘৃণ্য হিসেবে চিত্রিত করা হয়। অবশ্য তিনি তার গ্রন্থে নবাব আব্দুল লতিফের মত সমসাময়িক মুসলমান সমাজসেবীদের প্রশংসা করেন। নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধে'ও সিরাজদ্দৌলাকে কদর্য হিসেবে চিত্রিত করা হয়। তবে নবীন সেনই বাংলা কবিতায় প্রথমবারের মত রাজপুতনার পরিবর্তে বাংলাদেশ ভিত্তিক বিষয় উপস্থাপন করেন। 'পলাশীর যুদ্ধে' কবিকে বিভ্রান্ত বলে মনে হয়েছে। একদিকে তিনি সিরাজকে পাপাচারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন অন্যদিকে আবার তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের ভর্ৎসনা করেছেন। তিনি ক্লাইভকে নায়ক হিসেবে চিত্রিত করেননি বটে কিন্তু স্পষ্টত কবি নিজেকে ইরেজদের অনুকম্পা প্রত্যাশী হিসেবে প্রমাণ করেছেন। গ্রন্থের মুসলমান ও ইংরেজদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার অংশে সমসাময়িককালের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের চিত্র ভেসে উঠে। কবির মতে, ইংরেজ ও মুসলমান উভয়ই বিদেশী, তবে মুসলমানরা এ দেশে দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাসের কারণে অনেকটা স্থানীয় সমাজের অংশে পরিণত হয়েছে। দুর্গা চন্দ্রের 'মহামোঘল' কাব্যের ৩টি সর্গ যথাক্রমে ১৮৭৩, ৭৬ ও ৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। যদিও মহামোঘল ছিল ছোট গ্রন্থ কিন্তু বিষয়বস্তুতে মনে হয় কবি মোঘলদের পতনকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। গ্রন্থের প্রথম সর্গের নাম ছিল আওরঙ্গজেব, দ্বিতীয় সর্গের নাম শিবাজী এবং তৃতীয়টির নাম ছিল জয় সিং। কবি আওরঙ্গজেবকে কলঙ্কিত হিসেবে চিত্রিত করলেও শিবাজী ও জয়সিংকে নায়ক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ধীরেন্দ্রনাথ পাল রচিত 'যামিনী প্রভাতে'র (১৮৭৯) নায়কও শিবাজী। নবীন সেনের দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ 'রাঙ্গামাটি'তেও (১৮৮০) একই নায়ককে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এসব গ্রন্থে শিবাজীকে দস্যু হিসেবে চিত্রিত করা হলেও স্পষ্টতঃ তাকে হিন্দু ভারতের নবজাগরণের পুরোধা হিসেবে বরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রসন্ন কুমার নাগ রঙ্গলালের কৌশল অবলম্বন করে তার 'রাজপুতনা'তে এ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে, আকবরের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল না। যোগেন্দ্র নাথ ঘোষের 'বঙ্গের বীরপুত্র' গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিল প্রতাপাদিত্যের শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন। ১৮৮২ সালে নবীন সেন 'মহাভারত অব ইন্ডিয়া' নামক 'ত্রয়ী কাব্য' লেখার সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৮৬ সালে 'রৈবতক' শিরোনামে গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। বলাবাহুল্য যে, হিন্দু মহাভারত-এ মুসলমানদের স্থান হয়নি।

কাব্য জগতে নবীন সেনের 'অবকাশ রাগিনী' ১ম ও ২য় খণ্ড, হেম চন্দ্রের 'কবিতাবলী', দীনেশ চরণ বসুর 'কবি কাহিনী' এবং বঙ্কিম চন্দ্রের 'কবিতা পুস্তক' আলোচনার দাবী রাখে। 'অবকাশ রাগিনী'তে নবীন সেন বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও ইংরেজদের প্রতি গভীর আনুগত্য প্রকাশ করেন। রাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র

www.pathagar.com

প্রিন্স অব ওয়েলস -এর ভারত সফর উপলক্ষে 'ভারত উচ্ছ্বাস' লেখার জন্য নবীন সেন ৫০ গিনি পুরস্কার লাভ করেন। 'অবকাশ রাগিনী'তে মুসলমানদের বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কবির মতে, সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের জন্য কলঙ্ক এবং রাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় ছেলে 'ডিউক অব এডিনবরার' উপর লেখা কবিতায় বলেন, মুসলমানদের শাসনে দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের পর বাংলার হিন্দুরা আন্তর্জাতিকভাবে ইংরেজদের স্বাগত জানায়। 'পলাশীর যুদ্ধ' লেখার সময় কবির মনোভাবে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 'কবিতাবলী'র হেমচন্দ্র পুরোপুরি মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন না। অপর এক কবিতায় তিনি মুসলমানদের ঐক্যের কথা বলেছেন। দীনেশ চরণ বোসের মতে, বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান হচ্ছে একই। কবির ধারণা অনেকাংশে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে রাজপুত বীরদের শৌর্য-বীর্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতায় হিন্দু নবজাগরণের চিন্তা লক্ষণীয়। অল্প সময়ের মধ্যে এই চিন্তা পূর্ণতা পায়। ১৮৮০ সাল থেকে বঙ্গদর্শনে 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৮২ সালে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

হিন্দু কাব্যগ্রন্থ ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যখন হিন্দু পুনর্জাগরণের চিন্তা ব্যাপকভাবে গুরুত্ব পেতে শুরু করে তখন আরেকটি ঘটনা হিন্দু-মুসলমান সামাজিক সম্পর্ককে তিক্ত করে তোলে। দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮৮২ সালে গরু জবাই প্রতিরোধ করার জন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। গরু হিন্দুদের দেবী, কিন্তু তার গোশ্‌ত মুসলমানদের খাদ্য। স্বাভাবিকভাবে গরু জবাই নিষিদ্ধ করার উদ্যোগকে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে ধরে নেয়। কারণ মুসলমানদের বিশ্বাস গরুর গোশত না খেলে মুসলমান হওয়া যায় না। ফলে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক বিরোধ জোরদার হয়। সে সময়ে বিখ্যাত মুসলমান সাহিত্যিক মীর মোশারফ হোসেন 'ভারত সভা', 'জাতিসভা'-এর উল্লেখ করে দৃঢ়তার সাথে বলেন, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। সম্ভবত উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে মীর সাহেব ১৮৮৮ সালে 'গোজীবন' লিখেন। এই প্রবন্ধে তিনি মুসলমানদেরকে গরুর গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। এতে মুসলমান সমাজে দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়। রিয়াজ-আল-দীন মাশহাদী তার প্রতিবাদে ছদ্মনামে 'অগ্নিকুক্কুট' লিখেন। টাঙ্গাইলের এক ধর্মীয় সভায় মীর মোশারফ হোসেনকে 'নাস্তিক' ঘোষণা করা হয় এবং তার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে বলে ফতোয়া জারি করা হয়।[৯]

এ সময় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি হলেও দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার চেষ্টা করা হয়। মুসলমানদের সম্পাদিত তিনটি সাময়িকী এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। টাঙ্গাইলের এ হামিদ খান ইউসুফ জাই-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো 'আহমদী'। এতে অর্থ যোগাতেন করিমুন্নেছা খানম চৌধুরী। বাংলা ১২৯৩ (১৮৮৬

৯. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৬৪, পৃঃ ২৩০।

www.pathagar.com

ইংরেজী) সালের শ্রাবণে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে বাংলা ১২৯৬ সালে নাম পরিবর্তন করে 'আহমদী ও নবরত্ন' রাখা হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার লক্ষ্যে সাময়িকীতে প্রকাশিত নিবন্ধসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'উদাসী'। অন্যদিকে 'হিন্দু-মুসলিম সম্মিলনী' নামে একটি মাসিক সাময়িকী সম্পাদনা করতেন মাগুরার (যশোর) মুন্সি গোলাম কাদির। বাংলা ১২৯৪ (১৮৮৭ ইংরেজী) সালের আষাঢ়ে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষার জন্য হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতি আহবান জানান। বাংলা ১৩০৫ সালের (১৮৯৮ ইংরেজী) আষাঢ়ে 'কোহিনূর' নামে আরো একটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। এই সাময়িকীর সম্পাদক ছিলেন মোঃ রওশন আলী চৌধুরী। সাময়িকীতে প্রকাশিত 'হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও তার প্রতিকার' নামক নিবন্ধে শেখ ওসমান আলী বৃটিশদের 'বিভাজন ও শাসন' নীতি এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থানকে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি বর্ণ, বিশ্বাস ও ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে বলেন, অনৈক্যের ফলে বৃটিশ শাসনই জোরদার হবে।

রাজনৈতিক অঙ্গনেও একই ধারা লক্ষণীয়। ১৮৮৯ সালে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের ৫ম অধিবেশনে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের আহবান জানিয়ে খসড়া প্রস্তাব তৈরী হয়। মুন্সি হেদায়েত রসূল প্রস্তাবের সংশোধনী এনে ভারতীয় পরিষদে হিন্দু-মুসলমান সমান প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন। কিন্তু স্বয়ং মুসলমান প্রতিনিধিরাই তা প্রত্যাখ্যান করেন। মুসলমান প্রতিনিধিদের মধ্যে ষাট জন সংশোধনীর পক্ষে এবং তেইশ জন বিপক্ষে ভোট দেন। অধিকাংশ প্রতিনিধিই ভোটদান থেকে বিরত থাকেন।[১০]

কংগ্রেসের তৎপরতা এই পর্যন্ত সাংবিধানিক উপায়ে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া পেশ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে একদল তরুণ বিপ্লবী কংগ্রেসের কার্যপ্রণালীর কঠোর সমালোচনা শুরু করে। ১৮৯৩ সালে অরবিন্দ ঘোষ বোম্বাইয়ের 'ইন্দো প্রকাশ' এ লিখেন-

> "এমন এক যুগে যখন গণতন্ত্র এবং এ ধরনের বড় বড় শব্দ আমাদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে, তখন কংগ্রেসের মত একটি সংগঠনকে যা গণমানুষের প্রতিনিধিত্ব করে না বরং একটি ক্ষুদ্র শ্রেণীকে প্রতিনিধিত্ব করে– সত্যিকার অর্থে জাতীয় সংগঠন বলা যাচ্ছে না....।"[১১]

১৮৯৪ সালে তিনি বঙ্কিম চন্দ্র সম্পর্কে আবার লিখেন, বাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তরুণদের মধ্যে তাদের অবস্থান হারিয়ে ফেলেছেন।[১২]

---

১০. R C. Majumder, History of Freedom Movement in India, Vol. 1, Firma K. L. Mukhopadhya, Cal., 1963, P. 32.

১১. Harish Mukherjee & Uma Mukherjee, Sir Aurobindo's Political Thought, PP 75-76.

১২. Essay on Bankim Chandra Chatterjee, Published on 27th August 1894, Reprint Pandicheri, P. 47

www.pathagar.com

'বঙ্গবাসী'র মত বাংলার পত্র-পত্রিকাসমূহে কংগ্রেসের ডান প্রবণতা ও গণবিচ্ছিন্নতার সমালোচনা করা হয়। ১৮৯৭ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সম্মেলনকে বাংলার প্রতিনিধি অশ্বিনী কুমার দত্ত তিন দিনের আনন্দমেলা বলে বিদ্রুপ করেন। তার মতে, কংগ্রেসের সারা বছরের কর্মকান্ড তিন দিনের অধিবেশনে সীমাবদ্ধ। বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন কংগ্রেসের বামপন্থীদের নেতা। তিনি মহারাষ্ট্রে ১৮৯৩ সালে 'গণপতি উৎসব' এবং ১৮৯৫ সালে 'শিবাজী উৎসব' চালু করেন। এই দুটি উৎসবের ছদ্মাবরণে বৃটিশ বিরোধী তৎপরতাকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা হয়।[১৩] কিন্তু শিবাজী চরিত্রের মহিমা বর্ণনায় লিখিত তিলকের বিভিন্ন প্রবন্ধে তার মুসলমান বিদ্বেষী মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। ব্যাপক প্রচারণার ফলে হিন্দুদের কাছে 'শিবাজী' ও 'স্বরাষ্ট্র' শব্দ দুটি সমার্থক হয়ে যায়। এসময় মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব সম্পর্কে নানা ধরনের মিথ্যা ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতেও মুসলমান কবিদের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির আকাঙ্খা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়নি। 'শিবাজী' উৎসবের বছর কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' প্রকাশিত হয়। এসময় ওসমান আলীর 'দেবালা', রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী', 'শিবাজী উৎসব', কায়কোবাদের 'মহাদর্শন'-এর মত বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সবাই নিজ নিজ লেখার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান সমঝোতার চেষ্টা করেন।

১৮৯০ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের ডানপন্থী নেতৃত্বের ব্যর্থতা ছিলো স্পষ্ট। ১৮৯৬ সালের দুর্ভিক্ষ, বেকার সমস্যা এবং বোম্বাইয়ে মহামারীর প্রাদুর্ভাব রাজনৈতিক পরিমন্ডলকে জটিল করে তোলে। অন্যদিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের বিজয় জনগণের মধ্যে এশীয় শক্তির আবির্ভাব সম্পর্কে নতুন করে চেতনা সঞ্চার করে। সি এফ এন্ড্রুর লেখায় মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরা অধিক গুরুত্ব পায়। হিন্দু ও বৌদ্ধদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা তাদের মধ্যে নতুন করে আশার সঞ্চার করে।[১৪]

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ এক শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্ম দেয়। কংগ্রেসের নেতৃত্ব বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনবিহারী পাল, লালা লাজপথ রায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের মতো চরমপন্থীদের হাতে চলে যায় এবং পাল, ঘোষ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ নতুন পর্যায়ে হিন্দু আদর্শের ভিত্তিতে যে জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলে তা রাজনীতি সচেতন মুসলমানদের মধ্যে কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি।[১৫]

এই কারণে মুসলমানরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কংগ্রেসের স্ব-শাসন আন্দোলনে যোগ দেয়নি

---

১৩. A. R. Desai. Social Background of Indian Nationalism. OUP. London. 1948. P. 305.
In Farquhar. 'Modern Religious Movement in India'. London. 1924. P. 359.

১৪. Rev. C. F Andrews. The Renaissance in India. PP. 4-5. Quoted in Farquhar. P. 360.

১৫. Desai. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৭।

www.pathagar.com

এবং বৃটিশ পণ্য বর্জনেও আগ্রহ দেখায়নি। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অস্ত্র ছিল বৃটিশ পণ্য বর্জন। যদিও ১৯০৫ সালে বহু কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু তার কোনটারই মালিক মুসলমান ছিল না। তাদের দৃষ্টিতে বৃটিশ পণ্য বর্জনের মূলে ছিল বঙ্গভঙ্গ আইনের প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করা। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আইনের বিরোধীরা এই আইনকে রাজনৈতিকভাবে অগ্রসর হিন্দুদের মোকাবিলায় পশ্চাদপদ মুসলমানদের সমর্থন লাভের কৌশল বলে ব্যাখ্যা করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে আবদুল রসূল, আবুল কালাম আজাদ, মুজিবর রহমান এবং মোহাম্মদ আকরম খাঁর মত মুষ্টিমেয় কয়েকজন বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। সংখ্যায় নগণ্য হওয়ার কারণে তাদের তেমন কোনো প্রভাব ছিলো না। পক্ষান্তরে ঢাকার নবাবগণ এবং তাদের সহযোগীরা বঙ্গভঙ্গে খুবই খুশী হয়েছিলেন।

শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর মহামান্য আগা খানের নেতৃত্বে একটি মুসলমান প্রতিনিধিদল তৎকালীন বড় লাটের সাথে সাক্ষাৎ করে চাকুরি, নির্বাচন, প্রশাসন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার সুপারিশ করেন।[১৬] লর্ড মিন্টো মুসলমানদের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন।[১৭] ভারতের মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারতীয় মুসলিম লীগ ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর জন্মলাভ করে। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত পঠিত হয় তা হচ্ছে-

> "(১) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঢাকায় সমবেত মুসলমানদের এই সভা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে যে, কয়েকটি উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নেয়ার জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা হবে। উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে, (ক) বৃটিশ সরকারের গৃহীত কোন ব্যবস্থার প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য বোধ জাগিয়ে তোলা; (খ) ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা, তাকে এগিয়ে নেয়া এবং মুসলমানদের প্রয়োজন ও আকাঙ্খাকে সম্মানজনকভাবে সরকারের কাছে তুলে ধরা; (গ) মুসলিম লীগের অন্যান্য উদ্দেশ্যের ক্ষতি না করে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বৈরী মনোভাব প্রতিরোধ করা।[১৮]

অপর প্রস্তাবে বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে বৃটিশ পণ্য বর্জন আন্দোলনকে অগ্রাহ্য করা হয়।

---

১৬. Select Documents. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯০-১৯৮।
১৭. Desai. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৮।
১৮. Select Documents. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯০-১৯৪।

www.pathagar.com

"(১১).... এই সভা মনে করে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত তাদের কল্যাণার্থে বঙ্গভঙ্গ অনিবার্য এবং পণ্য বর্জনের মত যে কোন ধরনের বিরোধ বিক্ষোভকে দৃঢ়তার সাথে নিন্দা ও নিরুৎসাহিত করতে হবে।"[১৯]

অন্যদিকে কংগ্রেসের ১৯০৫ ও ১৯০৬ সালের অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ রদ এবং বৃটিশ পণ্য বর্জন আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ বাড়তে থাকে এবং ১৯০৬ সালে সুরাটে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশন দু'গোষ্ঠীর মধ্যে বাকবিতন্ডার ফলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সরকার বিস্ফোরক আইন, ভারতীয় মুদ্রণ শিল্প আইন, নয়া সংবাদপত্র আইন এবং সরকার বিরোধী সভা-সমাবেশ আইন ইত্যাদি জারি করে বৃটিশ পণ্য বর্জন আন্দোলন ও সহিংসতা দমনের চেষ্টা চালায়। ডানপন্থী নেতা গোখলে এক চিঠিতে লিখেছেন, "এতে বামপন্থীরা সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে যায়। বাঙালী হিন্দুদের আবেগ ও সহানুভূতি বামপন্থীদের দিকে চলে যায়। অন্যদিকে হিন্দু-মুসলমান তুমুল বিরোধের ফলে পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে।"[২০]

১৯০৮ সালে মুসলিম লীগের অমৃতসর অধিবেশনে স্থানীয় পরিষদসমূহ, প্রিভি কাউন্সিল এবং চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের বৃহত্তর প্রতিনিধিত্বের দাবী উত্থাপন করা হয় এবং মুসলিম লীগের আন্তরিক প্রচেষ্টায় মার্লি-মিন্টো সংস্কারের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়। এই সংস্কারে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চরম আকার ধারণ করলে হিন্দু রাজনীতিকরা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ব্যাপারে অধিক মাত্রায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। সাহিত্যিকদের মধ্যেও এই আগ্রহ সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ মুসলমান গাড়োয়ানদের হাতে ভ্রাতৃত্বের রাখি বন্ধন বাঁধতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু শিগগিরই তিনি এসব প্রয়াসের অসারতা উপলব্ধি করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, হিন্দু ও মুসলমান শুধু পৃথক জাতিই নয়, বরং তারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। এসময় তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের চাইতে উভয়ের মধ্যে সমতা বিধানই বেশী প্রয়োজন বলে বিবেচনা করেন।[২১] দ্বিজেন্দ্রলাল বিভিন্ন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 'আলেখ্য' (১৯০৭) ও 'পৃথ্বিরাজ' (১৯১৫) এবং 'শিবাজী' (১৯১৮) গ্রন্থে স্বদেশী নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে কটুক্তি করেন। অন্যদিকে যোগেন্দ্র নাথ বোস হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ব্যাপারে আগ্রহ প্রদর্শন করেন।

---

১৯. প্রাগুক্ত।

২০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৮-১৬৯।

২১. সোমেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, বসুধারা প্রকাশন, কলকাতা ১৩৬৭ বাংলা।

www.pathagar.com

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিবেশে সন্ত্রাসী আন্দোলন বিস্তার লাভ করে এবং তা অনেকাংশে হিন্দু তরুণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই আন্দোলনের ভূমিকা ছিলো অবিসংবাদিত। কিন্তু সন্ত্রাসীদের গোঁড়া মনোভাবই এই আন্দোলনের সবচেয়ে দুর্বল দিক। তিলক যেহেতু হিন্দুবাদ ও দেশপ্রেমকে পরস্পরের পরিপূরক মনে করতেন, তাই সন্ত্রাসী আন্দোলনের প্রতিনিধিরাও ধর্মীয় আবেদনকেই জনগণকে সংগঠিত করার কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে। ১৯০৮ সালের ২ মে বারিন্দ্র কুমার বরোদার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তার সাক্ষ্য দান কালে বলেন,

> "আমি তখন বাংলায় ফিরে আসি। আমি বিশ্বাস করতাম দেশের জন্য নিছক রাজনৈতিক প্রচারণা চালানো উচিত নয় বরং জনগণকে বিপদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য অবশ্যই আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ নিতে হবে। আমি একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চিন্তা করি।"[২২]

উপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যেও একই বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়েছে,

> "আমি ভেবে দেখলাম ধর্মের মাধ্যম ছাড়া ভারতের অধিকাংশ লোককে দিয়ে কোন কাজ করানো যাবে না, তখন আমি কয়েকজন সাধুর (ধর্মীয় তাপস) সাহায্য চাই। সাধুরা ব্যর্থ হলে আমি স্কুল ছাত্রদের উপর নির্ভর করি। তাদের সংগঠিত করে তাদেরকে ধর্মীয়, নৈতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা দিই।"[২৩]

সন্ত্রাসীদের জন্য 'ভগবত গীতা' ও 'বিবেকানন্দের' গ্রন্থাবলী পড়া বাধ্যতামূলক ছিল। স্রষ্টার ইচ্ছার কাছে প্রশ্নাতীত আত্মসমর্পণ তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ছিল। মওলানা আবুল কালাম আজাদের আত্মজীবনীতে সন্ত্রাসীদের মুসলমান বিদ্বেষী মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। মওলানা আজাদের ভাষায়,

> "বস্তুতঃ তখন সব বিপ্লবী দলগুলো ছিল সক্রিয়ভাবে মুসলমান বিদ্বেষী... বিপ্লবীরা মনে করতো মুসলমানরা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পথে বাধা, তাই অন্য বাধার মত মুসলমাদেরকেও অবশ্যই নির্মূল করতে হবে।"[২৪]

এমনকি মওলানা যখন স্বদেশী আন্দোলন সমর্থন করেন এবং সন্ত্রাসীদের দলে যোগ দিতে চেয়েছিলেন তখনও তাকে সন্দেহের চোখে দেখা হয় এবং দূরে সরিয়ে রাখা হয়। মোট কথা, হিন্দু সন্ত্রাসীদের মুসলমান-বিদ্বেষী ও গোঁড়া মনোভাব হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে তিক্ত করে তোলে।

---

২২. Sedition Committee Report. Calcutta 1918. Select Documents. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৭।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৭-২০৮।

২৪. Abul Kalam Azad. India Wins Freedom. Orient Longmans. Calcutta. Reprint. April. 1967. P.4

www.pathagar.com

১৯১১ সালে অনুষ্ঠিত দিল্লী দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করা হয়। মুসলমান বিশেষ করে ঢাকার নবাবগণ এতে অসন্তুষ্ট হন। তাদের শান্ত করার ব্যবস্থা হিসেবে সরকার ঢাকায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। এভাবে শেষ পর্যন্ত ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হয়। ভারতের সুন্নী মুসলমানরা তুরস্কের সুলতানকে 'খলিফা' হিসেবে সম্মান করতেন। তাই তাদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। ১৯১৩ সালে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে সুস্পষ্টভাবে স্বায়ত্তশাসনকে দলের লক্ষ্য বলে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়। মূলত তখন থেকে মুসলিম লীগ নতুন যুগে পদার্পণ করে। কংগ্রেস কর্মী ব্যারিস্টার মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সেই অধিবেশনে যোগ দেন এবং তখন থেকে মুসলিম লীগে অভিজাত ও সমাজের উঁচু মর্যাদার মুসলমানদের চাইতে বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য অনুভূত হতে থাকে।[২৫]

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে গান্ধী কংগ্রেসে যোগ দেন এবং সেই বছর (১৯১৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষ নেয়। এ সময় তুরস্কের উপর ইংরেজদের আক্রমণ মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসে। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা ও স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে তারা ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ফলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ে সাংবিধানিক সংস্কার প্রশ্নে মন্টেগো-চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে।[২৬] এই বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে মন্টেগো-চেমসফোর্ড রিপোর্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একদিকে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সরকারী নির্যাতনও চরম পর্যায়ে পৌঁছে।[২৭] প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর খেলাফত এবং তুরস্কের ভবিষ্যতই ভারতের মুসলমান নেতৃবৃন্দের সামনে প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। তারা মুসলমানদের মনোভাব বড়লাটকে জানানো প্রয়োজন বলে বিবেচনা করেন। ১৯২০ সালের ২০ জানুয়ারী গান্ধী, তিলক ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দিল্লীতে মুসলমান নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে খেলাফত প্রশ্নে মুসলমানদের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ করেন।[২৮] মুসলমানদের একটি প্রতিনিধিদল বড়লাটের সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাদের মতামত ইংল্যান্ডে বৃটিশ সরকারের কাছে পেশ করার জন্য পরামর্শ দেন। ইংল্যান্ডে তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার লিওড জর্জের কাছে যে প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়, তাতে মুহাম্মদ আলী, সৌদ হোসেন, সৈয়দ সোলায়মান এবং এইচ এম

---

২৫. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪।

২৬. Select Documents. প্রাগুক্ত, ২০৮-২১০ ও ২৬৬-২৭০।

২৭. Report of the Committee Appointed to investigate Disturbances in The Punjab (The Jalianwalahbagh Firing. 13 April. 1993. Select Documents PP. 210-215.

২৮. দৈনিক আজাদ, ২০শে জনুয়ারী ১৯২০ ইংরেজী।

www.pathagar.com

ইয়াহিয়া ছিলেন। ১৯ মার্চ প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন, কিন্তু লিওড জর্জ পরিষ্কারভাবে বলেন,

> "আমি চাইনা ভারতের কোন মুসলমান এটা মনে করুক যে তুরস্কের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের ফলে আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি.... তাই আমি চাইনা ভারতের কোন মুসলমান এটা মনে করুক যে আমরা খৃস্টানদের ব্যাপারে এক নীতি এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রে আরেক নীতি অবলম্বন করছি। বরং আমি চাই ভারতের কোন মুসলমান এটা মনে না করুক যে তুরস্কে এসে আমরা সেই নীতি ত্যাগ করছি যা আমরা জার্মানী ও অষ্ট্রেলিয়ার মতো খৃস্টান দেশে কঠোরভাবে অনুসরণ করেছি।"[২৯]

এসময় গান্ধী তার অসহযোগের ডাক দেয়ার ধারণা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলের নেতৃবৃন্দের কাছে উত্থাপন করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ গান্ধী তার অসহযোগ নীতি অনুসরণ করে আসছিলেন। তার মতে, দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি 'সত্যাগ্রহ' শব্দটি আবিষ্কার করেন।[৩০] তিনি ঘোষণা করেন যে, সত্যাগ্রহের মূল বিষয় হচ্ছে অহিংসতা ও অসহযোগিতা।[৩১] সরকারের নিবর্তনমূলক নীতির বিরুদ্ধে 'সত্যাগ্রহ' মেনে নেয়ার ব্যাপারে প্রথম দিকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষের নেতাদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু ১৯২০ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে গান্ধীর নীতি গৃহীত হয়। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীর নেতৃত্ব, তার রাজনৈতিক দর্শন এবং স্বরাজ অর্জনের লক্ষ্য গ্রহণের ফলে কংগ্রেসের ভূমিকায় পরিবর্তন আসতে থাকে। কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী মধ্যবিত্ত আন্দোলন গণবিপ্লবী আন্দোলনে রূপ নেয়।[৩২] কিন্তু কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশন চলাকালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি সাময়িকভাবে হলেও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন বাংলা সাহিত্যে কবি নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। সেই সময়ের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির পরিবেশ নজরুল ইসলামকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। তার কবিতা ও গানের একটি প্রধান বিষয় ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি। তিনি যে আদর্শের সূচনা করেন তা হচ্ছে মানবতাবাদ এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির আকাঙ্খা অংশত এই আদর্শ থেকে উদ্ভূত।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। অল্প দিনের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক মুক্তি সংগ্রামের সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে

---

২৯. The Time. 22 March 1920. Select Documents . প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২০।

৩০. Young India. November. 1919. PP. 11-13.

৩১. Resolution V. Report of the 34th Indian National Congress. 1919. P. 65. Select Documents. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১০।

৩২. Philips. Introductory Notes. Select Documents. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০১।

www.pathagar.com

যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামকে হিন্দু বৈশিষ্ট্যে রূপ দেয়ার জন্য গান্ধীর চেষ্টাই এর অন্যতম প্রধান কারণ। তিলক ও সন্ত্রাসবাদীদের মত গান্ধীও স্বাধীনতা সংগ্রামকে হিন্দুমুখী করার জন্য একটি উপাদান সংযোজন করেন। দেশাই-এর ভাষায়,

> "গান্ধীর মত নেতৃবৃন্দও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধারণা অনুপ্রবিষ্ট করার প্রায়ই চেষ্টা চালাতেন। উদাহরণ স্বরূপ, গান্ধী 'স্বরাজকে' ব্যাখ্যা করতেন 'রামরাজ' বলে যে ঐতিহাসিক স্মৃতি মুসলমানদের উৎসাহিত করতে পারেনি।[৩৩]

সঙ্গত কারণে কংগ্রেসের আন্দোলন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের কাছে হিন্দু আন্দোলন হিসেবে প্রতিভাত হয়। বস্তুত ভারতের সংবিধান সম্পর্কিত মতিলাল নেহরু কমিটির (১৯২৮) সুপারিশে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে কোন কিছুই বলা হয়নি। ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কলকাতা অধিবেশনে মুসলিম লীগ এই রিপোর্ট গ্রহণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আগা খানের সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী অংশ ১৯২৯ সালের ১ জানুয়ারী দিল্লীতে নিখিল ভারত মুসলমান সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার দাবী জানানো হয়। পরবর্তীতে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের আরেকটি অধিবেশনে জিন্নাহ মধ্যম পথ অবলম্বনের ব্যর্থ চেষ্টা চালান। অন্যদিকে, মুসলমানদের দাবীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারী কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। ১৯৩০ সালে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে লীগের সভাপতি আল্লামা ইকবাল দিল্লী মুসলমান সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে বলেন,

> "ভারতের মুসলমানরা এমন কোন সাংবিধানিক পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারে না যা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার ক্ষুণ্ন করবে, যা পাঞ্জাব ও বাংলায় পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারে, অথবা এমন কোন পরিবর্তনও তারা মানতে পারে না যাতে যে কোন কেন্দ্রীয় আইন সভায় তাদের ৩৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তাকে ব্যাহত করতে পারে।"[৩৪]

১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ভারতের গোল টেবিল সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে বিষয়টি পুনরায় আলোচিত হয়।[৩৫] ১৯৩৫ সালের প্রশাসনিক সংস্কার আইন অনুযায়ী

---

৩৩. দেশাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৬।

৩৪. Indian Quarterly Register. Vol. 11. PP. 337-344.

৩৫. Indian Round Table Conference. 3rd Session. 27th December. 1932 Select Documents, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০১৭।

www.pathagar.com

১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর কংগ্রেস নেতাদের উদ্দেশ্য মুসলিম লীগের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস বিজয়ী হয়ে সাতটি প্রদেশে সরকার গঠন করে। কিন্তু হিন্দু সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য মুসলিম লীগ প্রস্তাব দিলে কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে বলা হয়,

> "কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্ব বিশেষ করে গত দশ বছরে গৃহীত নীতির মাধ্যমে যা একান্তভাবে হিন্দুদের স্বার্থরক্ষক ভারতের মুসলমানদেরকে ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন করার জন্য দায়ী এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠনের পর থেকে তারা নিজেদের কথা, কাজ ও কার্যক্রমে এটাই বারবার প্রমাণ করেছে যে তাদের কাছ থেকে মুসলমানরা কোন ন্যায় বিচার বা সততা আশা করতে পারে না। যেখানেই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে এবং যেখানেই সম্ভব হয়েছে সেখানেই তারা মুসলিম লীগকে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে তাদের মুচলেকায় স্বাক্ষর করার দাবী জানিয়েছে।"[৩৬]

১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের পাটনা সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে জিন্নাহ বলেন,

> "আপনাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যে, কংগ্রেস বর্তমানে ঠিক রাজকীয় ফ্যাসিবাদী কায়দায় হিন্দু-বিরোধ নিষ্পত্তির সকল আশা-ভরসা শেষ করে দিয়েছে। কংগ্রেস ভারতের মুসলমানদের সাথে কোন নিষ্পত্তি চায় না। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হিসেবে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন, কংগ্রেস চায় মুসলমানরা বিরোধ নিষ্পত্তিকে সংখ্যাগুরুর দান হিসেবে গ্রহণ করুক.....কংগ্রেস একটি হিন্দু সংগঠন ছাড়া কিছু নয়। এটাই সত্য এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তা জানেন।"[৩৭]

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে জিন্নাহ স্পষ্ট ভাষায় হিন্দু ও মুসলমানকে দু'টি পৃথক জাতি বলে উল্লেখ করে ঘোষণা করেন,

> "মুসলিম ভারত এমন কোন সংবিধান মেনে নেবে না যার অনিবার্য ফলশ্রুতি হবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার। হিন্দু ও মুসলমানদেরকে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একত্রিত করা যায়। এ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুর উপর জরবদস্তির অর্থ হচ্ছে 'হিন্দুরাজ' প্রতিষ্ঠা।"[৩৮]

বস্তুত মুসলমানদের সামনে পৃথক রাষ্ট্রের চিন্তা করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ছিল না।

---

৩৬. Jamal Uddin Ahmed (ed). Speeches and Writings of Jinnah. 1974. Vol.-1. P-30.

৩৭. Select Documents. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫০-৩৫১।

৩৮. Speeches and Writings of Jinnah. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮০।

www.pathagar.com

এটা স্বীকৃত সত্য যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের আশায় সাধারণভাবে বাঙালী মুসলমানরা একটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছিল।[৩৯] সাথে সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান লেখকরাও মনে করেছিলেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলে তারা বৃহত্তর ভূমিকা পালনের সুযোগ পাবেন। অমলেন্দু দে'র মতে, পাকিস্তান প্রস্তাব একদিকে পৃথক রাজনৈতিক সত্তা গঠনের ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে অনেক দূর এগিয়ে দেয় এবং অন্যদিকে, এর ফলে মুসলমান লেখকরা হিন্দু লেখকদের প্রভাব এড়িয়ে একটি পৃথক পথ অনুসরণের জন্য অনুপ্রাণিত হয়। এভাবে 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' সমসাময়িক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকেও অনেকখানি প্রভাবিত করে।[৪০] এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানের জন্ম লগ্নে কোন ধরনের অবস্থা বিশেষতঃ বাংলায় কোন ধরনের পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল তা খতিয়ে দেখতে হবে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের শুধুমাত্র নীলনকশা প্রণীত হয়। বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এ. কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) এ মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল নিয়ে স্বায়ত্তশাসিত সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে।[৪১] প্রকৃতপক্ষে এই প্রস্তাবে একাধিক রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে, যদিও প্রস্তাবিত এসব রাষ্ট্রের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক কি হবে সে সম্পর্কে তখন কিছুই বলা হয়নি। পরবর্তী বছর মুসলিম লীগের মাদ্রাজ সম্মেলনে লীগের লক্ষ্য হিসেবে পৃথক রাষ্ট্রের দাবীটি গৃহীত হয়।[৪২]

যদিও মুসলিম লীগ এই প্রস্তাবকে 'লাহোর প্রস্তাব' নাম দিয়েছে, কিন্তু এটা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবেই পরিচিত। পাকিস্তানের ধারণার[৪৩] প্রতি সহানুভূতিহীন সংবাদ মাধ্যম প্রস্তাবটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করার কারণেই অংশত প্রস্তাবটি 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে পরিচিত হয়ে যায়। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল এবং মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ক্রমশ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে। মুসলিম লীগ 'পাকিস্তান দাবীতে' ১৯৪৬ সালের নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করে নির্বাচনে সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই বছর দিল্লীতে

---

৩৯. Serajuddin Husain. Looking into the Mirror (Dhaka : Khoshroz Kitab Mahal. 1974). P. 1.

৪০. অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ (কলকাতা ঃ ১৯৪৪) পৃঃ ৩১০-৩১১।

৪১. Syed Sharifuddin Pirzada. Foundations of Pakistan (All India Muslim League Documents. 1906-1947). Karachi : National Publishing House Ltd. 1970) P. 341.

৪২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭১।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২৫-৪২৬।

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ আইন সভা সদস্যদের কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের মৌলিক সংশোধন করা হয়। বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এক জোরালো সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা দিয়ে ভারতের মুসলিম প্রধান অঞ্চলসমূহ নিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[৪৪] বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম এতে আপত্তি করলেও প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়।

পরবর্তী বছর দেশ বিভাগের প্রাক্কালে হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী (১৯০১-১৯৫৩) গভর্নর ব্যারোসের সাথে আলোচনার পর বঙ্গ বিভাগের দাবী পেশ করেন।[৪৫] এই দাবীর বিরুদ্ধে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা গঠনের জন্য সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম একত্রে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে হাত মেলান। সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক বাংলা প্রজাতন্ত্র গঠনের জন্য তারা প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা চালান এবং অস্থায়ী সরকার গঠন প্রশ্নে কর্মসূচী প্রণয়ন করেন।[৪৬] আসামের জনগণ প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সর্বসম্মতিক্রমে রাষ্ট্রের নাম 'বঙ্গাসাম' করার জন্য একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে।[৪৭] এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত বাংলার একটি দলছুট অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসেও কেন এ বিপর্যয় হলো তা কখনও জানা সম্ভব হয়নি। তার কারণ হচ্ছে সম্ভবত যারা এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী ছিলেন তাদের কেউ বেঁচে নেই এবং মৃত্যুর সময় এই ব্যর্থতার প্রতিকার হিসেবে তারা কোন স্বীকারোক্তি করে যাননি।[৪৮]

বৃটিশ সরকার এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের চক্রান্ত এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য দায়ী।[৪৯] আবুল হাশিম এ সম্পর্কে একটু আভাস

---

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১৩।

৪৫. Nicholas Mansergh (Editor in Chief). The Transfer of Power 1942-47. Vol-X (London : Her Majesty's Stationary Office 1981).
Abul Hashim. In Retrospection (Dhaka : Mowla Brothers. 1974) PP 109-110.

৪৬. সিরাজুদ্দিন হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।

৪৭. ওয়ালিউল্লাহ : 'আমাদের মুক্তি সংগ্রাম', ২য় সংস্করণ (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৭) পৃঃ ৩৭৮-৩৭৯)।

৪৮. মোঃ ওয়ালিউল্লাহ, যুগ বিচিত্রা (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৬৭), পৃঃ ৫৩০।

৪৯. M. A. Rahim. Muslim Society and Politics in Bengal : 1757-1947 (University of Dhaka. 1978) PP. 324-339.
Shila Sen. Muslim Politics in Bengal : 1937-1947 (New Delhi : Impex India. 1976) P. 243.

www.pathagar.com

দিয়েছেন। বঙ্গবিভাগের পূর্বে এক বিবৃতিতে তিনি এ জন্য ইঙ্গ-মার্কিন ও ভারতীয় পুঁজিপতিদেরকে ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত করেন, যারা সমাজতান্ত্রিক ধারণার বিকাশে ভীত ছিল।[৫০]

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার পর থেকে বেশ কয়েক বছর তেমন কোন সাংগঠনিক তৎপরতা ছিল না। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে মাওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৯-১৯৬৮) ছিলেন মুসলিম লীগের সভাপতি এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম ছিলেন যথাক্রমে সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক। তখন থেকে মুসলিম লীগে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব অনুভূত হয়। দলের মধ্যে তিনটি গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও খাজা নাজিমুদ্দিন সামন্ত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতেন, আবুল হাশিম সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিতেন এবং মধ্যবিত্ত বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি হিসেবে শহীদ সোহরাওয়ার্দী অপর দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতেন।[৫১] ১৯৪৪ সালে অনুষ্ঠিত দলীয় নির্বাচনে আবুল হাশিমের নেতৃত্বাধীন তরুণ অংশ অন্যদের ওপর বিপুলভাবে বিজয় অর্জন করে। তাদের অবিরাম চেষ্টায় মুসলিম লীগ সমগ্র বাংলায় একটি জনপ্রিয় সংগঠনে পরিণত হয়। দুই বছর পর পাকিস্তান ইস্যুতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মুসলিম লীগ ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে মন্ত্রিসভা গঠন করে। সোহরাওয়ার্দী মুখ্যমন্ত্রী মনোনীত হন কিন্তু বঙ্গ বিভাগের পর তিনি পূর্ব বাংলায় এই পদ থেকে অপসারিত হন এবং খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিম দেশ বিভাগের পরপরই ঢাকায় আসেননি বা আসতে পারেননি। তরুণ সমর্থকরা তাদের ঢাকা আগমনের ফলে সংগঠিত হয় কিন্তু মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বাধার মুখে তারা অগ্রসর হতে পারেননি। ফলে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ডানপন্থীদের পকেট সংগঠনে পরিণত হয় এবং দলে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র বিস্তার লাভ করে। তখন দলের নিষ্ঠাবান কর্মীরা হতাশ হয়ে পড়ে।

মুসলিম লীগের পরিমন্ডল নিয়ন্ত্রিত থাকার কারণে গণমুখী ও বাস্তব কর্মসূচী অনেকাংশে বাধাগ্রস্ত হয়। বিভাগ-পূর্ব সময়ে পাকিস্তান অর্জনের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ

---

৫০. বাংলাকে শোষণের জন্য ভারত ও ইঙ্গ-মার্কিন একশ' ভাগ বিদেশী পুঁজি পশ্চিমবঙ্গে লগ্নি করা হতো। বাংলার জনগণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা বৃদ্ধি পেলে পাছে তারা বিদেশী শোষকদের খেদাবে এই আশংকায় শোষকরা ভীত ছিল। স্বাধীন ও অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠায় তাদের সমস্যা তারা আগেভাগেই আঁচ করে ফেলেছিল। বিদেশী পুঁজির স্বার্থেই বাংলাকে বিভক্ত, পঙ্গু ও অক্ষম করে ফেলা হয়েছিল যাতে দু'বাংলার কেউ ভবিষ্যতে বিদেশী শোষকদের প্রতিরোধ করতে না পারে। সিরাজুদ্দিন হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১-১০৫।

৫১. কামরুদ্দীন আহমদ, পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকা স্টুডেন্ট পাবলিকেশন্স, ১৩৭৬ বাংলা, পৃঃ ৬৪-৬৭।

www.pathagar.com

করার কারণে দলের গঠনমূলক কর্মসূচী বাতিল করা হয়। পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পর সে সব কর্মসূচী সামনে আসে, নেতৃবৃন্দ ইসলাম, নব্য রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের সংহতির দোহাই দিয়ে সে সব কর্মসূচী এড়িয়ে যান। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশনে সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আদর্শ অনুসরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ গণতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা, কঠোরভাবে ইসলামের নীতিমালা ভিত্তিক সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সমাজ গঠনের পরিবেশ সৃষ্টির আরেকটি লক্ষ্য স্থির করে। স্পষ্টতঃ এই ধারণা ছিল কট্টর এবং তা সমাজের কোন উন্নতি করতে পারেনি। ইতোমধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য এবং আমদানিকৃত ভোগ্য পণ্যের মূল্য ক্রমান্বয়ে বেড়ে যায়। অন্যদিকে বিদেশে রফতানিযোগ্য কাঁচামালের দাম আশংকাজনকভাবে নেমে যায়। ফলে কৃষকদের আর্থিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি ঘটে।[৫২]

এসময় সারা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে দুর্ভিক্ষ শুরু হয় এবং ১৯৫০ সালে তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ১৯৫১ সালের শেষার্ধে আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং ১৯৫২ সাল পর্যন্ত চলে।[৫৩] এই বছরের শেষদিকে লবণ সংকটও দেখা দেয়। ঢাকা শহরে প্রতি সের লবণের দাম হয় ১০ টাকা এবং কোন কোন স্থানে তা ১৬ টাকায় পৌছে। দুর্ভিক্ষে আনুমানিক ২০ হাজার লোকের মৃত্যু হয়।[৫৪] পূর্ব বাংলা থেকে হাজার হাজার লোক আসামে চলে যায়।

মুসলিম লীগ গণমুখী উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করলেও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততা বা বৈরিতার কারণে সে সব কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়নি। কায়েমী শ্রেণীর স্বার্থও এক্ষেত্রে অনেকখানি দায়ী ছিল। তার প্রমাণ ১৯৫১ সালের জমিদারী বিলোপ আইন। পূর্ব বাংলার অধিকাংশ জমিদার হিন্দু হওয়ায় সরকার ভূমি মালিকানার ক্ষেত্রে জমিদারী প্রথা বিলোপের ব্যাপারে খুবই তৎপর ছিল। ফলে পরিবর্তন বলতে শুধু শোষক হিসেবে হিন্দু জমিদারের স্থলে মুসলমান ভূস্বামীরা স্থলাভিষিক্ত হয়।[৫৫]

---

৫২. A. Sadeque. The Economic Emergence of Pakistan (With Special Reference to East Pakistan) Part-1. Dhaka. 1954. PP 1-2.

৫৩. বদরুদ্দিন ওমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২য় খন্ড, ১৩৮২ বাংলা, পৃঃ ৮৮।

৫৪. Comparative Statement of the Muslim League. United Front and The Awami League. P-3.

৫৫. Kamal Siddiqui. The Political Economy of Land Reform in Bangladesh. In Inayatullay (ed) - Land Reforms : Some Asian Experiences (Kualalampur. Malayasia) : Asia and Pacific Development Centre. 1980. PP. 95-9.

বদরুদ্দিন ওমর, প্রাগুক্ত পৃ ঃ ১৫৬-১৫৮।

www.pathagar.com

মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ঢাকার পুলিশ, ছাত্র, চিকিৎসক, সরকারী কর্মচারী, সাংবাদিক, দোকানদার এবং কৃষকরা তাদের স্ব-স্ব দাবী আদায়ের জন্য গণআন্দোলন গড়ে তোলে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা সফল হয়।

এভাবে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের এক উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন বিভিন্ন উপ-নির্বাচন মুলতবি রাখেন কিন্তু তাতেও ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি দলের পতন রোধ করতে পারেননি।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আমরা উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখি। বুদ্ধিমুক্তির জন্য ১৯২৬ সালে আবুল হোসেন ও কাজী আব্দুল ওয়াদুদ 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা দূর করা। তারা ইউরোপীয় সংস্কৃতির ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন এবং উনিশ শতকের হিন্দু 'ইয়ং বেঙ্গলের' মত মুসলমান সমাজে ইউরোপীয় ভাবধারা চালু করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। তাদের মুখপত্র ছিল 'শিখা' এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা 'শিখা গোষ্ঠী' হিসেবে পরিচিত ছিল। এটা বাহ্যত মুসলমান সংগঠন মনে হলেও হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা এই সংগঠনের তৎপরতায় অংশগ্রহণ করতেন। গোষ্ঠীর নেতারা সবসময় সুষ্ঠু পরিবেশ এবং অংশগ্রহণকারী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষায় সচেষ্ট থাকতেন।

আবুল কালাম শামসুদ্দিন 'শিখা গোষ্ঠীর' সদস্যদেরকে রামমোহনের অনুসারী বলে সমালোচনা করতেন এবং আবুল মনসুর আহমদ এই সংগঠনকে সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। ঢাকার নবাব ও তাদের সহযোগীরা এবং মাসিক মোহাম্মদী ও দৈনিক আজাদ এই গোষ্ঠীর কর্মকান্ডের ঘোর বিরোধিতা করে এবং তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করে। তবে 'শিখা গোষ্ঠী' সমাজে একটি স্থায়ী ভাবমূর্তি তৈরির সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। কিন্তু দেশ বিভাগ-পূর্ব প্রতিকূল সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা ঢাকা ত্যাগে বাধ্য হলে 'শিখা গোষ্ঠীর' উদ্যোগ ব্যর্থ এবং দিশেহারা হয়ে পড়ে।

বাঙালী মুসলমান নারীরাও এসময় তাদের মুক্তির জন্য এক আন্দোলন শুরু করে। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং তিনি কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৬]

৫৬. চতুরঙ্গ, জুন ১৯৮৭ পৃ ঃ ১৬৭-১৭৮।

www.pathagar.com

১৯৩৬ সালের এপ্রিলে লক্ষ্ণৌতে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একই সালের জুলাই মাসে কয়েকজন সাহিত্য ব্যক্তিত্ব কলকাতায় 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৯ সালে এই সংগঠনের ঢাকা শাখা গঠিত হয়। সংঘের ইশতেহারে বলা হয়, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, সামাজিক পশ্চাদপদতা এবং রাজনৈতিক পরাধীনতার মত প্রধান সমস্যাবলীকে সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।[৫৭] সংঘের সভাস্থল ছিল দক্ষিণ মইসুন্ডির জোরব্রিজ লেনস্থ 'প্রগতি পাঠাগার'। সতীশ পাকরাশি, সোমেন চন্দ, রনেশ দাসগুপ্ত, কিরণ শংকর সেনগুপ্ত প্রমুখের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিয়মিত সেখানে জমায়েত হতেন। পরবর্তীতে মুনির চৌধুরী (১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে নিহত) এবং সরদার ফজলুল করিম তাদের সাথে যোগ দেন। ১৯৪০ সালে ঢাকার গেন্ডারিয়া হাইস্কুল ময়দানে সংঘের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কাজী আব্দুল ওয়াদুদ। পরবর্তী বছর জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের প্রেক্ষাপটে সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি গঠিত হয় এবং ১৯৪২ সালে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে যাওয়ার পথে সোমেন চন্দ নির্মমভাবে নিহত হন।[৫৮] এই ঘটনার সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া হিসেবে ফ্যাসিবাদ বিরোধী মনোভাব জাগ্রত হয় এবং বিপুল সংখ্যক লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রতি তাদের সহানুভূতি প্রকাশ করেন।[৫৯]

১৯৪০ সালে ক্রান্তি, সংকেত এবং সোমেন চন্দের অন্যান্য গল্প নামে সংঘের নিয়মিত সভায় পঠিত প্রবন্ধসমূহের সংকলন এবং পাক্ষিক মুখপত্র 'প্রতিরোধ' প্রকাশিত হয়।

এইভাবে প্রগতি লেখক সংঘ কবিতা, প্রবন্ধ ও গণসঙ্গীত রচনা এবং সাহিত্য সভা, সেমিনার ও সম্মেলনের মাধ্যমে ঢাকার সাহিত্য অঙ্গনে এক প্রগতিশীল ধারা সৃষ্টি করে এবং এই ধারা সিলেট, মোমেনশাহী, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, এবং রংপুরে বিস্তৃত হয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরের বিশৃংখল পরিস্থিতি এবং মুসলিম লীগ সরকারের নিবর্তন মূলক ব্যবস্থায় সংঘের অধিকাংশ সদস্য ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়। যারা থেকে যায় তাদেরকে কমিউনিষ্ট বলে কোনঠাসা করে রাখা হয়। ফলে সংঘের তৎপরতা প্রায় আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

অন্যদিকে মুসলিম লীগ ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত লাহোর প্রস্তাব অর্থাৎ ভারতকে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান এই দুটি রাষ্ট্রে ভাগ করার প্রস্তাবকে সমর্থন করলেও পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে রহস্যজনক নিরবতা পালন করে। এর অর্থ এই নয় যে, স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞরা পাকিস্তানী সংস্কৃতির স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা থেকে বিরত ছিলেন

---

৫৭. ধনঞ্জয় দাস (সম্পাদিত), মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, তৃতীয় খন্ড (কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭৮), পৃঃ ৪৫৬-৪৭৪।

৫৮. দিলীপ মজুমদার (সম্পাদিত), সোমেন চন্দ ও তার রচনা সমগ্র, ২য় খন্ড, কলকাতা ১৯৭৭।

৫৯. কিরণ শংকর সেনগুপ্ত, ফ্যাসি বিরোধী রচনা সংকলন, কলকাতা, ১৯৭৫।

www.pathagar.com

বরং শীঘ্রই এক শ্রেণীর বাঙালী মুসলমান সাহিত্যসেবী পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান বিষয়বস্তুকে সাহিত্যও সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে দুটি সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় – একটি কলকাতায় – নাম 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' (১৯৪২) এবং দ্বিতীয়টি ঢাকায় – নাম 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' (১৯৪২)। সোসাইটির আহবায়ক ছিলেন মুজিবর রহমান খাঁ। আবুল কালাম শামসুদ্দিন এবং আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ তাঁর সহযোগী ছিলেন। সংসদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ও সৈয়দ আলী আহসান। দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথম সংগঠনটির গুরুত্ব ও প্রভাব ছিল অনেক বেশী। সোসাইটির লক্ষ্য ছিল জাতীয় নবজাগরণের অনুপ্রেরণা হিসেবে পাকিস্তানবাদকে সাহিত্যে রূপায়িত করা, পাকিস্তানবাদের বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠান এবং সাহিত্যে পাকিস্তান বিরোধী মনোভাবকে প্রত্যাখান করা। সাহিত্যে পাকিস্তানবাদ বলতে তারা বুঝাতেন হিন্দুত্ব থেকে দূরে রেখে ব্যাপক আরবী, ফার্সি ও উর্দু শব্দ ব্যবহার করে বাংলার মুসলমানদের জীবনভিত্তিক সাহিত্য রচনা করা এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করে বাংলা ভাষাকে সংস্কার করা। তারা ধর্মকে সংস্কৃতির প্রধান উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেন।[৬০]

অন্যদিকে 'পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' তিনটি বিষয়ে তৎপরতা কেন্দ্রীভূত রাখার চেষ্টা করে – ইসলামের আবহমান ঐতিহ্য থেকে সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করা, ইসলামী পুঁথি সাহিত্যকে অধিকতর পরিশুদ্ধ ও নিখুঁত করে তাকে প্রচলিত সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করা এবং সাহিত্যে গ্রামীণ জীবনের ব্যাপকতর প্রতিফলন নিশ্চিত করা। ১৯৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে সংসদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রেঁনেসা সোসাইটি থেকে আবুল কালাম শামসুদ্দিন সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। শামসুদ্দিন তার বক্তৃতায় ঘোষণা করেন পাকিস্তান টিকে থাকার জন্য এসেছে। তিনি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, বরং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রেনেসাঁর বাণী পৌছে দেন। আত্মোপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই রেনেসাঁ সোসাইটি গঠিত হয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। মুসলমান লেখকরা চিন্তা ও ভাষায় হিন্দু লেখকদের অনুসরণ করছেন বলে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি অপরের অনুসরণ ত্যাগ, নিজেদের ভাবধারা প্রকাশে আরো কুশলী হওয়া এবং সাহিত্যে মুসলমানদেরকে দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। পরের বছর কলকাতায় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির' প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণে আবুল মনসুর আহমদ (পরবর্তীতে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের একজন বলিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন) পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতির মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল,

---

৬০. আবুল কালাম শামসুদ্দিন, অতীত দিনের স্মৃতিকথা (ঢাকাঃ ১৯৬৮) পৃঃ ২২৫-২৪৯।

www.pathagar.com

১. রাজনীতিকদের বিবেচনায় পাকিস্তানের অর্থ যাই হোক না কেন সাহিত্যসেবীদের কাছে পাকিস্তানের অর্থ হচ্ছে শিল্প ও সংস্কৃতির স্বাধীনতা, সংস্কৃতির স্ব-শাসন এবং সংস্কৃতির স্বায়ত্তশাসন।

২. এটা ঠিক যে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতিতে বহু বিষয়ে মিল ও সামঞ্জস্য আছে তবে এটাও স্বীকার্য যে উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে ব্যবধান ও বৈপরীত্যও আছে।

৩. ধর্মও সংস্কৃতি অভিন্ন। ধর্ম ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতি ভৌগোলিক সীমানার বাইরে যেতে পারে না, বরং ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে।

৪. জাতি হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ভারতের অন্যান্য জাতি এবং পাকিস্তানের ধর্মীয় ভাইদের থেকে পৃথক সত্তার অধিকারী।

৫. পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য অথবা বাংলার সাহিত্য বলতে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়া সাহিত্যকে বুঝায়। এটা অত্যন্ত উন্নত সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব সাহিত্যের আসরে বাংলা সাহিত্যকে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। তথাপি এই সাহিত্য পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য নয়, কারণ এটা বাঙালী মুসলমানদের তৈরী নয়। এই সাহিত্য থেকে মুসলমানরা অনুপ্রেরণার কিছু পায় না। এর পেছনে সুস্পষ্ট কারণ হচ্ছে এই সাহিত্য না মুসলমানদের রচিত না এতে ইসলামী কোন বিষয়বস্তু আছে।

৬. অথচ প্রকৃতপক্ষে বাঙালী মুসলমানদের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, নিজস্ব ভাষা আছে। সেই সাহিত্য বাঙালী মুসলমান সাহিত্য অথবা পুঁথি সাহিত্য হিসেবে পরিচিত।

৭. পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সাধারণ ভাষা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য রচনা করতে হবে। এই ভাষা সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণের রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের অনুসারী হবে না।

৮. ভাষার কথা বললেই স্বাভাবিকভাবে বর্ণমালার প্রশ্নও এসে যায়... এ ক্ষেত্রে আমি সংক্ষেপে শুধু বলতে চাই যে বর্তমান বাজে অক্ষর কাঠামো আমরা চলতে দিতে পারি না।[৬১]

---

৬১. আবুল মনসুর আহমদ, পাক-বাংলার কালচার (ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৬), পৃঃ ১৫৬-১৫৭, ১৬১-৬৯ ও ১৭৬-৭৭।

www.pathagar.com

পরে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন তার ভাষণ অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে।[৬২] বক্তৃতার বিষয়বস্তুকে তিনি লাহোর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে বলার চেষ্টা করলেও সভায় উপস্থিত খাজা নাজিমুদ্দিন, সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিমের মত মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তার ধারণাকে গ্রহণ করতে পারেননি। লেখক ও শিল্পীরাও তার অতীত সংস্কৃতি নির্ভর এই ধারণাকে কতখানি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন তাও নিশ্চিত করে বলা কঠিন।

সে যাই হোক, ১৯৪৪ সালে সংগঠনের পক্ষ থেকে কবি কায়কোবাদকে এক সম্বর্ধনা দেয়া হয়। কেননা যে সময় ইসলাম ছাড়া অন্যদের ঐতিহ্য অনুসরণের জন্য মুসলমানদের অভিযুক্ত করা হতো সে সময় কায়কোবাদ প্রাচীন ইসলামী ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছিলেন।[৬৩]

সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে পাক্ষিক 'পাকিস্তান' প্রকাশিত হয়। এই সাময়িকীর লক্ষ্য ছিল রাজনীতির সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্বলিত জাতীয় সাহিত্য নীতিকে তুলে ধরা, লোক সাহিত্যের বিষয় ভিত্তিক কবিতা রচনা এবং সাহিত্যে ইসলামী দর্শন প্রচার করা।[৬৪] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নজির আহমদ এই সাময়িকীর সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৩ সালে অর্থাৎ সোমেন চন্দ নিহত হওয়ার এক বছর পর তিনি নির্মমভাবে নিহত হন। সরকার এই ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে ইসলামীকরণের পথে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টরাই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। এই হত্যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঢাকা এবং পরবর্তীতে অন্যান্য স্থানে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যায়।

মুসলমানরা বৃটিশ প্রশাসন কর্তৃক অবহেলিত এবং চাকুরি ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এই মনোভাব তাদেরকে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি ক্রমশ আগ্রহী করে তোলে। পাশাপাশি তারা বাংলা চর্চাও অব্যাহত রাখে। গুটিকয়েক ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের লেখা মানসম্মত ছিল না। হিন্দুদের লেখা অনেক বেশী উৎকৃষ্ট ছিল। এতে মুসলমানরা হীনমন্যতায় ভুগতো এবং হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের প্রাধান্যের কাছে টিকে থাকতে পারতো না। পক্ষান্তরে হিন্দুরা সাধারণত মুসলমানদেরকে চাষাভুষা বলে অবজ্ঞা করতো। এসব চাষাভুষা লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে এবং সাহিত্যে কোন অবদান রাখবে এমন

---

৬২. আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, (নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭০) পৃঃ ২৪০-৪১।

৬৩. সরদার ফজলুল করিম, পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ১০৩-১১১।

৬৪. সৈয়দ আলী আহসান (সম্পাদিত), নজির আহমদ, কলকাতা, ১৯৪৪, পৃঃ ৭৮-৭৯।

www.pathagar.com

চিন্তাও হিন্দুরা করতো না। এই মনোভাবের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জন্ম নেয়ার আংশিক কারণ পাওয়া যায়। কেউ কেউ এই বিদ্বেষ কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করেন, কিন্তু সাধারণভাবে পরিবেশ সে জন্য উপযোগী ছিল না বলে সংঘাত এড়ানো সম্ভবপর হয়নি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই বিরোধ আবার মাথাচাড়া দেয়। তবে এ সময়ের বিরোধ ছিল মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে। একটি গোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যের স্বাভাবিক ধারা বজায় রাখতে আগ্রহী ছিলেন। অন্যপক্ষ বাংলা সাহিত্যকে ইসলামের সংস্পর্শে আনার পক্ষপাতী ছিলেন। এ সময়ের শাসক গোষ্ঠী, রাজনীতিক এমনকি কোন কোন বুদ্ধিজীবীও এই বিরোধের সুযোগে নিজেদের অবস্থান মজবুত করা এবং বস্তুগত সমৃদ্ধি অর্জনের প্রয়াস চালান।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ (১৯৪৭ পরবর্তীকাল) ও প্রতিক্রিয়া

পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তার বহু কাল্পনিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয়ে যায়। মুসলিম লীগ সমগ্র বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ বলে দাবী করে কিন্তু বাস্তবে প্রদেশ ছিল বিভক্ত। স্পষ্টত এতে কয়েকটি নতুন প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। মুসলমান লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় নজরুল ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে কলকাতায় থেকে যান। সবচে বড় প্রশ্ন দেখা দেয় পাকিস্তানীরা তাকে গ্রহণ করতে পারবে কিনা? কেননা তিনি তখন ভিন্ন দেশের নাগরিক। কাজী আবদুল ওয়াদুদ, এস, ওয়াজেদ আলী, হুমায়ুন কবির, গোলাম কুদ্দুস ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। সৈয়দ মুজতবা আলী পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে যান। এমনকি আবুল কালাম শামসুদ্দিন ও আবুল মনসুর আহমদও সাথে সাথে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে আসেননি। তারা কলকাতায় দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত থাকেন। সুতরাং নতুন সমস্যার সমাধান দেয়া ধর্মীয় বিবেচনায় যেমন সম্ভব ছিল না তেমনি সম্ভব ছিল না রাজনৈতিক বিভাজনের দৃষ্টিতে।

এই পরিস্থিতিতে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে চিন্তার ঐক্য গড়ে তোলাও সমানভাবে অসম্ভব ছিল। পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে নানা বিভ্রান্তির উদ্ভব হয়। এক পক্ষ বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদানকে বড় করে দেখে এবং অমুসলমান লেখকদের অবদানকে খাট বা অগ্রাহ্য করতে থাকে। ১৯৪৮ সালে জিন্নাহর কাছে 'রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ' যে স্মারকলিপি পেশ করে তাতে এই ধরনের মনোভাব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন সংগঠনের কেবলমাত্র মুসলমান তরুণদের নিয়ে এই কর্ম পরিষদ গঠিত হয়।[১] বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম জাতীয় ভাষা করার পক্ষে তারা যে সব যুক্তি পেশ করে তাতে বাংলা ভাষার বিকাশে শুধুমাত্র কবি আলাওল, নজরুল, কায়কোবাদ, এমদাদ আলী, ওয়াজেদ আলী, জসিমুদ্দিন এবং অন্যান্য মুসলমান সাহিত্য ব্যক্তিত্বের অবদানের কথাই উল্লেখ করা হয়। বিস্ময়ের ব্যাপারে হচ্ছে অমুসলিম হওয়ার কারণে স্মারকলিপিতে রবীন্দ্রনাথের নাম পর্যন্ত বাদ দেয়া হয়। স্মারকলিপিতে উল্লেখিত আরেকটি যুক্তি ছিল বাংলা সাহিত্যে প্রায় পঞ্চাশ

---

১. যুগান্তর, ২ এপ্রিল, ১৯৪৮।

www.pathagar.com

শতাংশ শব্দ ফার্সি ও আরবী ভাষা থেকে আগত। স্পষ্টত এটা বুঝা যাচ্ছিল যে, কর্ম পরিষদ জাতীয় ভাষা সংগ্রামে এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করার কারণ ছিল বাংলা সাহিত্যকে ইসলামী ধাঁচে গড়ে তোলার দাবী তারা প্রতিরোধ করতে পারছিল না। কেননা বাংলা ভাষা বিরোধীরা (ইসলামমনা বুদ্ধিজীবী) ইতোমধ্যেই বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার শাখা হিসেবে চিহ্নিত করে।[২]

কিন্তু পুরো ব্যাপারটা কেবলমাত্র সাময়িক কৌশল ছিল না। যারা জাতীয় ঐতিহ্য নিয়ে চিন্তা করতেন তাদের কাছে ব্যাপারটা ছিল সচেতন প্রয়াস। সৈয়দ আলী আহসান এ প্রসঙ্গে বলেন,

> "প্রাচীন পূর্ণাঙ্গ বাংলা সাহিত্যের ভান্ডার কখনো শেষ হবে না। তার ওপর রয়েছে দুই বাংলার পূর্ণ অধিকার। কিন্তু এই অধিকারের অর্থ এই নয় যে আমাদেরকে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে গ্রহণ করতে হবে। নতুন রাষ্ট্রের স্থিতির স্বার্থে আমাদেরকে অবশ্যই যুগপৎ আমাদের সাহিত্যের নতুন জীবন ও দর্শনে পদার্পণ করতে হবে। এ কথা পুরোপুরি সত্য যে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা এবং জাতীয় সংহতির স্বার্থে প্রয়োজনবোধে আমরা কবি রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত। এই বিশেষ মুহূর্তে সাহিত্যের চাইতেও জাতীয় সংহতির প্রয়োজন বেশী। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে আমাদের জাতীয় উত্তরাধিকার হচ্ছে আবহমান ইসলামী ঐতিহ্য, অসংখ্য প্রচলিত পুঁথি-সাহিত্য, অগণিত গ্রামীণ লোকসাহিত্য, বাউল এবং সংস্কৃত বহির্ভূত পল্লীগীতি।"[৩]

তিনি এ ধরনের আদর্শে পুরোপুরি প্রভাবিত ছিলেন। তাই তাঁর সম্পাদিত দুই খন্ড গল্প সংগ্রহ-এর কোথাও অমুসলিম কোন লেখকের গল্প স্থান পায়নি। পাকিস্তানের পি ই এন কর্তৃক পূর্ব বাংলার কবিতা নামে একই ধরনের আরো একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়। এই গ্রন্থে চতুর্দশ শতক ও বিংশ শতকের নির্বাচিত বাংলা কবিতা সমূহের ইংরেজী সংস্করণ স্থান পায়। এতে নজরুলের ১১টি এবং হুমায়ুন কবিরের একটি কবিতা ছিল। অমুসলিম কবিদের মধ্যে শুধুমাত্র সমসাময়িক একজন কবির একটি কবিতা নেয়া হয়। তাও এজন্য যে সেই কবিতার বিষয়বস্তু ছিল পবিত্র ঈদ। গ্রন্থের অনুবাদক-সম্পাদকের মন্তব্য থেকে কবিতা সংগ্রহের মানদন্ড কি ছিল তা আঁচ করা যায়,

> "গ্রাম বাংলা যে তাঁতী, মিস্ত্রি ও চাষীদের নিয়ে গঠিত তারা প্রধানত মুসলমান.....তারা মুসলিম উপাখ্যানের ভান্ডার ও ইসলামের ইতিহাস সন্ধান করে। পাশাপাশি তারা বিষয়বস্তুর জন্য দেশজ রীতিনীতি খোঁজে। .....প্রায়শ পূর্ব

---

২. The Morning News, 17 December, 1947 (Editorial).

৩. মাহে নও, ৩ বর্ষ, ৫ সংখ্যা (আগষ্ট ১৯৫১) সৈয়দ আলী আহসান, 'পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা'।

www.pathagar.com

পাকিস্তানী সাহিত্যের বিরুদ্ধে পৌত্তলিক বৈশিষ্ট্যের অভিযোগ আনা হয়....কিন্তু সম্ভবত এটা অত্যন্ত অযৌক্তিক অভিযোগ।... অতীতের পৌত্তলিক বীরত্বকাহিনী থেকে দৃষ্ট ভাবমূর্তি যেমন উর্দু কবিতার জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল ঠিক তেমনি একইভাবে পূর্ব পাকিস্তানী কবিরাও 'রুদ্র', 'তান্ডব', 'বীণাপাণি' 'মহাকাল' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন, যা সঙ্গদোষে এবং অনায়াসে বিমূর্ত বা মূর্তমান হিসেবে তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে উঠেছে"।[৪]

তথাপি যারা পূর্ব-পাকিস্তানী সাহিত্যে এসব শব্দ নির্মূল করার পক্ষপাতী ছিলেন তারা উপরোক্ত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

নাজিরুল ইসলাম মুহাম্মদ সুফিয়ান বাংলা সাহিত্যে পৌত্তলিকতার অভিযোগ খন্ডনে আরো একধাপ এগিয়ে যান। তিনি বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কিত একটি প্রত্যাখ্যাত ধারণা পুনরায় উত্থাপন করেন। তার মতে হিন্দু পন্ডিতরা বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভান্ডার থেকে উদ্ভূত বলে প্রমাণ করার যে চেষ্টা করছেন তা ভুল। প্রকৃত পক্ষে বাংলা ভাষা দ্রাবিড় ভাষা থেকে উদ্ভূত। আর্য-পূর্ব সময়ে দ্রাবিড় ভাষাই এখানে প্রচলিত ছিল। তাই সংস্কৃত বা আর্য ঐতিহ্যের সাথে বাংলা ভাষার কোন সম্পর্ক নেই।[৫] গোলাম মোস্তফা এই ধারণার প্রধান সমর্থক। বাংলা ভাষার সকল পন্ডিত এই ধারণা প্রত্যাখান করলেও মোস্তফা 'সাহিত্য সংকলন' সম্পাদনার সুযোগ গ্রহণ করেন। ষাটের দশকে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য এটি বাধ্যতামূলক পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বস্তুত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে বিরোধের ক্ষেত্রে গোলাম মোস্তফার ব্যক্তিগত কিছু অবদান ছিল। ১৯৫০ সালে তিনি অতীত ও সমসাময়িক সাহিত্যকে স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে একটি নয়া মাপকাঠি উপস্থাপন করেন। তার মতে সেটাই গ্রহণযোগ্য সাহিত্য যাতে ইসলামী আদর্শ স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন, যিনি তার গীতিকাব্যে জীবনের বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি এবং এ ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এক বিস্ময়কর সামঞ্জস্য আবিষ্কার করেন।[৬] রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই তার জমিদারী পরিদর্শনের জন্য তৎকালীন পূর্ব বাংলার শাহজাদপুর (পাবনা জেলা) যেতেন। সেই সুবাদে তিনি নিজের নৌকায় বসে খুব কাছ থেকে প্রকৃতিকে অবলোকনের সুযোগ পেতেন। তিনি বাউল সঙ্গীতে মোহিত হতেন, যা ধর্ম ও প্রকৃতির বিষয়বস্তু থেকে রচিত। এই সঙ্গীত ও প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি কিছু কবিতা লেখেন যেখানে আমরা বাউলদের মত জীবনের বিষয়বস্তু ও প্রকৃতির মধ্যে মিল খুঁজে পাই। একই সাথে

---

৪. Yusuf Jamal Begum. Poems from East Bengal. (Karachi : PEN 1954). PP. 13-15

৫. নাজিরুল ইসলাম মুহাম্মদ সুফিয়ান, বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস (ঢাকা : ১৯৫০) পৃঃ ৪৪।

৬. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ৫ বর্ষ, ২ সংখ্যা (শ্রাবণ-১৩২৯ বাংলা) গোলাম মোস্তফা,ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ।

www.pathagar.com

মোস্তফা নজরুলের কবিতায় এ ধরনের বৈশিষ্ট্য না থাকায় তার সমালোচনা করেন। তিনি সাহিত্য বিচারে তার এই পদ্ধতিকে পাকিস্তানী আদর্শ বলে বর্ণনা করেন এবং হিন্দু দর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট নজরুল সাহিত্যের বিরাট অংশকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা ও প্রত্যাখ্যান করার প্রস্তাব দেন।[৭] ১৯৫৮ সালে তিনি পুনরায় একই আপত্তি তোলেন।[৮] এর দুই বছর আগে মধুসূদন 'মেঘনাদ বধ কাব্য' নামক দীর্ঘ কবিতা লিখলে গোলাম মোস্তফা তাকে পাকিস্তানের মহাকবি ঘোষণা করেন। এই মহাকাব্যে রাবণের কর্মকান্ড ও সাহসিকতাকে বীরত্বসূচক আখ্যা দেন এবং বীরবাহু ও অন্যান্যদেরকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করায় 'রামের' নিন্দা করেন। তিনি আরো জোর দিয়ে বলেন যে, মধুসূদনের জন্মস্থান পূর্ব-পাকিস্তানে পড়েছে। তিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি রামায়ণের রাবণকে তার মহাকাব্যে বীর হিসেবে তুলে ধরেন এবং রামকে চিহ্নিত করেন কাপুরুষ হিসেবে।[৯] মুসলিম দর্শনের একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে গোলাম মোস্তফার মত আবদুর রহমান খানও নারী চরিত্র বিবর্জিত নাটক লেখার জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের নাট্যকারদের প্রতি আহ্বান জানান।[১০]

অতীতে সংস্কৃতির দুটি ধারা লক্ষ্যণীয়। একটি একান্তভাবে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক এবং অপরটি দার্শনিক আদর্শ ভিত্তিক। তৃতীয় আরো একটি ধারা ছিল যাকে বলা যায় ধর্মনিরপেক্ষ বা লোকায়ত। মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে বিশেষ গৌরববোধ থাকা সত্ত্বেও এর মধ্য দিয়ে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক সচেতনতা ফুটে উঠেছে। ১৯৪৮ সালের ৬ এপ্রিল তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী জাতীয় পরিষদে যে ভাষণ দেন তাতেও উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি সোজাসুজিভাবে বলেন যে বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সৃজনশীল চেষ্টার ফল। ভাষণে তিনি বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নে কীর্তিবাস, কাশিরাম দাস, বিদ্যাপতি, চন্ডিদাস, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তার মতে, জনগণের বিরাট অংশকে এই পর্যন্ত সাহিত্যে অস্বীকার করা হয়েছে। এখন পাকিস্তানী লেখকদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে তাদের সাহিত্যে সঠিকভাবে স্থান দেয়া। তাদের সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না সাহিত্যে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। এক কথায় আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রকৃত অর্থেই গণসাহিত্য সৃষ্টি।[১১] ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে তার উক্তির পুনরাবৃত্তি করেন।[১২]

---

৭. মাহফুজা খাতুন (সম্পাদিত), গোলাম মোস্তফা, প্রবন্ধ সংকলন (ঢাকা ঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৩৭৫ বাংলা) পৃঃ ১৯১-২১৫, ২৩৪-৬৪।

৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৪-৬৪।

৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩-১৬।

১০. আবদুর রহমান খান, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনঃ অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির অভিভাষণ, (ঢাকা ১৯৫৪)।

১১. East Bengal Legislative Assembly Offical Report, First Session, 1948 PP 153-158.

১২. দৈনিক আজাদ, ১ জানুয়ারী ১৯৪৯।

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালের পর রক্ষণশীল মুসলমান নেতৃবৃন্দ পূর্ব বাংলায় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর একদল সমর্থক তৈরী করেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এসব সমর্থক পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি এবং পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ নির্দেশিত নীতিমালা অনুসরণ করতেন। বাংলা ভাষা ব্যবহারে এই নীতিমালা স্পষ্ট ধরা পড়তো। বাংলা ভাষাকে ইসলামী বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করার জন্য এক্ষেত্রে আরবী, ফার্সি ও উর্দু শব্দ ব্যবহারকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা হতো। এছাড়াও এটা ছিল উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষায় পরিণত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটি উদ্যোগ।

বাংলা ভাষাকে ইসলামীকরণ ও পাকিস্তানীকরণের প্রয়াসকে ইতিহাসের আলোকে যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ করা হতো। বলা হতো অতীতে মধ্যযুগে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর বাংলা ভাষায়ও পরিবর্তন আনা হয়। মুসলমান শাসকরা বাংলা ভাষায় ইসলামী বৈশিষ্ট্য সংযোজন করেন। কিন্তু পরবর্তীতে বৃটিশ আমলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভাষাবিদরা বাংলাভাষায় সংস্কৃত বৈশিষ্ট্য সংযোজন করেছেন এবং সেই ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষায় পাকিস্তানী বৈশিষ্ট্য সংযোজন করা দরকার। এই তত্ত্বের সমর্থকরা এক অদ্ভুত ভাষায় তাদের যুক্তি উপস্থাপন করেন। রেডিও পাকিস্তানকেও একই ভাষায় খবর সম্প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়।[১৩]

কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৭ সাল থেকে বাংলা ভাষায় আরবী বর্ণমালা প্রচলনের চেষ্টা চালান। এই উদ্যোগের প্রধান সমর্থক ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের অবাঙালী শিক্ষা সচিব ফজলে আহমদ করিম ফজলে এবং চট্টগ্রামের হরফুল কোরআন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা মওলানা জুলফিকার আলী।[১৪] মাওলানার মতে, মুসলমানদের শিক্ষা কোরআন মজীদে ব্যবহৃত আরবী বর্ণমালার মাধ্যমে হওয়া উচিত। তিনি আরবী বর্ণমালায় লেখা বাংলা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করতেন যাতে এভাবে বাংলা পড়ালেখা সহজ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে যেসব যুক্তি দেয়া হতো তা হচ্ছে– বাংলা ভাষায় বহু যুক্তাক্ষর থাকায় মুদ্রাক্ষর ও সাঁটলিপিতে নানা অসুবিধা দেখা দেয়। পক্ষান্তরে এক্ষেত্রে আরবী বর্ণমালা ব্যবহারের বিশেষ সুবিধা আছে। তাছাড়া দেশের শতকরা ৯০ ভাগ লোক আরবী বর্ণমালার সাথে পরিচিত। তাই আরবী বর্ণমালা ব্যবহার করা বাংলার চাইতে সুবিধাজনক। আরবী বর্ণমালা ব্যবহারের মাধ্যমে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যকে সংহত করা সহজতর হবে।[১৫]

পরবর্তীতে আরবী অক্ষরে বাংলা শিক্ষা শুরু হয়। এ জন্য প্রায় বিশটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য আরবী অক্ষরে বাংলা বই

---

১৩. মাহে নও, অক্টোবর ১৯৪৯ পৃঃ ৫৪-৫৫।

১৪. আবুল ফজল, রেখা চিত্র, ২ সংস্করণ (চট্টগ্রাম ১৯৬৮) পৃঃ ৩০৭।

১৫. দৈনিক আজাদ, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ ও ১২ মার্চ ১৯৪৯।

www.pathagar.com

লেখা হয়। সরকারের এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের 'ভাষা কমিটি'এই উদ্যোগের নিন্দা করে বলে যে, এটা হচ্ছে বিপুল জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর করে রাখার এক জঘন্য চক্রান্ত। 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস'ও (১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত) সরকারের এই প্রচেষ্টার নিন্দা জানায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্ররা এর প্রতিবাদে কর্তৃপক্ষের কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করে। তাতে বলা হয়, আঞ্চলিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার অবাস্তব আকাংখা পোষণ করে পাকিস্তানের সাথে শত্রুতা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং এতে 'পাক-বাংলার' জনমনে অধীনতার আশংকা স্থায়ীভাবে ছাপ ফেলছে।[১৬] এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু), ইকবাল হল ছাত্র সংসদ এবং ইডেন গার্লস কলেজ ছাত্রী সংসদও সরকারী উদ্যোগের প্রতিবাদ জানায়।

ভাষা কমিটি

এই ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ পূর্ব বাংলায় প্রচলিত বাংলা ভাষার মানোন্নয়ন, সহজীকরণ ও সংস্কারের বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি 'ভাষা কমিটি' গঠন করে।[১৭] কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন,

১. মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ –সভাপতি
২. হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী
৩. ডঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫. মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী, এম এল এ, দিনাজপুর
৬. ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রধান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৭. আবুল কালাম শামসুদ্দিন, এম এল এ, সম্পাদক, দৈনিক আজাদ, ঢাকা
৮. সৈয়দ আবুল হাসানাত মোহাম্মদ ইসমাঈল, পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক, পূর্ব বাংলা সরকার, ঢাকা
৯. মিজানুর রহমান, উপসচিব, শিক্ষা বিভাগ, পূর্ব বাংলা সরকার
১০. মজদুদ্দিন আহমদ (মরহুম), অধ্যক্ষ, এম সি কলেজ, সিলেট
১১. মৌলভী শেখ শরফুদ্দিন, অধ্যক্ষ, ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজ, ঢাকা
১২. এ কিউ এম আদামুদ্দিন, অধ্যাপক, ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজ, নওগাঁ, রাজশাহী
১৩. মৌলভী জুলফিকার আলী, মালিক, আলাইয়া প্রেস, চট্টগ্রাম
১৪. বাবু গণেশ চন্দ্র বোস, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৫. বাবু মোহিনী মোহন দাস, ঢাকা
১৬. মৌলভী গোলাম মোস্তফা, প্রধান শিক্ষক –সম্পাদক।

---

১৬. সৈনিক, ২২ এপ্রিল ১৯৪৯।

১৭. Government of East Bengal Resolution no 590 Edn. 9 March. 1949.

www.pathagar.com

এ ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকজন ভাষাবিদকেও কো-অপট করা হয়। তারা হচ্ছেন,

১. ডঃ মোহাম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক ও বাংলা বিভাগের প্রধান, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী
২. আব্দুল মজিদ, পূর্ব বাংলা সরকারের অনুবাদক (তথ্য অফিসার)
৩. বাবু অজিত কুমার গুহ, অধ্যাপক, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।

কমিটির বিবেচ্য বিষয় ছিল তিনটি ঃ

১. পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য বাংলা ভাষাকে সহজ সংস্কার ও মানোন্নয়নের বিষয় বিবেচনা করা (বাংলা ব্যাকরণ ও বানানসহ) এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন;

২. প্রযুক্তিগত পরিভাষা এবং অন্যান্য যেসব বিদেশী শব্দের সমার্থক শব্দ বাংলা ভাষায় নেই সেসব ক্ষেত্রে অনুবাদের সুবিধার্থে নতুন বাংলা শব্দ উদ্ভাবনের পদ্ধতি নির্দেশ করা; এবং

৩. বাংলা ভাষাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, বিশেষভাবে পূর্ব-বাংলার জনগণ এবং সাধারণভাবে পাকিস্তানের জনগণের সহজাত ক্ষমতা ও সংস্কৃতির সাথে বাংলা ভাষাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন।

দীর্ঘ দেড় বছর আলোচনা-পর্যালোচনার পর কমিটি ১৯৫০ সালের ৭ ডিসেম্বর সরকারের কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করে।[১৮]

রিপোর্টে প্রস্তাবিত ভাষাকে 'সহজ বাংলা' নাম দেয়া হয়। এটা ছিল কমিটির এক অদ্ভুত আবিষ্কার। কমিটি সকল 'কর' ব্যঞ্জনবর্ণের ডানে লেখার প্রস্তাব করেন। তাদের যুক্তি ছিল, বাংলা স্বরবর্ণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দুই ধরনের। একটি স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হয় এবং অপরটি তাদের প্রতিনিধি তথা 'কর' রূপে ব্যবহৃত হয় যা আরবী ও ফার্সি ভাষার হরকতের মত। বাংলা ভাষার এই দুই ধরনের স্বরবর্ণকে পৃথক করা দরকার।[১৯] সম্ভবত কমিটির সদস্যগণ দুটি নীতিমালার ভিত্তিতে কাজ করেছেন। তারা আরবী ও ফার্সি বর্ণমালার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। এটা তাদের 'সংস্কৃত', 'সংস্কৃত নীতিমালা', 'সংস্কৃত ব্যাকরণ' ইত্যাদি শব্দ পুনঃব্যবহারের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট বুঝা যায়। দ্বিতীয়তঃ তারা বাংলা ভাষায় আরবী বর্ণমালা আবার চালু করার উপায়-উপকরণ বের করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেন। যদিও বাংলা ভাষা বাংলায় শত বছরের মুসলিম শাসনামলে (১২০৪-১৭৫৭) বর্তমান আকারেই বিকশিত হয়, তথাপি বাংলা অক্ষর দেবনাগরী

---

১৮. Report of the East Bengal Language Committee. 1947 (Govt. of Eas Pakistan).

১৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২।

www.pathagar.com

থেকে উদ্ভূত। দেবনাগরী হচ্ছে সংস্কৃত তথা হিন্দু ধর্ম গ্রন্থের আদিভাষা। বাংলা ভাষার মূল সংস্কৃত হওয়ার কারণেই জাতীয় ভাষা হিসেবে উর্দুকে প্রতিষ্ঠার সমর্থকরা মনে করতেন জাতীয় ভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করা হলে শুধু জাতীয় ঐক্যই বিপন্ন হবে না বরং এটা হবে ইসলাম বিরোধী। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বাঙালী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি বৈরী মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। মুসলিম জাতির সংহতি রক্ষার জন্য উৎকণ্ঠা বোধের কারণে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতারা এমনকি নিজেদের ভাষা ত্যাগ করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতেও রাজী ছিলেন, যাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সাথে একাত্ম হওয়া যায়। এ ধরনের মনোভাবের পেছনে সম্ভাব্য অন্যতম কারণ হচ্ছে খাজা নাজিমুদ্দিন ও খাজা শাহাবুদ্দিনের মত বাংলার কয়েকজন প্রখ্যাত নেতার ভাষা ছিল উর্দু এবং তারা বাংলা খুব কমই জানতেন। এমনকি প্রথম গণপরিষদে বাঙালী গ্রুপের নেতা ফজলুর রহমান বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও উর্দুতে কথা বলতেন। সম্ভবত তারা ভাষা সংস্কার নীতির উদ্যোগের কথা বিবেচনা করে এটা করতেন। এই সংস্কার নীতিতে আরবী অথবা রোমান হরফে বাংলা লেখার কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু চাপিয়ে দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা বরং তারা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশও রুদ্ধ করে দিতে চেয়েছিল। ১৯৪৮ সালে ইসলাম ও জাতীয় ঐক্যের অজুহাতে উর্দুকে একমাত্র জাতীয় ভাষা করার পক্ষে জিন্নাহ ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে দমিয়ে দেয়ার উপায় হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৯ সালে আরবী অক্ষরে বাংলা চালু করার জোর চেষ্টা চালায় এবং পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তানের ভাষাগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার নীতি পাকিস্তানকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার ধারণা থেকেও জরুরী বলে বিবেচিত হয় এজন্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বাংলা ভাষার সমর্থকদের রাষ্ট্র ও ইসলাম বিরোধী বলে নিন্দা করতেন এবং উদার ও গণতন্ত্রকামীদের নির্যাতনের মুখে ঠেলে দিতেন।

প্রচন্ড বিরোধিতার কারণে কমিটি তাদের সুপারিশমালার মাধ্যমে সরকারকে খুশি করতে পারেননি। তবে তারা বাংলা ভাষায় কিছুটা ইসলামের ছোঁয়া লাগানোর চেষ্টা করেন। কমিটির এই চেষ্টা কত ভ্রান্ত ছিল, একটি ঘটনা থেকে তা অনুমান করা যায়। কমিটির অন্যতম সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক গণেশ চন্দ্র বোস কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করলে কমিটির অন্য সদস্যরা মন্তব্য করেন, ঠিক আছে গণেশ বাবু, সংস্কৃতের পন্ডিত হিসেবে সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য থেকে আপনার বিরত থাকা উচিত যার মাধ্যমে আমরা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের প্রভাবমুক্ত করতে চাই। পরবর্তীতে কমিটি থেকে তাকে বাদ দেয়া হয়।[২০]

২০. আবুল কালাম শামসুদ্দিন, অতীত দিনের স্মৃতি, ঢাকা ১৯৬৮, পৃঃ ৩৩৩-৩৩৪।

www.pathagar.com

অবশ্য কমিটি রোমান বা উর্দু হরফে বাংলা লেখার সিদ্ধান্ত কমপক্ষে বিশ বছর স্থগিত রাখারও সুপারিশ করে। সম্ভবত এই কারণে সেই সময় রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়নি বরং ১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের আমলে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন ঃ

পূর্ব বাংলায় প্রথম সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয় সরকারী উদ্যোগে। পরবর্তীতে বেসরকারী উদ্যোগে আরো চারটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এসব সম্মেলনে কবি, শিল্পী ও বিভিন্ন মত ও পথের সাহিত্যিকগণ যোগ দেন এবং সাহিত্যের বিশেষ সমস্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। দেশের সাংস্কৃতিক ধারায় এসব সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ঢাকা (১৯৪৮-৪৯)

১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারী পর্যন্ত ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন পূর্ব বাংলার স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী। সম্মেলনে কবিতা, শিশু সাহিত্য, ভাষা বিজ্ঞান, পুঁথি সাহিত্য এবং লোক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হয়। মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

জনাকীর্ণ অবস্থায় সম্মেলন শুরু হয়। মাওলানা আবদুর রহীম শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন। রেডিও পাকিস্তানের শিল্পীরা জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। গোলাম মোস্তফা নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের চেতনা এবং পাকিস্তানের সাহিত্যিকদের নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নের ওপর আরেকবার বক্তৃতা করেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হচ্ছে বাংলার অভিজাত ও গণমানুষের মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস, কেননা হিন্দু অভিজাতদের (ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ) ভাষা ছিল সংস্কৃত, আর সাধারণ মানুষের (নিম্নবর্ণ) ভাষা ছিল বাংলা। কিন্তু মুসলমান শাসকরা উপলব্ধি করেছিলেন যে তারা বাহির থেকে এসেছেন, তাই বাংলায় নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে বাংলাভাষী সাধারণ মানুষের সমর্থন দরকার। তাই মধ্যযুগে মুসলমান শাসকগণ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং বাংলা সাহিত্যকে সাধারণ মানুষের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যান। বৃটিশ আমলে বাংলা সাহিত্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে পাকিস্তানে সাহিত্য আবার সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় চলে যাবে।[২১]

২১. পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৪৮।

www.pathagar.com

সভাপতির ভাষণে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলেন।[২২]

> "এটা যেমন ঠিক যে আমরা হিন্দু এবং মুসলমান তেমনি এটাও সত্য যে আমরা বাঙালী। এটা কোন আদর্শ নয় তবে এটা বাস্তব সত্য। প্রকৃতি আমাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন এক অনপনেয় চিহ্ন রেখেছে যা মালা-তিলক-টিকি বা টুপি-লুঙ্গি-দাড়ির মাধ্যমে তুলে ফেলা সম্ভব নয়"।

এই ভাষণের জন্য শহীদুল্লাহকে অনেক বৈরিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। উর্দু ভাষী শিক্ষা সচিব ফজলে আহমদ করিম ফজলে এই মতের কঠোর সমালোচনা করেন। কিন্তু শ্রোতাদের প্রচন্ড বিরোধিতার ফলে শিক্ষা সচিব সম্মেলন স্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরের দিন দৈনিক আজাদে এক সম্পাদকীয়তে তিক্ত-ভাষায় মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর সমালোচনা করা হয়।[২৩] আজাদের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ কোন মহল থেকে পাওয়া যায়নি বরং সাপ্তাহিক সৈনিকও আজাদের সাথে যোগ দিয়ে শহীদুল্লাহর অভিমতের সমালোচনা করে কয়েকটি প্রবন্ধ ছাপে। এসব প্রবন্ধে বলা হয় শহীদুল্লাহ তার ভাষণের মাধ্যমে অখন্ড বাংলার প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।[২৪]

পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস

পাকিস্তান জন্মলাভের পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র ও অধ্যাপক ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠা করেন। এটা ছিল তৎকালীন সময়ে সবচেয়ে সক্রিয় সাংস্কৃতিক সংগঠন। এই সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেম। সংগঠনের লক্ষ্য ছিল (ক) গতানুগতিকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও অনুকরণের উর্ধ্বে উঠে সুস্থ ও ব্যাপক সংস্কৃতি গড়ে তোলা, (খ) প্রতিষ্ঠিত যুক্তির ভিত্তিতে জনগণকে ধর্মভিত্তিক সমাজতন্ত্রের দিকে পরিচালিত করা, (গ) শিল্প সাহিত্যকে অবলম্বন করে মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, এবং (ঘ) জনগণের উন্নয়নে সহায়তার জন্য খাঁটি চরিত্র গঠন করা।[২৫]

প্রাথমিক পর্যায়ে মজলিসের তৎপরতা ছিল উল্লেখযোগ্য। মজলিসের উদ্যোগে ভাষা প্রশ্নে প্রথম সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। মজলিসের উদ্যোগেই ভাষা সমস্যার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে সাংস্কৃতিক সম্মেলন, বিতর্ক ও সেমিনারের আয়োজন করা হয় এবং ভাষা সমস্যা রাজনৈতিক মর্যাদা লাভের পেছনেও এই সংগঠন সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এজন্য এই সংগঠনকে সমসাময়িক পত্রিকা যেমন মর্নিং নিউজ,

---

২২. প্রাগুক্ত।

২৩. দৈনিক আজাদ, ১ জানুয়ারী, ১৯৪৯ (সম্পাদকীয়)।

২৪. সাপ্তাহিক সৈনিক, ৯ জানুয়ারী, ১৯৪৯।

২৫. পান্ডুলিপি, ৫ খন্ড (১৩৮২ বাংলা), পৃঃ৫৩-৯৬।

www.pathagar.com

আসাম হেরাল্ড, পাসবান, এবং যুগভেরী ইত্যাদির বিরূপ মন্তব্যের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

সাপ্তাহিক সৈনিক ছিল মজলিসের মুখপত্র। বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে এই পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মজলিসের অন্যান্য প্রকাশনার মধ্যে ছিল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, বিবর্তনের রীতি, সৃষ্টিতত্ত্ব ও আল্লাহর অস্তিত্ব, পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলন, পাকিস্তানের সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদি।

জাতীয় ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ যতদিন এটা নিছক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল ততদিন মজলিসের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ভাষা প্রশ্নটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নিলে মজলিসের প্রভাব কমতে থাকে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মজলিসের আর কোন প্রভাব ছিল না। মজলিসের সদস্য ও কর্মীদের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শের ভিন্নতাই এর কারণ।

সংস্কৃতি সংসদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক সংস্কৃতি সংসদ গঠিত হয় ১৯৫১ সালে। প্রথম দিকে এই সংগঠনের তৎপরতা কেবল বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী', তুলসী লাহিড়ীর 'পতি' এবং বনফুলের 'কাব্য' ইত্যাদির মত নাটক মঞ্চায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এসব নাটকের বৈশিষ্ট্য ছিল মানবতা ও গণসচেতনতাধর্মী। ক্রমান্বয়ে সংসদ দেশপ্রেম ও গণসঙ্গীত অনুষ্ঠানের নিয়মিত কার্যক্রম গ্রহণ করে। সংসদ কতিপয় নতুন ধারণাও গ্রহণ করে যেমন, সামন্তবাদের অবসান, পুঁজিবাদের পতন এবং সমাজতন্ত্রের বিজয় ও সাফল্য এবং পাশাপাশি তারা আধুনিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার বিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক প্রবণতা চিহ্নিত করে।[২৬]

প্রথম তিন বছর খান সরোয়ার মুর্শিদ, মোস্তফা নূরুল ইসলাম এবং আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ সংসদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই সংগঠন ঢাকা কেন্দ্রিক হলেও পরবর্তীতে সংগঠনের সদস্যরা পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তৎকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার কারণে সংসদ সমগ্র প্রদেশে পরোক্ষ ও সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু সাধারণ মানুষের ওপর তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ

এ সময় ইসলামমনা সাংস্কৃতিক কর্মীরা 'প্রগতি লেখক সংঘ' বিলুপ্তির ফলে সৃষ্ট শূন্যতা

২৬. সংস্কৃতি সংসদ (পুস্তিকা)।

www.pathagar.com

পূরণের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে।[২৭] তারা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য, ধারাবাহিকতা ও মানবতাবাদকে দ্বিখন্ডিত করার সচেতন প্রয়াস শুরু করে। সৈয়দ আলী আহসান 'দৈনিক আজাদ' এবং সরকার পরিচালিত 'মাহে নও' পত্রিকায় নিয়মিত লেখার মাধ্যমে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির পথ নির্দেশ করার জোর চেষ্টা চালান। তিনি বাংলা সাহিত্যের পুরানো ঐতিহ্য পরিত্যাগ করে পূর্ণ ইসলামী জীবন ধারা ভিত্তিক নতুন সাহিত্য রচনার পরামর্শ দেন।[২৮]

এই অপচেষ্টা সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করার জন্য নতুন সংগঠন ও শিল্পী গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। বাস্তব কারণে 'প্রগতি লেখক সংঘ' পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব ছিলনা। তবে ইসলামমনা লেখকদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য কমিউনিস্ট ও উদারপন্থী লেখকরা নতুন করে একই মঞ্চে সমবেত হয়ে ১৯৫২ সালের শেষ দিকে 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' গঠন করেন। শুরু থেকেই কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন সংসদের সভাপতি এবং ফয়েজ আহমদ ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ১৯৫৪ সালে আতোয়ার রহমান দুই বছরের জন্য সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং পরে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদক হন। সহ-সভাপতি হিসেবে শুরু থেকেই অজিত গুহ, কামরুল হাসান, এবং আবদুল গনি হাজারী সংসদের সাথে যুক্ত ছিলেন। সংসদের সম্পাদকমন্ডলীতে ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আনিসুজ্জামান, এবং আবদুল্লাহ আল-মুতি শরফুদ্দিন।

সংগঠনের নিয়মিত পাক্ষিক সেমিনার হতো। মাঝে মাঝে অতিরিক্ত সভাও হত।[২৯] সংসদের উদ্যোগে যেসব উল্লেখযোগ্য আলোচনা ও অনুষ্ঠান সম্পান্ন হয় সেগুলি ছিল ১৯৫২-৫৩ সালে ম্যাক্সিম গোর্কি বিষয়ক, ১৯৫৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর এবং ১৯৫৫ সালে রবীন্দ্রনাথের ওপর। এসব স্মরণীয় অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীরা অংশ নেন। উস্তাদ আলাউদ্দিন খান, কাজী আবদুল ওয়াদুদ এবং মাওলানা আকরম খাঁ এসব অনুষ্ঠানে তাদের স্মৃতিচারণ করেন। ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় সংসদের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তবে ১৯৫৪ সালে সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠানই ছিল সংসদের প্রধান সাফল্য। এভাবে সংসদ বাংলা চর্চার একটি সুষ্ঠু ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন, চট্টগ্রাম

১৯৪৭ সালে চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সাহিত্য কর্মীরা একই সাথে দু'টি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন-'সংস্কৃতি পরিষদ' ও 'প্রান্তিক'। এই দু'টি সংগঠন ১৯৫১ সালের ১৬ মার্চ

২৭. সাঈদুর রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি–সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০ পৃঃ ২৪-২৫।
২৮. মাসিক সওগাত, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯ বাংলা।
২৯. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১০ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা (ফয়েজ আহমদ, মধ্যরাতের অশ্বারোহী) পৃঃ ৩১-৩২।

www.pathagar.com

যৌথভাবে চট্টগ্রামের হরিখোলা ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে আবুল ফজল ও সাইদুল হাসান। ঢাকার মর্নিং নিউজ ও আজাদ পত্রিকা এই সম্মেলনের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। তারা অভিযোগ করে যে কমিনিস্টরাই এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা। ফলে অনেক সাহিত্য ব্যক্তিত্ব সম্মেলনে যোগ দিতে অসম্মতি জানান। এতদসত্ত্বেও বেগম সুফিয়া কামাল ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও সভাপতি হিসেবে সম্মেলনে যোগ দেন। কলকাতা থেকে 'সত্যযুগ' পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্মেলনে যোগ দেন। বাংলার পল্লী জীবনের ওপর সম্মেলনে এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উপরন্তু কীর্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কবিগানের অনুষ্ঠান সম্মেলনের সাফল্যে বিশেষ সহায়তা করে।[৩০]

সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা নিজেদেরকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও আধুনিক রবীন্দ্র-নজরুল সাহিত্যের উত্তরাধিকারী বলে দাবী করে। সভাপতির ভাষণে একই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করে বলা হয়,

> "সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐতিহ্য হচ্ছে ধ্রুবতারার মত, ঐতিহ্য অনুসরণ এবং সেই ঐতিহ্যের ধারাকে চিরবহমান রাখাই হচ্ছে সংস্কৃতিসেবীদের প্রধান কাজ। ঐতিহ্যের সাথে যাদের কোন সংযোগ নেই তারা পরগাছা।"

সম্মেলনের মূল প্রস্তাব ছিল সামাজিক পরিবর্তনে সাহিত্যের ভূমিকা সম্পর্কিত। সম্মেলন এক্ষেত্রে সাহিত্যকে অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে ঘোষণা দেয় যে "আমরা বিশ্বাস করি সাহিত্য শুধু সমাজ জীবনের প্রতিবিম্ব নয় বরং সমাজ উন্নয়নেরও বলিষ্ঠ মাধ্যম। সমাজ জীবনকে ক্ষুধা, বেকারত্ব ও বিশৃংখলার অভিশাপ থেকে রক্ষা এবং সমাজ বিকাশের ধারা অব্যাহত রাখা শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মহান দায়িত্ব। আমরা সে ধরনের সাহিত্য নির্মাণে বিশ্বাস করি যা সমাজের কল্যাণ বয়ে আনে এবং সমাজ চিন্তাকে ধারণ করে।"[৩১]

পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন, কুমিল্লা

এরপর 'কুমিল্লা প্রগতি মজলিস'-এর উদ্যোগে ১৯৫২ সালের ২২, ২৩ ও ২৪ আগষ্ট আরেকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফরওয়ার্ড ব্লক, যুবলীগ, কমিউনিস্ট পার্টি এবং বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের মত প্রগতিশীল সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা এতে সহযোগিতা করে। মোট কথা এই সম্মেলনে সরকার বিরোধী সব সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমাবেশ ঘটে। সরকারী কলেজের অধ্যাপক শওকত ওসমান সম্মেলনে উপস্থিত

---

৩০. আবুল ফজল, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩০৭।

৩১. ধনঞ্জয় দাস, আমার জন্মভূমিঃ স্মৃতিময় বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলকাতা ১৯৭১) পৃঃ ৮৩।

www.pathagar.com

থাকলেও আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি। সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত 'আহ্বান' নামক এক প্রচারপত্রে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়ে বলা হয়,

> "আমাদের প্রস্তাবিত সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মবিশ্লেষণ। নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে আমরা মূল্যায়ন করতে চাই যে, পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে আমরা জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি। শিল্প, সঙ্গীত,সাহিত্য ও বিজ্ঞানে আমরা কতখানি অবদান রেখেছি এবং কোথায় আমরা ব্যর্থ হয়েছি।"

সম্মেলন শুরু হয় ১৯৫২ সালের ২২ আগষ্ট। স্বাগত ভাষণে অসিত নাথ নন্দী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে আনা এবং ভদ্র (নগর) সংস্কৃতি ও লোক সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তার মতে ইংরেজ শাসন চালু হওয়ার পরপরই অনুকরণ এবং আনুকূল্য লাভের জন্য সাংস্কৃতিক বিকৃতি ঘটানো হয়েছিল। এসময় গজিয়ে ওঠা ভদ্র সংস্কৃতি দেশের সংস্কৃতির মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তা দুর্দশা নিয়ে আসে।[৩২]

সভাপতি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ তার ভাষণে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরাজমান অবস্থা, রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক, সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতাদর্শের মধ্যকার বিরোধ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন,

> "আজ তারা সম্ভবত দেশকে পাপের গভীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে চায়। তারা প্রশ্ন তুলেছে যে বাংলা আমাদের সংস্কৃতির মাধ্যম হতে পারে না..... সংস্কৃতি ধ্বংস করার বহু উপায় আছে...গণবিরোধী ও সমাজ বিরোধী কঠোর নীতি তন্মধ্যে একটি। কিন্তু তাদের এই নীতিকে অবশ্যই পারস্যবাসীর কাছে পরাজিত আরবদের মত ভাগ্যবরণ করতে হবে"।[৩৩]

সভার সভাপতি মাহবুব-উল-আলম দেশ বিভাগ পরবর্তী সময়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির মধ্যে বিরোধের পথ ধরে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। এর ফলে সমাজের বিদ্যমান অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে এবং তার পরিবর্তে নিশ্চিতভাবে সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় ঘটবে এবং ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত হবে।[৩৪] সমাপনী অধিবেশনে কুমিল্লা পৌরসভার চেয়ারম্যান অতিন্দ্র মোহন রায় সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এই আশা ব্যক্ত করেন যে, সমতার ভিত্তিতে উন্মুক্ত

---

৩২. অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির স্বাগত ভাষণ (পুস্তিকা)।

৩৩. সভাপতির ভাষণ (প্রচারপত্র)।

৩৪. মাহবুব-উল-আলম, 'কঠিন সংকট কেটে যাচ্ছে' (ঢাকা) পৃঃ ৪৭-৪৮।

www.pathagar.com

পরিবেশে দেশের সংস্কৃতি বিকশিত হবে এবং এই লক্ষ্য অর্জনে কুমিল্লা সম্মেলন অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নজরুল গীতি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, লোক ও গণসঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয় এবং লোক সঙ্গীতে 'যুদ্ধ বনাম শান্তি' পালা মঞ্চস্থ হয়।

সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বাংলা ভাষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন দমন করার ঘৃণ্য প্রয়াসের নিন্দা করা হয়। অপর প্রস্তাবে যুদ্ধকে সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে বর্ণনা করা হয় এবং শান্তির পক্ষে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারণা জোরদার করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে সম্মেলন শান্তি ও প্রগতির ভিত্তিতে জীবন গঠনের দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।[৩৫]

কুমিল্লা সম্মেলন ছিল দেশের সংস্কৃতি উন্নয়নে একটি বড় ধরনের অগ্রবর্তী পদক্ষেপ। সম্মেলনের মূল আবেদন ছিল অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী। এই সম্মেলন পূর্ববাংলার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখা এবং জনগণের জীবন ধারা অনুযায়ী অসম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী ও গণমুখী সাহিত্য সৃষ্টিতে সবাইকে সংশ্লিষ্ট করার দর্শনকে তুলে ধরে।

ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ঢাকা

এসব সম্মেলনের ফলে সৃষ্ট জাগরণকে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস ১৯৫২ সালের ১৭-২০ অক্টোবর ঢাকায় ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহ্বান করে। সম্মেলনের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে ইব্রাহীম খাঁ ও আব্দুল গফুর। সম্মেলন পাঁচটি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল– সামাজিক বিজ্ঞান, ইসলামী আন্দোলন, লোক সংস্কৃতি, সাহিত্য, সেমিনার ও বিচিত্রানুষ্ঠান। সম্মেলনের লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়,

> "আমরা যদি পাকিস্তানকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাই তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। আমরা ইসলামকে আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন দর্শন ও সমস্যার আলোকে পরীক্ষা করতে চাই। কোনরকম অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থতা ছাড়াই আমরা ইসলামকে সর্বাধিক মানবতাবাদী দর্শন হিসেবে বুঝতে চাই এবং অন্যদেরও একইভাবে বুঝাতে চাই"[৩৬]

সম্মেলনের সাহিত্য অধিবেশনে শাহাদাত হোসেন, মোতাহার হোসেন, এম, বরকত উল্লাহ, সৈয়দ আলী আহসান, হাসান জামান প্রমুখ যোগ দেন। অধিবেশনের সভাপতি

---

৩৫. সরলানন্দ সেন, ঢাকার স্মৃতি ১ খন্ড (কলকাতা ১৯৭১), পৃঃ ২১৭।

৩৬. ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন (পুস্তিকা)।

www.pathagar.com

হিসেবে এম বরকত উল্লাহ দুঃখ প্রকাশ করেন যে, মুসলমান সাহিত্যিকরা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ভুলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপীয় বস্তুবাদ এবং রাশিয়ার কমিউনিজম দ্বারা আন্দোলিত হচ্ছে।[৩৭] হাসান জামান তার 'ইসলামী তমদ্দুন' নামক প্রবন্ধে দেখান যে ইসলামের মৌল প্রতিপাদ্য ও ইনসাফ হচ্ছে সার্বজনীন এবং তা মানবতার বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত যা সুন্দর এবং মানবিক প্রজ্ঞা বিকাশেরও অনুকূল। তাই তিনি ইসলামের মৌলিক দর্শনের ভিত্তিতে সংস্কৃতি পুনর্নির্মাণের আহ্বান জানান।[৩৮]

সম্মেলনে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা ঘোষণা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে সুস্থ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির জন্য 'ইসলামী সংস্কৃতি সম্মেলন' নামে একটি স্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় ও বিদেশী সকল যৌন সাহিত্য অবৈধ ঘোষণা এবং ইসলামী সংস্কৃতি সম্মেলনের মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রতিটি জেলায় আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর এক প্রস্তাবে প্রশাসন সম্পর্কিত বিষয়ে ইসলামের অপব্যবহার থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।[৩৯]

সাংগঠনিক দৃষ্টিতে সম্মেলন ছিল সফল। পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের মুখপত্র সাপ্তাহিক সৈনিক এ ব্যাপারে গভীর অনুভূতি প্রকাশ করে। কিন্তু সে সময় এই সম্মেলনের প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। সম্মেলনের প্রধান উপাদান সামন্ততান্ত্রিক হওয়ায় তা উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে স্পর্শ করতে পারেনি। সে সময় জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার ফলে পূর্ব বাংলায় সামন্তবাদের ভিত দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ঢাকা (১৯৫৪)

১৯৫৩ সালের শেষ দিকে মুসলিম লীগ বিরোধী শক্তি হিসেবে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে সংস্কৃতিসেবীরা ঐক্যবদ্ধভাবে সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের চেষ্টা চালায়। এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। দিন-তারিখ কয়েক দফা পরিবর্তনের পর অবশেষে ১৯৫৪ সালের ২৩ এপ্রিল সম্মেলনের চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারিত হয়। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন আব্দুল গফুর সিদ্দিকী এবং উদ্বোধন করেন মু শহীদুল্লাহ। সম্মেলন শেষে প্রকাশিত ১০৮ জন শিল্পী ও সাহিত্যিকের যৌথ বিবৃতির মধ্যে সম্মেলনের উদ্দেশ্য বিধৃত হয়। বিবৃতিদাতারা ছিলেন বিভিন্ন পত্রিকা ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি। তারা সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বার্থে পূর্ব বাংলার শিল্পী ও সাহিত্য

---

৩৭. সাপ্তাহিক সৈনিক, ৭ নবেম্বর, ১৯৫২, পৃঃ ৫-৮।
৩৮. হাসান জামান, 'ইসলামী সংস্কৃতি', 'সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য', ঢাকা, ১৯৬৭, পৃঃ ৭।
৩৯. সাপ্তাহিক সৈনিক, ৭ নবেম্বর, ১৯৫২, পৃঃ ৫।

www.pathagar.com

কর্মীদের ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি তারা পাকিস্তানের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য বিকাশের পক্ষেও কথা বলেন। লেখকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বিকাশ প্রসঙ্গে তারা বলেন, জাতীয় সমৃদ্ধি, বিশ্বজনীন শান্তি এবং জনকল্যাণের নীতিতে লেখকদের সৃজনী শক্তি পরিচালিত হওয়া উচিত। তারা সব ধরনের বিকৃতি, গতানুগতিকতা ও স্থবিরতা কাটিয়ে উঠে বাংলা সাহিত্যের আবহমান ঐতিহ্যের শানিত ধারাকে এগিয়ে নেয়া, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে মানবীয় দর্শনকে সমুন্নত রাখা এবং জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কঠোর অধ্যবসায়ের আহ্বান জানান।[৪০] ১৯৫৪ সালের ২০ ডিসেম্বর 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলুন' শিরোনামে অপর এক বিবৃতিতে সাহিত্যিকদের মধ্যে অনৈক্য, দেশব্যাপী নিরক্ষরতা, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি, প্রকাশনার সমস্যা, রাজনৈতিক সংকীর্ণতা, বিদেশী নোংরা সাহিত্যের উপদ্রবকে পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যে বন্ধ্যাত্বের প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[৪১]

সম্মেলনে প্রায় সব জেলা থেকে প্রতিনিধি আসে। এছাড়াও কয়েকজন উর্দু সাহিত্যিকসহ পশ্চিম বাংলা থেকে নয় জন সাহিত্যিক সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ ছিল আলোচনা, প্রদর্শনী, মোশায়েরা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। সর্বশেষ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। গল্প, উপন্যাস, কাব্য সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান, সমসাময়িক শিল্প সাহিত্য, ভাষা, সাহিত্য কৌশল ও ললিত কলা ইত্যাদি বিষয়ে সম্মেলনের আলোচনা বিভক্ত ছিল।

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তার ভাষণে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ সরকারের ভুল নীতির কথা সরাসরি উল্লেখ করে বলেন, দীর্ঘদিন বিদেশী শাসনের অধীনে থাকার পর ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট আমাদের দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। আশা করা হয়েছিল বাংলা সাহিত্য উন্নতির পথ খুঁজে পাবে। অনেক আশা-আকাংখা নিয়ে আমি ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে এর প্রতিক্রিয়া দেখে আমার মধ্যে এই উপলব্ধি এসেছে যে স্বাধীনতার নব উদ্দীপনায় অমরা মাতাল হয়ে পড়েছি। ফলে বাংলা ভাষার নাম ও চর্চার কথা বলা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য কবি ও পন্ডিতদের নাম নেয়া এবং তাদের সাহিত্য কর্ম নিয়ে আলোচনা এমনকি বাংলা ভাষার নাম নেয়াটাও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত হচ্ছে...এটা যারা করছে পাকিস্তানকে তারাই ধ্বংস করবে।[৪২]

---

৪০. পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন (পুস্তিকা নং-১)।

৪১. 'সাহিত্য সংস্কৃতির জন্য ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলুন' (পুস্তিকা নং ২)।

৪২. উদ্বোধনী ভাষণ (পুস্তিকা)।

www.pathagar.com

সামগ্রিক বিচারে সম্মেলন সফল হয়। সম্মেলনের সমর্থকরা মোটামুটিভাবে অসাম্প্রদায়িক দর্শন, সাহিত্যের স্থানীয় ঐতিহ্য এবং দেশে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও সম্মেলনে বুর্জোয়া মূল্যবোধের প্রাধান্য ছিল কিন্তু ব্যাপক অর্থে সাম্প্রদায়িকতা ও সামন্তবাদের পরাজয়ের বিষয়টি অনুল্লেখযোগ্য ছিলনা। তবে সম্মেলনের প্রধান দুর্বল দিক ছিল সাম্য চিন্তার অনুপস্থিতি।

পূর্ববর্তী আলোচনায় তৎকালীন সময়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে চিন্তার ৩টি লক্ষ্য দেখা যায়। কবি গোলাম মোস্তফা সমর্থিত আদর্শ ভিত্তিক সংস্কৃতির ধারণা এত সংকীর্ণ ছিল যে তা খুব বেশী সমর্থন পায়নি। তথাপি স্কুল পাঠ্য বই সম্পর্কে তার অভিমত চাওয়া হয়েছিল এবং তা গৃহীতও হয়েছিল। ফলে প্রবন্ধ নির্বাচন এবং নজরুলের কবিতায় 'ভগবান' এর স্থলে 'রহমান' বসিয়ে মূল পাঠ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীতে রেডিও কর্তৃপক্ষ তারই অনুসরণে নীতিমালা গ্রহণ করে। তবে স্কুল পাঠ্য বইয়ের চাইতে প্রচারধর্মী রচনা নির্বাচনের মধ্যে বিষয়টি বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠে।

সম্প্রদায় ভিত্তিক তত্ত্ব অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হয়েছিল। প্রধানতঃ তত্ত্বের প্রভাবে এবং অংশতঃ আদর্শিক অনুপ্রেরণায় অমুসলিম লেখকদের রচিত পাঠ্য বইয়ের পরিবর্তে মুসলমান লেখকদের রচিত পাঠ্য বই চালু করার জোর দাবী উঠে। এই দাবী কিছুটা পূরণ করা হয়। তবে বিশেষজ্ঞরা তা বেশী মানতে রাজী ছিলেন না। তাদের যুক্তি ছিল তাতে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে এই তত্ত্ব প্রভাব বিস্তার করেছিল বাংলা একাডেমী সংকলিত ও প্রকাশিত কিছু গ্রন্থে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ সংকলিত 'মধ্যযুগের সংগ্রহ' এবং স্বয়ং বাংলা একাডেমী সংকলিত 'আধুনিক কাব্য সংগ্রহ' বই দুটির কথা উল্লেখ করা যায়। এই গ্রন্থ দুটিতে শুধুমাত্র মুসলমান লেখকের কবিতা ও প্রবন্ধই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ধরনের সংকলনের ব্যাপারে আপত্তি থাকতে পারে তা নাম দেখে বুঝা মুশকিল। এই ধারণাজাত অনুপ্রেরণা থেকে নজরুল ইসলামকে পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়। এই ক্ষেত্রে নজরুলকে বাংলায় ইকবালের পরিপূরক এবং রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে দাঁড় করানো হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন এবং ১৯৫৮ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে এই মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শেষোক্ত সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি মৌলভী আবদুর রহমান দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা[৪৩] করেন, 'এখন আমি আর বাঙালী নই, এখন আমি পূর্ব পাকিস্তানী'।

৪৩. মোহাম্মদী, ১৯ বর্ষ, ৯ সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৬৫ বাংলা)।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

জাতীয় ভাষা প্রসঙ্গ

১৯৫২ সালে 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন' শুরু হওয়ার পর বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সামগ্রিকতা এবং তার শক্তিমত্তা নতুন করে প্রমাণিত হয়। তবে তা বিস্তারিত আলোচনার আগে আমাদের দেখতে হবে কি কি কারণে এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

ভারত বিভাগের তিন মাস আগে ১৯৪৭ সালের ১৯ মে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান হায়দরাবাদে (সিন্ধু) ঘোষণা করেন যে উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। সে সময় তার ঘোষণার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ উঠেনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ধরন-ধারণ দেখে বুঝা যাচ্ছিল যে, সরকার উর্দুকে দেশের রাষ্ট্রভাষা করতে আগ্রহী। ১৯৪৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত 'গণতান্ত্রিক যুব লীগের' এক সম্মেলনে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম এবং সরকারী ভাষা করার দাবী জানানো হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান 'তমদ্দুন মজলিসের' এক পুস্তিকায় বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যম ও সরকারী ভাষা, উর্দুকে আন্তঃ প্রাদেশিক ভাষা এবং ইংরেজীকে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে গ্রহণের দাবী জানানো হয়। পুস্তিকার দু'টি প্রবন্ধে কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল মনসুর আহমদ ভাষা সমস্যাকে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার আলোকে বিচার করে বলেন যে, উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা করা হলে পূর্ববাংলা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১] একই ধরনের আরেকটি প্রবন্ধে এনামুল হক আরো স্পষ্টভাবে যুক্তি দেখান যে, উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা হলে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং পূর্ববাংলা উর্দুভাষী পাকিস্তানীদের উপনিবেশে পরিণত হবে।[২] এসব প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করা হয়।

---

১. বদরুদ্দিন ওমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ খণ্ড (ঢাকা ১৯৭০), পৃঃ ১৪-১৭।

২. মোহাম্মদ এনামুল হক, মনীষা মঞ্জুষা, ২ খণ্ড (ঢাকা ১৯৭৬), পৃঃ ১০৫-১২৪।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মধ্যে সাধারণত তিক্ততা ও বিরোধ সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ভাষা।[৩] বহুভাষা ও বহু সংস্কৃতি অধ্যুষিত সমাজে কোন গোষ্ঠীর যদি অন্যদের চাইতে পৃথক ভাষা থাকে, তাহলে সেই গোষ্ঠী কর্তৃক নিজের ভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তিতে একটি একক সংস্কৃতি উদ্ভাবনের চেষ্টা চালানোর সম্ভাবনা থাকে। কোন সংস্কৃতি উৎকৃষ্ট হোক বা নিকৃষ্ট হোক সংশ্লিষ্ট জনগণের কাছে তা খুবই প্রিয় ও অহংকারের বস্তু। নিজ পরিচয়ে টিকে থাকা এবং এই পরিচয় প্রকাশের আকাঙ্খা তাকে নিজ অঞ্চলের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত করে তোলে। সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রকাশের দাবী ধর্মীয় ঐক্য বা ভৌগোলিক সংহতির চেতনার চাইতেও শক্তিশালী হয়ে থাকে।

জাতীয়তাবাদের[৪] প্রশ্নে কর্তৃপক্ষ ভাষাগত ঐক্যকে জাতীয় চেতনা ও জাতিসত্তা বিকাশের পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করে। ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম আদম শুমারিতে প্রাপ্ত দেশের মোট জনসংখ্যায় বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর শতকরা হার পরবর্তী সারণিতে দেখানো হলঃ[৫]

---

৩. R.L. Watts. Multi Cultural Societies and Federalism. submitted to B and B Commission (Canada). Book-1. Appendix V. P. 221.

৪. Carlon J.A. Hayes. Nationalism : A Religion (New York : The Macmillan Co.. 1960).
Hans Kohn. Nationalism : Its Meaning and History (Princeton : Van Nostrand. 1955).
Louis L.Snyder. The Meaning of Nationalism (New Brunswick N. J. Rutgers University Press. 1954).
Louis L.Snyder. The New Nationalism (Ithaca N.Y.: Cornell University Press. 1968).

৫. Compiled from the Census of Pakistan Population. 1961. Vol-1 (Karachi: Government of Pakistan. Ministry of Home and Kashmir Affairs. 1961).

www.pathagar.com

সারণি

১৯৫১ সালে মোট জনসংখ্যায় বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের শতকরা হার

	মোট জনসংখ্যায় বিভিন্ন মাতৃভাষার লোকদের শতকরা হার			প্রধান ভাষাসমূহে সাক্ষরতার শতকরা হার		
	পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
বাংলা	৫৬.৪০	৯৮.৪২	০.০২	৯.৫০	১৬.৬০	০.০১
পাঞ্জাবী	২৮.৫৫	০.০২	৬৭.০৮	০.০৯	০.০১	০.১৯
পশ্তু	৩.৪৮	-	৮.১৬	০.০৩	-	০.০৭
সিন্ধী	৫.৪৭	০.০১	১২.৮৫	০.৫১	-	১.১৮
উর্দু	৩.২৭	০.৬৪	৭.০৫	৩.৭৬	০.৮৬	৭.৬৩
বেলুচি	১.২৯	-	৩.০৪	-	-	০.০১
ইংরেজী	০.০২	০.০১	০.০৩	৩.১২	৩.৬৯	২.৩৫

পাকিস্তান রাষ্ট্রটি একটি অভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে জনসংখ্যার ৯৭ শতাংশ এবং পূর্ব-পাকিস্তানে[৬] জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ ছিল মুসলমান। আশা করা হয়েছিল যে, ইসলাম শুধু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যেই সম্পর্ক জোরদার করবে না, বরং সমগ্র রাষ্ট্রের একক জাতীয় বৈশিষ্ট্য গঠন প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে সৃষ্ট ঘটনাবলীতে এই আশা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এসব ঘটনা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সত্তা বিশেষ করে বাঙালী ও অবাঙালীদের বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দেয়। বাঙালীদের এই মোহমুক্তি

৬. ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তান প্রদেশ পূর্ববাংলা হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর এক বিশেষ আদেশবলে পাঞ্জাবী গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ প্রথম গণপরিষদ (১৯৪৭-৫৪) ভেঙ্গে দেন। এই আদেশে গভর্নর জেনারেল কর্তৃক পরিষদকে যেসব বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়, সেগুলো হচ্ছে- (১) পাকিস্তানের সংবিধান রচনা, (২) পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ গঠন, (৩) পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ।

The Morning News. 29th March 1955 (১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বরে পশ্চিম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা বিল পাস হওয়ার পর পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান হয়ে যায়)।

Constituent Assembly of Pakistan (CAP) Debates Vol. 1 (September 20. 1955). P.955.

www.pathagar.com

তাদের মধ্যে প্রবল আঞ্চলিকতাবাদী[৭] চিন্তাধারার জন্ম দেয় যা শেষ পর্যন্ত বাঙালী জাতীয়তাবাদে রূপ নেয় এবং সফল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সংগঠিত করে। যদিও পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩ দশমিক ৩ শতাংশ জনগণের মাতৃভাষা ছিল উর্দু, তথাপি কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুকেই একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়।[৮] এতে জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে এই সিদ্ধান্তের যথার্থতা নিয়ে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু ছিল প্রায় বিদেশী ভাষার মত। তাই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এই সিদ্ধান্তকে তাদের ওপর অহেতুক এবং অনাকাঙ্খিতভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বলে মনে করতে থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাতে বলা হয়,

১. বাংলাকে পাকিস্তান শাসিত এলাকার অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম ঘোষণা করতে হবে।

২. রাষ্ট্রীয় ভাষা ও যোগাযোগের ভাষা প্রশ্নে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে তা মূল সমস্যাকে পাস কাটানোর লক্ষ্যে পরিচালিত এবং তার অর্থ হচ্ছে বাংলা সাহিত্য এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা।

প্রস্তাবে বাংলা ভাষার প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন মন্ত্রীর বৈরী মনোভাব এবং 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার বাংলা ভাষা বিরোধী প্রচারণার[৯] নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়।

---

৭. আঞ্চলিকতাবাদ হচ্ছে অভিন্ন সংস্কৃতি, ইতিহাস ও স্বার্থে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সুনির্দিষ্ট অপ্রধান জাতিক বা আধিজাতিক এলাকার ব্যাপারে সচেতনতা ও তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন।

Webster's Third New International Dictionary of the English Language (Springfield. Mass : G & C. Marriam Company Publishers. 1966) PP. 1912.

আঞ্চলিকতাবাদ হচ্ছে মূলতঃ সাংস্কৃতিক ব্যাপার। ভারতীয় ভূগোলবিদ প্রকাশ রাও-এর মতে, আঞ্চলিকতাবাদের আবর্ত শুরু হয় সাংস্কৃতিক বাহন ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এবং তা চূড়ান্ত পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় অঞ্চল বিশেষের অর্থনৈতিক ও শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং অধিকতর রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন দাবীর মধ্য দিয়ে।

Bernard S. Cohn. "Regions Subjective and Objective : Modern Indian History and Society".

In Robert J Grane (Ed) Regions and Regionalism in South Asian Studies. Mono No. 5 (Duke University Program in Comparative studies on Southern Asia. 1967) PP. 27 (আঞ্চলিকতাবাদ বা আধিজাতিকতাবাদ হচ্ছে জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিপন্থী যা সংহতি নষ্ট করে এবং জাতি গঠন প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেয়)।

৮. পরস্পর ভাব বিনিময়ে 'জাতীয় ভাষা' কথাটিকে 'রাষ্ট্রীয় ভাষা' বা 'পাকিস্তানের সরকারী ভাষা' হিসেবে বলা হতো।

৯. বদরুদ্দিন ওমর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০-২১।

www.pathagar.com

ছাত্রদের প্রতিবাদ আন্দোলনে অন্যান্য স্তরের জনসাধারণও যোগ দেয়। ফলে ভাষা আন্দোলন রাজনৈতিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়। আন্দোলন পরিচালনার জন্য পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস 'রাষ্ট্রীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। ১৯৪৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী ফজলুর রহমান সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর মানি অর্ডার ফর্ম, পোস্টাল স্ট্যাম্প এবং মুদ্রায় উর্দু ও ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলা চালু করার আশ্বাস দেন।[১০]

মূলতঃ ভাষা বিরোধের সূত্রপাত হয় ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আইন পরিষদে খসড়া কার্যপ্রণালী বিধি গ্রহণ সম্পর্কিত বিতর্কের সময়। এই বিধিতে পরিষদ সদস্যদেরকে ইংরেজী বা উর্দুতে বক্তৃতা করার অনুমতি দেয়া হয়। সরকারী ভাষা থেকে বাংলাকে বাদ দেয়া হয়। এসময় পূর্ব বাংলার কংগ্রেস সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কার্যপ্রণালী বিধির সংশোধনী উত্থাপন করে ইংরেজী ও উর্দুর সাথে বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেন। তিনি বলেন,

> "আমি পরিষদকে আশ্বাস দিতে পারি যে, সংকীর্ণ প্রাদেশিক চেতনা থেকে আমি এটা করছি না... জনাব, আমি জানি বাংলা একটি প্রাদেশিক ভাষা কিন্তু আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, এটা বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা এবং বিভিন্ন ভাবে তা প্রতিষ্ঠিত। এ জন্য রাষ্ট্রের ভাষা সেটিই হওয়া উচিত যা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হয় এবং জনাব এ জন্য আমি বাংলাকে আমাদের দেশের যোগাযোগের অন্যতম ভাষা হিসেবে বিবেচনা করি।"[১১]

হিন্দু সদস্যের কাছ থেকে এই প্রস্তাব আসাতে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তার সততা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। তারা আশংকা করেন যে, বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বিরোধ লাগিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। প্রস্তাবের বিরোধিতা করে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বলেন, আমি ভেবেছিলাম সংশোধনীটি নির্দোশ একটি ব্যাপার অর্থাৎ পরিষদে মতামত ব্যক্ত করার ভাষা হিসেবে বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এটা আনা হয়েছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই বিষয়টি পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাবে এবং মুসলমানদের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত সাধারণ ভাষাকে বিপন্ন করবে।[১২]

---

১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২।

১১. CAP Debates. প্রাগুক্ত Vol-11 (February 25. 1948) PP. 17-46.

১২. প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও তমিজউদ্দীন খান, খাজা নাজিমুদ্দীন এবং গজনফর আলী খান প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। গজনফর আলী খান কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উত্থাপিত এই প্রস্তাবকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে বলেন, পাকিস্তানে সাধারণ ভাষা হবে একটি- উর্দু। উর্দু কোন প্রাদেশিক ভাষা নয়, বরং এটা হচ্ছে মুসলমান সংস্কৃতির ভাষা এবং মূলত উর্দু হচ্ছে মুসলমানদের সংস্কৃতি। খাজা নাজিমুদ্দীন দত্তের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে যুক্তি দেখান যে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগণের মনোভাব হচ্ছে উর্দুকেই একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

www.pathagar.com

লিয়াকত আলী খান তার সমাপনী ভাষণে উর্দুকে পাকিস্তানে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে গ্রহণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায়[১৩] ঘোষণা করে বলেন,

> "পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র তাই পাকিস্তানের যোগাযোগের ভাষা অবশ্যই মুসলিম জাতির ভাষা হতে হবে। প্রস্তাবকদের উপলব্ধি করতে হবে, এই উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলমানের দাবীতে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। আর কোটি কোটি মুসলমানের ভাষা হচ্ছে উর্দু। একটি জাতির জন্য একটি ভাষা থাকা দরকার এবং সেই ভাষা হতে পারে শুধুমাত্র উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়।"[১৪]

আইন পরিষদের এই বিতর্ক থেকেই ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।[১৫] ছাত্র-শিক্ষক, সংবাদপত্র ও সমায়িকী এবং পূর্ব বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা গণপরিষদের এই ঘটনা থেকে পথ নির্দেশ লাভ করে এবং প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে। ২৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা হরতাল আহবান করে এবং উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভের আয়োজন করে। তারা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, দত্ত উত্থাপিত প্রস্তাবে শুধুমাত্র সংখ্যালঘু নয় বরং সমগ্র বাঙালীর মতামত প্রতিফলিত হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা বাংলাকে জাতীয় ভাষা ঘোষণার দাবী জানায়, যদিও পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৭ শতাংশ বাংলা পড়তে ও লিখতে জানে। তাদের মতে, যদি বাংলাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা না হয়, তাহলে পূর্ববাংলার জনগণের প্রতি দারুণ অবিচার করা হবে, যারা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ। তারা মুদ্রা, স্ট্যাম্প, কাগজের টাকা এবং মানিঅর্ডার ফর্মে শুধুমাত্র উর্দু শব্দ রাখার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ষড়যন্ত্রের কথাও তুলে ধরেন। এসব যুক্তি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি সচেতন মহলে ব্যাপক আবেদন সৃষ্টি করে। জায়ারিং যথার্থভাবে জনগণের মনোভাব ফুটিয়ে তুলেছেন,

> "বাঙালীদের দাবী প্রকৃতপক্ষে এতো বেশী সঙ্গত যে, এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের

---

১৩. ভাষাবিদরা সাধারণভাবে উর্দুকে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে বিবেচনা করেন। সুতরাং সমস্যাটা প্রকৃতপক্ষে উর্দুকে বহু ভাষাভাষী অঞ্চলে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা নয়, বরং পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ নিয়েই সমস্যার সৃষ্টি। লিয়াকত আলী খান প্রমুখরা উর্দুকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা বলতে যা বুঝাতেন, তা হচ্ছে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ও সরকারী ভাষায় পরিণত করা।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

১৫. বিচিত্রা, ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩, পৃঃ ৩৫-৪২।

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত থেকে একটিমাত্র উপসংহারে পৌছা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে অধীনস্থ অবস্থানে রাখতে সচেষ্ট ছিল।"[১৬]

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে বাংলাকে সরকারী ভাষা করার আন্দোলন জোরদার হয়। ২ মার্চ একটি সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এতে পিপলস ফ্রিডম লীগের দু'জন, তমদ্দুন মজলিস থেকে দু'জন, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে দু'জন, ফজলুল হক মুসলিম হল থেকে দু'জন, পূর্ব বাংলা মুসলিম ছাত্রলীগ থেকে দু'জন প্রতিনিধি নেয়া হয়। কমিটি আরো নিখুঁতভাবে দাবী তুলে ধরে। রাজনীতিবিদগণ বিশেষ করে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা কমিটিতে না থাকায় তাদের প্রতি সবার দৃষ্টি পড়ে। এই দাবীটি ছিল মোটামুটিভাবে তরুণদের এবং কার্যত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়।[১৭]

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলন সহিংস রূপ নেয়। এদিন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রথমবারের মত সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। এসময় বাংলা ভাষাকে জাতীয় মর্যাদা প্রদানের দাবীতে পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয়ের বাইরে সমবেত ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠি চার্জে প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্র জখম হয়। ছাত্ররা সচিবালয় গেট, হাইকোর্ট এবং অন্যান্য অফিসে পিকেটিং করতে চেয়েছিল। তারা খাজা নাজিমুদ্দিন ও তার মন্ত্রী পরিষদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং বাংলা ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করা অন্যথায় গণপরিষদ থেকে পদত্যাগ করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের সকল সদস্যকে চাপ দিতে থাকে।

সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে এই বিক্ষোভকে গোলযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য হিন্দু এবং শত্রু চরদের নিছক চক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাদের মতে, ভাষা আন্দোলন রাষ্ট্র বিরোধী চক্রের প্ররোচনায় গড়ে ওঠেছে। তবে অব্যাহত আন্দোলনের ফলে খাজা নাজিমুদ্দীন আতংকিত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ জিন্নাহর ঢাকা সফরের কথা ছিল। স্বাধীনতার পর এটাই ছিল তার প্রথম এবং একমাত্র ঢাকা সফর। নাজিমুদ্দীন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ১৫ মার্চ রাষ্ট্রীয় ভাষা সংগ্রাম কমিটির সাথে আলোচনায় সম্মত হন। আলোচনা শেষে সরকার নিম্নলিখিত চুক্তি ঘোষণা করেন,[১৮]

১. পূর্ব বাংলা পরিষদ (সে সময় অধিবেশন চলছিল) বাংলাকে পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা এবং সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করবে।

---

১৬. Lawrence Ziring: The Failure of Democracy in Pakistan: East Pakistan and the Central Government. 1947-58 (Columbia University. 1962). PP. 120-121.

১৭. Kamruddin Ahmed. The Social History of East Pakistan (Dhaka. 1907). PP. 109.

১৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০।

www.pathagar.com

২. পূর্ব বাংলা পরিষদ আরেকটি প্রস্তাবে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করবে।

৩. আন্দোলনের সময় গ্রেফতারকৃত সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দেবে।

৪. আন্দোলনের সমর্থক এবং প্রচারকারী পূর্ব বাংলা ও কলকাতার সকল পত্র-পত্রিকার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে।

৫. নির্যাতন চালানোর বিষয় তদন্ত করে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ ও তাদের কমান্ডিং অফিসাদের বিরুদ্ধে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন করা হবে।

৬. এই আন্দোলনকে গভীর দেশপ্রেম ও স্পর্শকতার বলে ঘোষণা করা হবে এবং মুখ্যমন্ত্রী তা ঢাকা রেডিও থেকে ঘোষণা করবেন।

৭. আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে জারিকৃত সকল গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করা হবে।

৮. মুখ্যমন্ত্রী তার পূর্ববর্তী বিবৃতি প্রত্যাহার করে নেবেন, যে বিবৃতিতে তিনি আন্দোলনকারীদেরকে কমিউনিস্টি এবং দেশের শত্রু বলে চিহ্নিত করেন। (এই বিষয়টি মুসাবিদায় ছিল না। নাজিমুদ্দিন পরে তা অন্তর্ভুক্ত করেন এবং নিজেই চুক্তিতে লিখে দেন)।[১৯]

চুক্তি স্বাক্ষরের মাত্র দু'দিন পর নাজিমুদ্দিন মত পরিবর্তন করেন এবং পূর্ব বাংলা পরিষদ ভাষার প্রসঙ্গটি বেমালুম ভুলে যায়। ছাত্ররা এটা জানতে আসলে নতুন করে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য রাজপথে তাদের পাকড়াও করা হয়। পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং ফাঁকা গুলীবর্ষণ করে।[২০] নতুন করে ছাত্র আন্দোলনের মুখে বিচলিত নাজিমুদ্দিন গবর্নর জেনারেল কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে অবিলম্বে পূর্ব বাংলা সফরের আমন্ত্রণ জানান। এমন ভাষায় চিঠি লিখে গবর্নর জেনারেলকে আমন্ত্রণ জানানো হয় যে, তিনি তা উপেক্ষা করতে পারেননি।[২১]

জিন্নাহ আসেন এবং সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন কিন্তু পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পরিবর্তন বা সংশোধন করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বৈরাচারী। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতার শুরুতে জিন্নাহ বলেন, তিনি পাকিস্তানের শত্রুদের বরদাশত করবেন না। তারা মুসলমান হলেও তার কণ্ঠ ছিল দ্ব্যর্থহীন। জিন্নাহ বলেন, আমি আপনাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, উদুর্ই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে যাচ্ছে, অন্য কোন ভাষা

---

১৯. বদরুদ্দিন ওমর, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮২।

২০. নাজিমুদ্দিন এই মন্তব্যও করেন যে, অব্যাহত গোলযোগের কারণে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ভাষা বিরোধ নিছক একটি ধূম্রজাল। দি স্টেটসম্যান, ১৮ মার্চ ১৯৪৮।

২১. Hector Bolitho. Jinnah : Creator of Pakistan (London 1954) PP. 210-211.

www.pathagar.com

নয়।[২২] শ্রোতারা চিৎকার করে একাধিকবার 'না, না' বলে তাদের অসম্মতি জানিয়ে দেন। তিন দিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি ভাষা আন্দোলনকারীদের 'পঞ্চম বাহিনী' বলে আখ্যায়িত করে দেশকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে 'প্রাদেশিকতাবাদের বিষ' ছড়ানোর জন্য তাদেরকে অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, বাঙালীরা প্রদেশে সরকারীভাবে ব্যবহারের জন্য যে কোন ভাষা তাদের ইচ্ছা মত নির্বাচন করতে পারে কিন্তু তিনি উর্দুকে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগের ভাষায় পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা পুনরায় তুলে ধরে বলেন,

> "এ ক্ষেত্রে কোন ভুল নেই যে, রাষ্ট্রের সহযোগী অঞ্চলগুলো যদি ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে চায় তাহলে ভাষা হবে একটি এবং আমার মতে সেই ভাষাটি হতে পারে একমাত্র উর্দু।"[২৩]

গ্রাজুয়েটরা তার বক্তৃতা শোনেন কিন্তু 'না, না' বলে কয়েকবার বক্তৃতার মধ্যে বাধা দেন।

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের বিবৃতির পাশাপাশি কায়েদে আজমের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার ফলে পূর্ববাংলায় ব্যাপক ক্ষোভ ও হতাশার জন্ম দেয়। বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা এই বিবৃতিকে বাঙালীর অনুভূতি ও তাদের ভাষার প্রতি সরাসরি অবমাননা বলে বিবেচনা করে। যেহেতু ভাষা হচ্ছে ভাব ও আশা-আকাঙ্খা প্রকাশের বাহন ও মাধ্যম, তাই সরকারের এই মনোভাবকে রাষ্ট্রের মধ্যে বাঙালী সংস্কৃতি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিপন্ন করার লক্ষ্যে পরিচালিত বলে ধরে নেয়া হয়। শুধুমাত্র ক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করার জন্য ১৯৪৮ সালের ৬ এপ্রিল নাঈমুদ্দিন নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবটি পূর্ববাংলা পরিষদে উত্থাপন করেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বাংলার সমর্থনে উত্থাপিত এই প্রস্তাবের মুসাবিদা ছিল ইংরেজীতে লেখা।[২৪]

ক. পূর্ব বাংলা প্রদেশে সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলাকে গ্রহণ করতে হবে এবং

খ. পূর্ব বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার মাধ্যম হবে যথাসম্ভব বাংলা অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রের মাতৃভাষা।

দীর্ঘ ও উত্তপ্ত বিতর্কের পর এই প্রস্তাব কয়েকটি সংশোধনীসহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।[২৫] যেমন-

---

২২. Quaid-E-Azam Mohammad Ali Jinnah. Speeches as Governor General of Pakistan. 1947-48 (Pakistan Publications. Karachi) PP. 82-91.

২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮।

২৪. Official Report. East Bengal Legislative Assembly. First-Session. 1948 (Vol-1. No-4). P. 57.

২৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৫-১৬৫।

www.pathagar.com

ক. পূর্ব বাংলা প্রদেশে সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা গ্রহণ করা হবে এবং এ ক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যাসমূহ দূর করার সাথে সাথে তা বাস্তবায়িত হবে; এবং

খ. পূর্ব বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার মাধ্যম হবে যথাসম্ভব বাংলা অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রের মাতৃভাষা।

কিন্তু এতে জনগণের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়নি। ফলে পূর্ববাংলার জনগণের সন্দেহ ও অবিশ্বাস থেকে স্বাধীনতার পরপরই ভাষা প্রশ্নটি দ্রুত রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। এ আন্দোলন পূর্ববাংলা এবং পরে পূর্ব পাকিস্তান বলে পরিচিত এলাকায় প্রধানত আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম দেয়। ১৯৭১-এর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মূল ভিত্তি এখানেই রচিত হয়েছিল।

ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে বাংলার মুসলমানদের মনে কোন্ বিষয়টি কাজ করেছে তা সঠিক প্রেক্ষাপটে উপলব্ধি করতে হবে। বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকে এই অঞ্চলের মুসলমান অভিজাত শ্রেণী ইংরেজী শিক্ষা এবং নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীনতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিদ্বেষ প্রদর্শন করে।[২৬] পক্ষান্তরে হিন্দুরা পাশ্চাত্য থেকে নতুন জ্ঞান আহরণে কোনো দ্বিধা বোধ করেনি। তাদের মধ্যে সুযোগ সন্ধানীরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। অন্যদিকে ইংরেজী শেখার বদৌলতে হিন্দুরা ক্ষমতাসীন বৃটিশ কর্তৃপক্ষের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পায় এবং অঞ্চলের 'স্থানীয়' লোকদের জন্য যেসব পেশা উন্মুক্ত হয় তাতে প্রবেশ করে। অংশত এই কারণে বাংলায় হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে।[২৭] ইংরেজী ভাষার উপর দখল এবং নতুন শিক্ষার

---

২৬. A.R. Mallick. British Policy and the Muslims in Bengal. 1957-1856 (Dhaka : Asiatic Society of Pakistan. 1961). and Istiaq Hussain Qureshi. The Muslims Community of the Indo-Pakistan Sub-Continent (610-1947) : A Brief Historical Analysis (The Hague : Manton & Co Publishers. 1962).

২৭. ভদ্রলোকের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'সম্মানিত লোক'। ভদ্র ও অভদ্রের মধ্যে মৌলিক ও কঠোরভাবে যে দূরত্ব রক্ষা করা হতো তা হচ্ছে, উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর দূরত্ব। সম্মানিত ও অন্যান্য প্রভাবশালী লোকেরাই ছিল ভদ্রলোক তারা কায়িক শ্রম থেকে মুক্ত ছিল এবং কায়িক শ্রমের পেশাকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করতো। উনিশ শতকের শেষ দিকে 'ভদ্রলোক' কথাটি প্রায়ই উচ্চ শ্রেণীর সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বিশ শতকের গোড়ার দিকে হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী ছিল সামাজিক সুবিধাভোগী ও সচেতন উঁচু গোষ্ঠী, তারা অর্থনৈতিকভাবে ভূমি মুনাফার ওপর নির্ভরশীল, পেশাজীবী এবং কেরানী চাকরিজীবী। উঁচু শ্রেণীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা এবং শিক্ষার সুবাদে তারা সাধারণ মানুষ থেকে দূরত্ব রক্ষা করে চলতো।

H. Broomfield. Elite Conflict in a Plural Society : Twentieth Century Bengal (Berkly : University of California Press. 1968) PP. 5-41.

N.S. Bose. The Indian Awakening and Bengal (Calcatta. 1960).

B.B. Misra. The Indian Middle Class : Their Growth in Modern Times (London 1961).

www.pathagar.com

কারণে নিম্ন মর্যাদার লোকদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের গৌরব তাদেরকে পৃথক একটি শ্রেণীতে পরিণত করে। বৃটিশ শাসকদের সাথে ঘনিষ্ঠতা এবং আমলাতান্ত্রিক ও পেশাগত দায়িত্ব পালনের কারণে তারা সুষ্ঠুভাবে নয়া প্রশাসন চালানোর ব্যাপারে বৃটিশদের আস্থা অর্জন করে। এতে তারা নিজেদের প্রকৃত পদ মর্যাদার তুলনায় বেশী সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতা অর্জন করে। অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে তারা বাংলার জনগণের জন্য সম্ভাব্য সকল গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মর্যাদা একচেটিয়া নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।[২৮]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্থে ধীরে ধীরে উপমহাদেশের মুসলিম অভিজাতরা নতুন শিক্ষা গ্রহণ না করার ভুল বুঝতে পারে যে নতুন শিক্ষা তাদের ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদার পথ সুগম করতে পারতো। অতীতের ভুল সংশোধনের জন্য তারা বৃটিশ ভারতের মুসলমানদের জন্য ইংরেজী শিক্ষার আয়োজন করতে শুরু করে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। তিনি আলীগড়ে মুসলমানদের জন্য এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুল পরবর্তীতে বিখ্যাত আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।[২৯] এই উদ্যোগের আরও উদ্দেশ্য ছিল, উপমহাদেশের মুসলমানদের সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তোলা, নিখিল ভারতের প্রেক্ষাপটে মুসলমানদেরকে তাদের স্বতন্ত্র সত্তা এবং উন্নতমানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে নয়া উপনিবেশিক নিয়ম-নীতির কাঠামোর আওতায় বৃহত্তর সামাজিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য সরকারী ও প্রশাসনিক দায়িত্বে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা। স্যার সৈয়দ আহমদের প্রতিষ্ঠান এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান মুসলিম উচ্চশিক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় সমগ্র ভারতবর্ষের ছাত্রদেরকে আকৃষ্ট করে। প্রধানত উর্দুভাষী এলাকা আলীগড় উপমহাদশে মুসলিম সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হওয়ায় স্বকীয় ভাবমূর্তিতে ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। ভারতের

---

২৮. H. Broomfield. প্রাগুক্ত পৃঃ ৫-৪১।

২৯. স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-৯৮) মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার জন্য অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এই লক্ষ্যে তিনি ১৮৭৫ সালে আলীগড়ে একট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৭ সালে লর্ড লিটন মোহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯২১ সালে তা আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে উপমহাদেশে মুসলিম শিক্ষার পাদপীঠ।

Shah Muhammad. Sir Syed Ahmed Khan : A Political Biography (Merrut : Meenakshi Prakashani. 1969).

www.pathagar.com

নব্য মুসলিম অভিজাতরা আলীগড়কে তাদের সম্মেলন কেন্দ্র এবং অস্তিত্বের উৎস হিসেবে মনে করতে থাকে।[৩০]

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানদেরকে আলীগড়ের ভাষা এবং উপমহাদেশের মুসলিম অভিজাতদের সাধারণ ভাষা হিসেবে বিবেচিত উর্দুর ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলে। এটা উনবিংশ শতকের শেষ দিকে বাংলার নও মুসলিম অভিজাতদের ক্ষেত্রেও সত্য। নবাব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আমীর আলীকে এ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা যায়। এসব নও মুসলিম অভিজাতদের মূলে ছিল তাদের ভূ-সম্পত্তি। অন্য কথায় তারা উচ্চতর সরকারী ও প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং বৃহত্তর সামাজিক ক্ষমতার আশায় বিশাল ভূসম্পত্তি অর্জনে ব্যস্ত ছিল। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, এটা ছিল ভূসম্পত্তি ও সরকারী মর্যাদা অর্জনের মাধ্যমে ভদ্রলোক হওয়ার জন্য মুসলিম প্রতিপক্ষের পাল্টা উদ্যোগ। পরবর্তীতে মুসলিম লীগেও আলীগড়ের আদর্শে দীক্ষিত এসব লোকদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়- যারা ছিল উর্দুর প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং এই ভাষাকে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমাদৃত ও মর্যাদাশীল বলে মনে করতেন। এ জন্য বাংলার বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে মাতৃভাষা হিসেবে উর্দু চর্চার বিষয়টি অহেতুক বা ভিত্তিহীন ছিল না। এই প্রসঙ্গে ঢাকার নবাব পরিবার এবং মেদিনীপুরের সোহরাওয়ার্দী পরিবারের কথা উল্লেখ করা যায়। তাদের কেউ কেউ নিজেদেরকে বাঙালী হিসেবে পরিচয় দিতেও আগ্রহী ছিলেন না। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলা সাহিত্যে বাংলার উর্দুভাষী মুসলমানদের 'মুসলিম' পরিচিতির সুনির্দিষ্ট উল্লেখ রয়েছে।[৩১]

তবে একই সাথে গ্রামীণ লোক সংস্কৃতির একটি সমান্তরাল ধারাও চালু ছিল। বিশাল পল্লী এলাকায় বসবাসকারী বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন থেকে এই সংস্কৃতির উৎপত্তি এবং সেই জীবন ধারার সাথে তা সংশ্লিষ্ট ছিল। এই সংস্কৃতির আবেদন সাম্প্রদায়িক ব্যবধান ও পরিচয়ের উর্ধে এবং অনেকটা বিশ্বজনীন। বৈষ্ণব ও বাউল সম্প্রদায়, বিভিন্ন তীর্থস্থান ও দেবতার রূপান্তর হচ্ছে হিন্দু, মুসলিম ও বৌদ্ধ ধর্মীয় চিন্তাধারার বৈপরীত্য ও সংমিশ্রণের ফল, যা প্রধানত কৃষি নির্ভর পল্লী সমাজে প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতির সাথে একাত্ম। লোক সংস্কৃতির প্রকাশ মাধ্যম হচ্ছে বাংলা যা পল্লী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিপুলসংখ্যক লোকের কথিত ও বোধগম্য একমাত্র ভাষা। গ্রামবাংলার মুসলমানরা শুধু

---

৩০. এই প্রতিষ্ঠান তাদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করে, তাদের নতুন দিক-নির্দেশনা দেয়। এই প্রতিষ্ঠান গভীর হতাশা কাটিয়ে মুসলমানদেরকে সফল তৎপরতার দিকে নিয়ে যায়। এই প্রতিষ্ঠান এমন মুসলিম বংশধর তৈরী করে যারা ইসলামের প্রতি মৌলিক আনুগত্য ক্ষুণ্ন না করেই বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও চিন্তা-দর্শন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বস্তুত আলীগড় ছিল মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টির সুতিকাগার।
I.H. Qureshi প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪২।

৩১. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (ঢাকা ঃ লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪)।

www.pathagar.com

এই বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্লীনই নয়, তারা অন্যদের মত এই লোক সংস্কৃতির আবেদনের প্রতিও অনুভূতিপ্রবণ। তাদের ধর্মীয় পরিচিতি অনেকাংশে এই সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। লোক সাহিত্যের বিশাল সম্পদ বিশেষ করে দোভাষী পুঁথি, মোমেনশাহী গীতিকা, মুর্শিদী, মারেফতী এবং বাউল সঙ্গীত এই সংস্কৃতির উৎকৃষ্টতার সাক্ষ্য বহন করে।৩২

উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শহর এলাকায় বসতি স্থাপনকারী বাংলার একশ্রেণীর মুসলিম অভিজাত দুঃখজনকভাবে উর্দু ভাষার সাথে সংযোগ রক্ষার মাধ্যমে নিজেদেরকে সর্বভারতীয় পরিচয় দিয়ে ধন্য হওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অথচ গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমান যোগাযোগের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য বাহন হিসেবে তাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করে। ফলে সর্বভারতীয় সাজার বিষয়টি সহজে এড়িয়ে যায়। নিজের মাতৃভাষার প্রতি তারা অনুরক্ত ছিল এবং এজন্য তারা গর্ববোধ করতো। কেননা প্রত্যেকে নিজের মাতৃভূমি নিয়ে গর্ববোধ করে এবং উর্দুমুখী সর্বভারতীয় ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সমর্থকদের পক্ষ থেকে যে কোন বাধার মোকাবিলা করে। আর তাদের সংস্কৃতি নিজস্ব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে তারা নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি দ্ব্যর্থহীন আনুগত্য প্রকাশে কোনরকম হীনমন্যতায় ভুগতো না। সেই সময়ে মুসলমানদের প্রকাশিত স্থানীয় সাময়িকী ও পত্রিকাগুলো মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় পূর্ণ থাকতো। কিন্তু এটা কোনভাবেই নিজ দেশে মুসলমান নাগরিক হিসেবে তাদের অধিকারের দাবীর সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না।[৩৩]

দেশ বিভাগের সময় (১৯৪৭) বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তৃতীয় এক শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। তারা ছিল উদার ও প্রগতিশীল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মনিরপেক্ষ। বাংলার এসব কৃতী সন্তানের অবদানে আধুনিক বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে। যেমন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জসিম উদ্দীন,

---

৩২. Quazi Abdul Mannan. The Emergence and Development of Dobhashi Literature in Bengal. 2nd edition (Dhaka : Bangla Academy. 1974).
মোহাম্মেদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (চট্টগ্রাম : বইঘর, ১৯৭৫), পৃঃ ২৩-২৯।
দীন মোহাম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৯), পৃঃ ২৩১-২৩৬।
দীনেশ চন্দ্র সেন (সম্পাদিত) ময়মনসিংহ গীতিকা (কলকাতা : বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৩)।
বদিউজ্জামান (সম্পাদিত) মোমেনশাহী গীতিকা (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৬৮)।

৩৩. Mustafa Nurul Islam. Bengali Muslim Public Opinion as Reflected in the Bengali Press. 1901-1930 (Dhaka : Bangla Academy. 1973). PP. 226-229.

www.pathagar.com

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ। নব্য শ্রেণী এসব কৃতী সন্তানদেরকে নিজেদের গৌরবময় উত্তরাধিকার হিসেবে বিবেচনা করতো। তাদের চিন্তাধারা ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য অপরিহার্য, সংস্কৃতি ছিল তাদের কাছে অবিচ্ছেদ্য এবং জাতিসত্তা ছিল তাদের কাছে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ফসল ছাড়া আর কিছু নয়। সন্দেহ নেই তারা ছিল মোট জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্রতম অংশ কিন্তু ভাষার প্রশ্নটি যখন সামনে আসে, তখন এরাই বাংলাভাষার পক্ষে নেতৃত্ব দানে এগিয়ে আসে এবং তাদের ডাকে এতদাঞ্চলে লোক সংস্কৃতির অনুসারী বিপুল সংখ্যক জনগণ এগিয়ে আসে। শুধুমাত্র মুসলিম লীগের মত কিছু শহুরে অভিজাত তাদের বিরোধিতা অব্যাহত রাখে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জাতীয় ভাষা হিসেবে একটি ভাষা গ্রহণ করা হলে তা বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের চেতনা বিকাশে অনেকটা সহায়ক হতো। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে সত্য ছিল। কেননা অভিন্ন জাতীয় ভাষার অভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগ ছিল দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠে, এতগুলো ভাষা থাকা অবস্থায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উর্দুকেই অগ্রাধিকার দিলেন কেন? দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোকে সামনে রেখে অন্যান্য ভাষাগুলোর গুরুত্বকেও গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার ছিল।

উর্দু হচ্ছে তাতার শব্দ, এর শাব্দিক অর্থ 'রাজকীয় সেনাশিবির'।[৩৪] এই নামকরণের কারণ ভারতের মুসলমান শাসনামলে (১৫২৬-১৮৫৭) বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সৈন্যদের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে উর্দুর উৎপত্তি হয়। উর্দু ভাষার উৎপত্তির মূলে ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের এমন একটি ভাষা সৃষ্টির আগ্রহ যাতে স্থানীয় বাগধারা, অভিন্ন ফার্সি সংস্কৃতিজাত ঐতিহ্য এবং তাদের আরবী উত্তরাধিকার প্রকাশ পাবে। এ জন্য ফার্সি ও হিন্দি শব্দের সংমিশ্রণ থেকে উর্দু ভাষার উদ্ভব ঘটে। উর্দুর রূপতত্ত্ব ও বাক্যরীতি হিন্দি থেকে সৃষ্ট, কিন্তু শব্দভাণ্ডার এসেছে সাধারণত আরবী ও ফার্সি থেকে। উর্দু লেখা হয় ফার্সি বর্ণমালায়। উর্দুর উৎপত্তি মুসলিম শাসক এবং মুসলমান সমাজের উঁচু স্তরের সাথে সম্পৃক্ত বিধায় তা উপমহাদেশে মুসলমানদের যোগাযোগের ভাষা হিসেবে গণ্য হতে থাকে। অন্যদিকে, মুসলিম রেনেসাঁ যুগ তথা মুসলমানদের জাতীয় জাগরণের সাথেও উর্দু সংরক্ষণের বিষয়টি গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এসময় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মধ্যে হিন্দি-উর্দু বিতর্কে মুসলমানরা দৃঢ়তার সাথে উর্দুর পক্ষাবলম্বন করে। মাতৃভাষা হিসেবে উর্দু ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার আনুমানিক ৩ দশমিক ৩ শতাংশ হলেও তার গুরুত্ব এই

---

৩৪. S.M. Ikram and P. Spear (edgs). The Cultural Heritage of Pakistan (Karachi : Oxford University Press 1955) P. 119.
H.M. Matin. National Language of Pakistan (Karachi : Marsh Publishing House. 1954).

www.pathagar.com

সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান এবং অবিভক্ত ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে অথবা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে উর্দু ছিল অন্য যে কোন ভাষার চেয়ে অধিক জনপ্রিয়। এ জন্য সাধারণভাবে উর্দুকে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে গণ্য করা হতো এবং শিক্ষিত শ্রেণী ছিল উর্দুর গুরুত্বের ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন। উপরন্তু ভারতে বৃটিশ শাসনামলে উর্দুকে মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একমাত্র ভাণ্ডার বলে বিবেচনা করা হতো।

পশ্চিম পাকিস্তানীরা উর্দুকে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণের পেছনে অর্থনৈতিক কারণও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী ও লাহোরের মত মুষ্টিমেয় কয়েকটি শহর ছিল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান কেন্দ্র। অন্য দিকে দেশের প্রশাসনিক ও ব্যাংকিং সদর দফতরও ছিল এসব শহরে। বিপুল সংখ্যক আমলা ও শিল্পদ্যোক্তা হিজরত করে তখন ভারত থেকে পাকিস্তানে আসে, যাদের ভাষা ছিল উর্দু। এসব কেন্দ্রে আরও যেসব বড় বড় শিল্প গড়ে ওঠে সেগুলোর মালিক বা ব্যবস্থাপনায় ছিল মুষ্টিমেয় পরিবার[৩৫] যারা বাড়ীতে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে উর্দুই ব্যবহার করতেন। সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুপস্থিতির কারণে এসব শিল্পোদ্যোক্তা ও আমলা দেশের প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে আবির্ভূত হতে সক্ষম হন। স্বাভাবিকভাবে সমগ্র অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর তারা নিজেদের কর্তৃত্বকে নিরঙ্কুশ করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে উর্দু ভাষা নির্বাচন ছিল জুতসই ও যথার্থ। তারা সাফল্যের সাথে উর্দুভাষী গোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। দেশের অন্যান্যরাও সমানভাবে উর্দুকে মেনে নিলে তাদের অবস্থান আরো মজবুত হতো। কেননা সে ক্ষেত্রে তারা দেশের অবশিষ্ট জনগণের ওপর এক জটিল ভাষার বোঝা চাপিয়ে দিতে পারতেন। আর বাড়তি বোঝার ভারে ন্যুব্জ জনগণের পক্ষে ক্ষমতার জাদুচক্রে প্রবেশ করা অধিকতর কঠিন হয়ে পড়তো। সে ধরনের পরিস্থিতিতে আমলাতন্ত্রের ওপর এসব পরিবারের নিয়ন্ত্রণ খর্ব করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। ফলে তাদের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণও অক্ষুণ্ন থেকে যেতো। প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সদর দফতরগুলো পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ইতোমধ্যেই তা অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রক্রিয়া সৃষ্টি ও সামাজিক ব্যবধান তৈরীর সহায়ক হয়ে পড়ে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণও স্থিতাবস্থা রক্ষার পক্ষপাতী ছিল। সে জন্য উর্দুকে জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানে তেমন কোন প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি। জনগণের মধ্যে যাদের মাতৃভাষা উর্দু ছিল না, উর্দুতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তারাও তেমন কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি। উপরন্তু যারা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রভাবশালী ছিলেন তাদের মাতৃভাষা ছিল উর্দু অথবা তারা উর্দু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে লালিত হয়েছিলেন। এ জন্য

৩৫. পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি পরিবারের হাতে পুঞ্জীভূত ছিল।

www.pathagar.com

জাতীয় ভাষা হিসেবে উর্দুকে মেনে নেয়ার ব্যাপারটি পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

তবে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভাষার দিক থেকে পূর্বাঞ্চলের জনগণ মোটামুটি সমগোত্রীয়, যা পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ছিল না।[৩৬] আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি যে, শহুরে অভিজাতদের একটি ক্ষুদ্রগোষ্ঠী অথবা তাদের মত সামাজিক মর্যাদার প্রত্যাশী ছাড়া সমাজের বাকি জনগণ ছিল বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালবাসার অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ। তারা উপমহাদেশের অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্য হিসেবে বাংলা ভাষার জন্য গর্ববোধ করতো এবং তারা যে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ধারার অধিকারী সে ব্যাপারে ছিল গভীরভাবে সচেতন। ভন ভরিসের ভাষায়, তারা ছিল নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে ব্যাপক ও দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত।[৩৭] অবশ্য বাঙালীরা উর্দুকে অন্যতম জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণের বিরোধী ছিল না। তাদের দাবী ছিল বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা করা।

যারা বাংলা ও উর্দুকে জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন তারা নিজেদের মতের সমর্থনে কানাডা, সুইজারল্যান্ড ও বেলজিয়ামের মত বহু ভাষাভাষী দেশসমূহের দৃষ্টান্তকে যুক্তি হিসেবে পেশ করেন। আর বাংলার পক্ষে তাদের দাবী ছিল আইন ও গণতন্ত্রসম্মত। কেননা বাংলা ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা এবং জাতীয় ভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করা হলে তা পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যকার ঐক্যের বন্ধনকেও অনেকাংশে শক্তিশালী করতো।

ভাষা বিরোধকে বিশ্লেষণ করলে এর পেছনে যে গভীর অর্থনৈতিক দিক রয়েছে তা দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার মত নয়। উর্দুকে একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হলে বাঙালী তরুণদের ওপর বাড়তি বোঝা চাপতো। তাদেরকে বাংলা, ইংরেজী ও আরবী ছাড়া উর্দু ভাষাও শিখতে হতো। কারণ আরবী হচ্ছে মুসলমানদের কোরআন মজীদের ভাষা, সরকারী ভাষা হিসেবে চালু রয়েছে ইংরেজী। তদুপরি তখন পর্যন্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজী। এসব ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছাড়া একজন বাঙালী তরুণের পক্ষে দেশের সরকারী পর্যায়ে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করা দুরূহ হয়ে যেতো। শুধুমাত্র উর্দু চাপানোর কারণেও সাধারণভাবে বাঙালীদের জীবন-জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তো। এমনিতেই সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের

---

৩৬. পাকিস্তানে ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের মোট লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৮ লাখ ৪০ হাজার ২শ' ৩৫ জনের মধ্যে ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৮শ' ৭৬ জন হচ্ছে বৌদ্ধ (শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ), ১ লাখ ৪৮ হাজার ৯শ' ৩ জন খৃষ্টান এবং ৪৭ হাজার ৪শ' ১৫ জন অন্যান্য। তাদের অধিকাংশের মাতৃভাষা বাংলা।

৩৭. Karl Von Vorys. Political Development in Pakistan (Princeton. Princeton University Press. 1965). P. 28.

www.pathagar.com

লোকদের প্রতিনিধিত্ব ছিল তুলনামূলকভাবে কম। তার ওপর যদি উর্দুকে একমাত্র সরকারী ভাষা করা হয় তাহলে বাঙালীদের কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরি পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে কমে যেতো। এজন্য উক্ত সরকারী নীতিকে মেনে নেয়া পূর্ব পাকিস্তানীদের অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। এ জন্য ভাষা প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের স্পর্শকাতর হওয়াটা কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিষয় ছিল না, বরং তার অর্থনৈতিক ভিত্তিও ছিল। তাই উর্দুকে একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অসম্ভব না হলেও কঠিন ছিল। এভাবে ভাষা প্রশ্নটি সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে।

মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ অবশ্য শুধু যে বাংলা ভাষার বিরোধিতা করেছেন তাই নয়, বরং তারা উর্দুকে জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতেও মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। এটা জনগণের ইচ্ছার অনুরূপ ছিলা না। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ লোক বাঙালী হলেও বাংলার মুসলিম লীগ নেতারা বাংলা ভাষাকে উর্দুর সমান মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রবণতা ছাড়াও উর্দুর তুলনায় বাংলা ভাষার প্রতি তাদের এই মনোভাবের পেছনে কিছু চাতুর্যপূর্ণ রাজনৈতিক হিসাব ছিল।

১৯০ বছরের বৃটিশ শাসনামলে (১৭৫৭-১৯৪৭) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ হিন্দুর (১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ২৩ দশমিক ২ শতাংশ) সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত যা উর্দুর ক্ষেত্রে ছিল না। তাদের বাংলার বিরোধিতা করার আরেকটি সম্ভাব্য কারণ ছিল এই যে প্রতিবেশী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভাষাও বাঙলা। পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপস্থিতি এবং সাধারণভাবে বাংলা ব্যবহারের ফলে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। মুসলিম লীগের প্রবীণ নেতারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন যাতে মুসলমাদের সদ্য অর্জিত স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তারা অনভিপ্রেত কিছু করতে না পারে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু প্রভাব অনুপ্রবেশের এই আশংকা মুসলিম লীগ মহলে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে শুরু হয়। এ সময় মুসলিম পূর্ববাংলা হিন্দুদের প্রাধান্য থেকে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।[৩৮] কিন্তু এই বঙ্গ বিভাগ ছিল ক্ষণস্থায়ী। কেননা ১৯১১ সালে মূলত হিন্দু নেতাদের পরিচালিত বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। তৃতীয়ত মুসলিম নেতৃবৃন্দ বাংলাকে অন্যতম জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন না। কেননা তারা আশংকা করেছিলেন যে, তা মুসলিম পূর্ববাংলা ও হিন্দু পশ্চিম বাংলার মধ্যে সম্পর্ক জোরদারের সহায়ক হবে এবং এতে পশ্চিম

৩৮. M.K.U. Molla. The New Province of Eastern Bengal and Assam. 1905-1911. (London University 1966).

www.pathagar.com

পাকিস্তানের জনগণের সাথে পূর্ব পাকিস্তানীদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হবে। সর্বশেষ কথা হচ্ছে, যদিও বাংলা ভাষা বাংলাদেশে শত শত বছরের মুসলিম শাসনামলেই (১২০৪-১৭৫৭) বর্তমান আকারে বিকশিত হয়েছে,[৩৯] তথাপি বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব ঘটেছে দেবনাগরী[৪০] থেকে। বাংলা ভাষার সংস্কৃতি বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যতম জাতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা গ্রহণ করা হলে তা শুধু জাতীয় ঐক্যকেই দুর্বল করবে না, বরং তা হবে ইসলাম বিরোধী। এ জন্য কেন্দ্রীয় নেতাদের মনোভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি বৈরী ছিল। মুসলিম জাতির সংহতি রক্ষার জন্য তাদের উদ্বেগের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতারা পাকিস্তানের একমাত্র ভাষা হিসেবে উর্দুকে গ্রহণের জন্য নিজেদের ভাষা ত্যাগ করতেও রাজী ছিলেন যাতে নিজেদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সাথে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। এ সংক্রান্ত ঘটনাবলী পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

পাকিস্তান অর্জনের অব্যবহিত পরে উৎসাহ-উদ্দীপনার বন্যার মধ্যে কেউ ধারণাও করতে পারেনি যে জাতীয় ভাষা হিসেবে উর্দু চাপিয়ে দেয়ার নীতিতে বাঙালীদের মধ্যে এত ব্যাপক হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার হবে। জাতীয় সমগোত্রীয়তা অর্জনের নীতি অনুসরণে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ হয়তো আন্তরিক ছিলেন কিন্তু জনগণের আকাঙ্খাকে গুরুত্ব না দিয়ে তারা ভুল করেছিলেন। তারা এ ধরনের নীতির বিরুদ্ধে এত তীব্র প্রতিক্রিয়ার কথা যেমন ধারণা করেন নি, তেমনি এই নীতি যে শেষ পর্যন্ত জাতীয় ঐক্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে তাও উপলব্ধি করতে পারেন নি। কেন্দ্র ও প্রদেশের সরকারী নেতৃবৃন্দ জাতীয় ভাষা প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের চেতনার গভীরতা পরিমাপ করতে চরমভাবে ব্যর্থ হন। তারা প্রচার মাধ্যমে সোজাসুজি প্রচার করার চেষ্টা করতেন যে, হিন্দু এবং শত্রুর চররা অসন্তোষ সৃষ্টি করে পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়। মুসলিম লীগ নেতাদের এই মনোভাব পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আরো দৃঢ়সংকল্প করে তুলেছিল যাতে তারা পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার যথার্থ মর্যাদা নিশ্চিত করতে পারে।

---

৩৯. Sir Jadunath Sarkar (Ed) History of Bengal. Vol-11 (Dhaka University 1950). During the course of the development of the Bengali language. it had absorbed no less than 300 persian and Arabic words.
Muhammad Hassain. East Pakistan : A Cultural Survey (Karachi : P.E.N Centre. 1955). P. 21.

৪০. "Deva Nagri" is the script of Sanskrit. the classical language of Hindu Scriptures".
R.D. Benarjee. The Origin of the Bengali Script. Calcutta. University of Calcutta. 1919.

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে জাতীয় নেতৃবৃন্দ অনমনীয় মনোভাব নিয়ে বাঙালীদের দাবী অগ্রাহ্য করতে থাকে এবং উর্দুকে একমাত্র সরকারী ভাষা হিসেবে গ্রহণের নীতি অব্যাহত রাখেন। উর্দু চাপিয়ে দেয়ার এই নীতির ব্যাখ্যা হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে বলা হয় এটা কেন্দ্রীয় সরকারের একটি উদ্যোগ। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে বলা হয় বাঙালীদের ওপর প্রাধান্য নিশ্চিত করার জন্য এটা করা হচ্ছে, যাদের সংস্কৃতি ও ভাষা শুধু যে অন্যদের থেকে পৃথক তাই নয়, বরং তা পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট অক্ষুণ্ন রাখার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক। এই নীতি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস করা এবং পৃথক জাতি হিসেবে বাঙালীদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য সরকারের চেষ্টা হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাকে ইসলামীকরণ এবং আরবী বা লাতিন বর্ণমালা চালু করার সরকারী উদ্যোগও সম্ভবত একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল। মূল্যবোধ নষ্ট করতে উৎসাহ দান এবং বুদ্ধিজীবীদের দুর্নীতিগ্রস্ত করার জন্য ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকন্সট্রাকশন, পাকিস্তান কাউন্সিল, ইকবাল একাডেমী, এবং রাইটার্স গিল্ডের মত সংগঠন তৈরী করা হয়। তাই সেক্সটন বলেন, ভাষা সংকটে সাংস্কৃতিক গৌরবের চাইতেও বেশী কিছু জড়িত ছিল।[৪১] সেক্সটনের ধারণাকে জায়ারিং পক্ষান্তরে সমর্থন করেছেন। তিনি লিখেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি থেকে একটা সিদ্ধান্তেই পৌছা যায় তা হচ্ছে, তারা বাঙালীদের অধীনস্থ রাখার প্রত্যাশা করেছিল।[৪২] ম্যারনের মতে, পূর্ব পাকিস্তানীদের কাছে এর অর্থ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু জনগণের নির্দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া।[৪৩] ভাষা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের জন্য গর্বিত বাঙালীরা তাদের ভাষার অধিকার রক্ষায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এভাবে ভাষা আন্দোলন রাজনৈতিক প্রভুত্ব, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ছাত্রদের ওপর পুলিশ গুলীবর্ষণ করলে এই সংগ্রাম চরম পর্যায়ে উপনীত হয়।

২১ ফেব্রুয়ারীর দুঃখজনক ঘটনা যখন ঘটে তার কিছু সময় আগে জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকার এক জনসভায় বলেন, উর্দু অবশ্যই দেশের

---

৪১. Roy Keith Sexton. Pakistan : The Divided States : A Study in National Unity (unpublished M.A. Thesis. University of California, Berkely, 1956). P. 61.

৪২. Lawrence Ziring. The Failure of Democracy in Pakistan : East-Pakistan and the Central Government. 1947-58. PP. 120-21.

৪৩. Standley Maron. The Problem of East Pakistan "Pacific Affairs". June 1955. P. 133.

www.pathagar.com

যোগাযোগের ভাষায় পরিণত হবে। যদিও জিন্নাহর মৃত্যুর পর ভাষা আন্দোলন ক্রমান্বয়ে স্তিমিত হয়ে যায় কিন্তু ভাষা প্রশ্নটি এতই স্পর্শকতার ছিল যে তা কারো দৃষ্টি এড়ায়নি। ৩ ফেব্রুয়ারী ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী সমাজ ক্রোধে ফেটে পড়ে। ৩১ জানুয়ারী গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি সমগ্র পূর্ববাংলায় হরতালের ডাক দেয় এবং বাংলাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণের দাবীতে ২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বিশাল বিক্ষোভ, কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করে। পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের অধিবেশন থাকায় ঐদিন বিক্ষোভ প্রদর্শনকে সুবিধাজনক হিসেবে চিন্তা করা হয়।

মুসলিম লীগ সরকার মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় এবং নেতিবাচক পন্থায় তার জবাব দেয়। প্রথমে সরকার দু'টি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকার অন্যতম এবং বাংলা ভাষার সমর্থক পাকিস্তান অবজারভারকে 'ক্রিপটো ফ্যাসিজম' নামক সম্পাদকীয় নিবন্ধে সরকারের সমালোচনা করায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। দ্বিতীয়ত, সরকার ২০ ফেব্রুয়ারী রাতে পরবর্তী এক মাসের জন্য ফৌজদারী আইনের ১৪৪ ধারা জারি করে ঢাকা পৌর এলাকায় মিছিল, বিক্ষোভ, সমাবেশ এবং প্রকাশ্যে ৪ জনের বেশী একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সরকারের এই কৌশলে ছাত্রদের মনোভাব শক্ত হয়ে যায় এবং তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী অনাগত দিনেও বাংলাদেশে 'মহান দিবস' হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেই ২১ ফেব্রুয়ারীর সকাল যে দেখেনি তার পক্ষে ঐদিনের সূচনা কিভাবে হয়েছিল তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সেদিন ঢাকা শহরকে জনহীন প্রান্তর মনে হয়েছিল। কোন গাড়ী চলাচল বা কর্মমুখী মানুষের আসা-যাওয়া ছিল না। সকাল ৮টার পর ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমায়েত হতে থাকে। যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ উপচেপড়া অবস্থা তখন ১০ জনের গ্রুপ করে ছাত্রদের ক্যাম্পাসের বাইরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বের হওয়া মাত্রই প্রত্যেক গ্রুপকে গ্রেফতার করে এবং এক পর্যায়ে আটক ছাত্রদের সংখ্যা বেড়ে তা পুলিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তখন পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। ছাত্ররা এলোপাতাড়ি দৌড়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দিকে যায়। সেখানেও পুলিশ একই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ছাত্রদের প্রতি গুলী ছুঁড়ে। পুলিশের গুলীতে কয়েকজনের প্রাণহানি হয়।

এভাবে ভাষা আন্দোলন শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে সংকটে রূপ নেয়। এই ঘটনায় গভীর আবেগ সৃষ্টি হয় এবং ছাত্র ও অন্যান্যদের হত্যার খবর দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র পূর্ববাংলা ক্রোধে ফেটে পড়ে। এতে বাংলাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবীর ভিত্তিতে বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হয়।

www.pathagar.com

এদিক থেকে ২১ ফেব্রুয়ারীকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তনের সূচনা বলা যায়। এমনকি জাতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা গৃহীত হওয়ার পরও একুশের ঘটনার স্মৃতি অসন্তোষের কারণ হিসেবে কাজ করে যা শেষ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনকে সাংস্কৃতিক বিপ্লবে পরিণত করে বাঙালী জাতীয়তাবাদের সূচনা করে।

২১ ফেব্রুয়ারীর ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।[৪৪] তখন থেকে এই দিনটি পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবছর পালিত হয়ে আসছে এবং বাংলাদেশে শোক, ত্যাগ ও দৃঢ় সংকল্পের দিন হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারী পালিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারী 'শহীদ দিবস' হিসেবে পালিত হওয়ায় তা বাঙালীদেরকে প্রতিদিন নতুন করে তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যারা 'তাদের আজ'কে 'আমাদের আগামীকাল'-এর জন্য বিসর্জন দিয়েছেন।[৪৫] প্রতিবছর হাজার হাজার লোক খালি পায়ে শহীদ মিনার থেকে তাদের কবরে গিয়ে মোনাজাত করে, নিয়মিত স্মরণসভা ও সিম্পোজয়াম করে, পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং শত শত স্মরণিকা প্রকাশিত হয়।

গুলীবর্ষণের ২৪ ঘন্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন বাংলাকে অন্যতম জাতীয় ভাষা করার সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রস্তাব প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপন করেন।[৪৬] প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তবে সময় অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৮ সালে যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হত তাহলে দুঃখজনক ঘটনা এড়ানো যেত। প্রদেশে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এবং কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার পক্ষে সর্বসম্মত অবস্থান নিলে মুসলিম লীগ শাসকরা পূর্ব পাকিস্তানীদের ওপর উর্দু চাপিয়ে দিতে চাইত না এবং বাংলা ভাষার জন্য গণ আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থায় একটি আপোস রফা হয়ে যেতো।

---

৪৪. ভাষা শহীদদের স্মরণে ছাত্ররা রাতারাতি কোদাল, ইট ও বালি দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণের যেখানে গুলী হয়, সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে যা 'শহীদ মিনার' হিসেবে পরিচিত। ২৩ ফেব্রুয়ারী শহীদদের মধ্যে একজনের মা ও বাবা এই শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র এ ধরনের শহীদ স্মৃতি ফলক নির্মিত হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী সৈন্যরা সব স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙ্গে ফেলে। স্বাধীনতার পর সব শহীদ মিনার পুনঃনির্মিত হয় এবং বাংলাদেশের প্রত্যেক এলাকার ছাত্র-জনতা যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি পালন করে।

৪৫. A. Abdullah "The Twenty-first February". The Dhaka Times. February 21. 1966.

৪৬. The motion reads as follows:
"This Assembly recommends to the Constituent Assembly of Pakistan that Bengali be one of the State Languages of Pakistan" East Bengal Legislative Assembly. Official Report. Vol. VII. (February 22. 1952). P. 89.

www.pathagar.com

ফেব্রুয়ারীর শোকাবহ ঘটনার পর আন্দোলন তীব্র গতি লাভ করে এবং তা প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সকল রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক সংগঠন[৪৭] এবং প্রায় সব পত্রিকা আন্দোলনের প্রতি জোরালো সমর্থন প্রকাশ করে। একমাত্র মর্নিং নিউজ পত্রিকা ভাষা প্রশ্নে সরকারকে সমর্থন করেছিল। এই পত্রিকার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করা হয় যে, বাংলা কখনো রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হতে পারে না কারণ বাংলা ভাষা হিন্দু সংস্কৃতি প্রভাবিত হওয়ায় তা মুসলমানদের সাংস্কৃতিক আকাঙ্খার বাহন হতে পারে না। এই মনোভাবের জন্য এই পত্রিকা একাধিকবার ছাত্র হামলার মুখোমুখি হয়েছে। এই পর্যায়ে ভাষা বিরোধের সাথে অন্যান্য সাংবিধানিক প্রশ্ন যেমন কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্রীয় উচ্চতর চাকুরিতে বাঙালীদের অপর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অসম উন্নয়নের মত বিষয় যুক্ত হয়। এ ঘটনার মাধ্যমেই বাঙালীরা প্রথম বারের মত ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগ পায়। ভাষা বিরোধে বাঙালীদের অবস্থান বর্ণনা প্রসঙ্গে জায়ারিং বলেন, ভাষা আন্দোলন জনগণ হিসেবে বাঙালীদের প্রভাবিত করেছে, রাজনৈতিক বিষয়ে সুপ্ত সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।[৪৮]

---

৪৭. পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংগঠন যেমন প্রাদেশিক মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান আইনসভা, পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস, পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী এবং সহযোগী সংস্থা যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাহী পরিষদ, ঢাকা হাইকোর্ট আইনজীবী সমিতি, পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্র বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী সমর্থন করে। আজাদ, ২২ ফেব্রুয়ারী ও ৩ এপ্রিল, ১৯৫২।

৪৮. Lawrence Ziring প্রাগুক্ত, ১২৯।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৯৫২ পরবর্তী সময়

এই পর্যায়ের ইতিহাস ষড়যন্ত্র, দলীয় বিভাজন ও স্বার্থান্বেষী ঘটনায় ক্ষত-বিক্ষত। আরো দু'বছর ভাষা-বিতর্ক অমীমাংসিত থেকে যায়। এ সময়ে আন্তঃআঞ্চলিক উত্তেজনায় মারাত্মক তিক্ততার সৃষ্টি হয়। ২১ ফেব্রুয়ারীর মর্মন্তুদ ঘটনার দু'মাস পর পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সদস্য নূর আহমদ বাংলা ও উর্দু দু'টি ভাষাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে আইন পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে।[১] তখন আইনমন্ত্রী পীরজাদা আবদুস সাত্তার এই বলে ইস্যুটি স্থগিত রাখতে একটি আইন উত্থাপন করেন যে, এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন নেই।[২] এ নিয়ে বিতর্কে পূর্ব পাকিস্তানের ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ও রাজ কুমার চক্রবর্তী কেবল নূর আহমদের প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠার দাবীর প্রতি সমর্থন দানের অঙ্গীকার করেও পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের সকল সদস্য নূর আহমদের প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিতে ব্যর্থ হন। পূর্ব পাকিস্তানের আর কেউ মুখ খোলেননি। দত্ত ইচ্ছাকৃতভাবে নিশ্চুপ থাকা এবং বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করার জন্য সরাসরি পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী দলের সদস্যদের দায়ী করেন। তিনি জাতীয় পরিষদে উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেন ঃ

> "পাকিস্তানের স্বার্থেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ওঠেছে। পাকিস্তানের স্বার্থে, পাকিস্তানের অখন্ডতার স্বার্থে পূর্ব ও পশ্চিম অংশকে সংযুক্ত করতে হবে এবং আমার পশ্চিম পাকিস্তানের বন্ধুরা যদি বাংলা ও আমরা উর্দু শিখি তাহলেই এই সংযুক্তি সম্ভব হবে।"[৩]

এ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখা মানে বিষয়টি চিরদিনের জন্য স্থগিত হয়ে যাওয়া। তাই অধ্যাপক চক্রবর্তী আহ্বান জানিয়ে বলেন,

> "হাউজ যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে তা পাকিস্তানী জনগণের সর্বস্তরে বিশেষ

---

১. Ziring, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৯।
২. CAP Debates, প্রাগুক্ত, ১১ খন্ড (১০ই এপ্রিল ১৯৫২), পৃঃ ২২।
৩. CAP Debates, প্রাগুক্ত, ১১ খন্ড (১০ এপ্রিল ১৯৫২), পৃঃ ৩৮।

www.pathagar.com

> করে সংশ্লিষ্ট দুই অংশে অধিকতর সমঝোতা সৃষ্টি করবে। স্যার, এ বিষয়ে বিলম্ব না ঘটিয়ে এখন সিদ্ধান্তে আসার সময় এসেছে।"[৪]

প্রস্তাবটি পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন সদস্যও সমর্থন করেন– যেমন সরদার শওকত হায়াত খান (পাঞ্জাব), সরদার আসাদুল্লা জান খান (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) ও শেখ সুখ দেব (সিন্ধু)। শওকত হায়াত খান বাংলাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেন,

> "আমরা পাকিস্তানীরা যদি পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের ইচ্ছার বিরোধিতা করি তাহলে পূর্ব পাকিস্তানে গোলযোগ সৃষ্টির দায়ভার আমাদের নিতে হবে, যা আমার দেশ ও জাতির ঐক্য বিনষ্ট করতে পারে।"[৫]

নূর আহমদ উত্থাপিত প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়।

প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে আইন পরিষদে মৌলিক কমিটির (বিপিসি)[৬] চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নের কোন উল্লেখ ছিল না।[৭] এতে কেবল পূর্ব পাকিস্তানীদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কথা তুলে ধরা হয়, যারা সব সময় কেবল বাংলা ভাষার পক্ষে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের জন্য বিক্ষোভ করছিল। এভাবে জনগণের সদিচ্ছার প্রতি আবার তাচ্ছিল্য করা হয়। দীর্ঘসূত্রিতা নীতির ফলে দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসব ঘটনা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানী রাজনীতির গতিধারাকে ভিন্ন একটি রূপ দেয়।

১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচন জনগণকে ভাষা সহ মৌলিক জাতীয় ইস্যুগুলো সম্পর্কে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করার সুযোগ এনে দেয়। ব্যালটের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র পরীক্ষা করার সর্বশেষ চমৎকার সুযোগ আসে জনগণের সামনে। 'দুষ্ট খেদানো'র লক্ষ্যে ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহারের ভিত্তিতে সকল বিরোধী শক্তি মিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে।[৮] ইশতেহারে যুক্তফ্রন্টের প্রতিশ্রুতির মধ্যে ছিল ঃ

---

৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।

৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।

৬. পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধানের কাঠামো সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য ১৯৪৯ সালের মার্চে আইন পরিষদ বিপিসি গঠন করে।

৭. ১৯৫০ সালে লিয়াকত আলী খান বিপিসি'র যে অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন তাতে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করা হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত রিপোর্টটি স্থগিত রাখা হয়।

৮. R. L. Park and R.S. Wheeler, "East Bengal under Governor's Rule." Far Eastern Survey (September, 1954), P. 129.

www.pathagar.com

(ক) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা;

(খ) ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষার জন্য জীবনদানকারী শহীদদের স্মরণে একটি স্মৃতি সৌধ প্রতিষ্ঠা;

(গ) ২১ ফেব্রুয়ারীকে 'শহীদ দিবস' ও সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা;

(ঘ) পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা এবং কেন্দ্রের হাতে কেবল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে বাকি সবকিছু পূর্ব পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে আনা। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে[৯] স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুসারে[১০] সেনাবাহিনীর সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে এবং সমরাস্ত্র কারখানা পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপনের ব্যবস্থা করা।

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয় লাভ করে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তিনশ' নয়টি আসনের মধ্যে লীগ মাত্র নয়টি আসন লাভ করে।

সারাদেশে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। এই আনন্দ উৎসবের মাঝে এ, কে, ফজলুল হক ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ৩০ মে তিনি চিকিৎসার জন্য কলকাতা গমন করেন। এই সুযোগে তিনি পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসক-মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়ের সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি সেখানে দুই বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক সফর সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। বিভিন্ন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি দুই বাংলার সাংস্কৃতিক অভিন্নতা এবং দু'য়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে খোলামেলা মত বিনিময় করেন। ৩ মে তাকে প্রদত্ত এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বলেন,

> "আমি দেশের রাজনৈতিক বিভাজনে বিশ্বাসী নই। সত্য কথা এই যে আমি হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান এই দুই বিতর্কিত শব্দের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারিনি। যারা আমার সোনার দেশকে দু'টুকরো করেছে তারা দেশের শত্রু।

---

৯. অধ্যাপক আবুল কাসেম, একুশ দফার রূপায়ন, ঢাকা, ১৯৫৪।

১০. ১৯৪০ সালে গৃহীত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় "ভৌগোলিকভাবে সন্নিহিত ইউনিটগুলো নিয়ে অঞ্চল চিহ্নিত ও গঠন করা হবে। আঞ্চলিক এই পুনর্গঠন একারণে প্রয়োজন হবে যে, যে সব এলাকায় যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু -সে সব এলাকা একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রে একত্রিত করতে হবে। সেখানে গঠিত ইউনিটগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।
লিয়াকত আলী খান, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রস্তাব (১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৪০ সালের মার্চ পর্যন্ত, দিল্লী, এন ডি), পৃঃ ৪৭-৪৯।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের কোন অর্থ হয় না বলে আমি মনে করি- এই শব্দটি শুধু বিভ্রান্তি ও আত্মম্ভরিতার জন্ম দেয়।"[১১]

রাজনৈতিক চাপের মুখে হক সাহেব পরে এ ধরনের বিবৃতি দানের কথা অস্বীকার করেন। কিন্তু পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। ফলে ফজলুল হক যখন করাচীর শোষণ ও আধিপত্য থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির জন্য পুরোপুরি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী তোলেন তখন নেতৃবৃন্দ আরো সতর্ক হয়ে যান। করাচীর 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার প্রতিনিধি সে সময় এক নিবন্ধে লিখেন, "পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হতে চায়।"[১২] হক সাহেব এই নিবন্ধকে সত্য নয় বলে উল্লেখ করে পুনরায় নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেন,

"পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের একটি স্বায়ত্তশাসিত ইউনিট হিসেবে থাকবে। এটা আমাদের আদর্শ এবং এ জন্য আমরা লড়াই করবো।"

পাকিস্তান সরকার একে বিদ্রোহ হিসেবে বিবেচনা করে হক মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয় এবং লেঃ জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে গভর্ণর নিযুক্ত করে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় শাসন জারি করে।

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়ায় প্রতিক্রিয়াশীল মহল খুশী হয়। তাদের মুখপত্র মর্নিং নিউজ-এর বিশেষ সম্পাদকীয়তে বলা হয়,[১৩]

"পূর্ব পাকিস্তান জেগে ওঠেছে? দীর্ঘ রাত্রির অবসান ঘটেছে। পূর্ব পাকিস্তান নামের ওপর থেকে বিপদ কেটে গেছে.... আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে দোয়া করার দিন, কেননা, আজ পূর্ব পাকিস্তানের লাখ লাখ নবীর উম্মতের জন্য এটা এক বিশেষ রহমত।"

এ সময় সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের বিস্তার ঠেকানোর জন্য পাকিস্তান পুঁজিবাদী বিশ্ব বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কয়েকটি সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। সাধারণ নির্বাচনে জয় লাভের পর পূর্ব পাকিস্তানের সকল নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সদস্য এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে এসব সামরিক চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানায়। পশ্চিম পাকিস্তান ছিল তখন মার্কিন সাহায্যের জন্য ব্যাকুল ফলে কঠোর কমিউনিস্ট বিরোধী নীতি অনুসরণ করতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব

---

১১. অমিতাভ গুপ্ত, বাংলাদেশ, নতুন সংস্করণ, কলকাতাঃআনন্দধারা প্রকাশন, ১৩৭৮ বাংলা, পৃঃ ৫৪। খন্দকার আবদুল খালেক, এক শতাব্দী (শেরে বাংলার জীবনী) ৩ সংস্করণ, ঢাকা, প্রকাশ ভবন, ১৯৭৩, পৃঃ ২২৫ ।
মাসিক মোহাম্মদী, জ্যেষ্ঠ ১৩৬১ বাংলা পৃঃ ৬১৫।

১২. The New York Times, 23rd may. 1954.

১৩. The Morning News, 31 may, 1954.

www.pathagar.com

পাকিস্তানের কমিউনিস্ট ঘেঁষা কথাবার্তা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবী সহ্য করতে পারেনি। তাই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া ছিল তাদের জন্য নিরাপদ বিকল্প।

পঁচিশের চেয়ে কম বয়সী তরুণদের মধ্যে ছিল একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা। তারা ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিশেষ করে প্রবীণ জনগোষ্ঠী যারা দেশ ভাগের সময়কার ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন, তারা তখনো পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ফেডারেশনের পক্ষে ছিলেন। বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সামাজিক উগ্রতা তখনো পূর্ব বাংলার শ্রমিক ও কৃষকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বুদ্ধিজীবীরা জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক কর্মসুযোগ সৃষ্টিতে আগ্রহী ছিলেন। এসব লক্ষ্য অর্জনে তারা চেয়েছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে ক্ষমতা সমানভাবে ভাগ করে নিতে। তারা ভাবতেন অর্থ ব্যবস্থা, ঋণ ও আমদানি-রফতানি শুল্কের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কোন আধুনিক সমাজ তার ভাগ্যের ওপর সত্যিকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। অথচ পাকিস্তানে তা ছিল সংখ্যাগুরু পশ্চিম পাকিস্তানী প্রভাবিত কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে। পূর্ব পাকিস্তানের বেশীরভাগ নেতা মনে করতেন, পূর্ব পাকিস্তানকে লক্ষ্যে পৌছতে হলে সংবিধানকে 'কনফেডারেল' করতে হবে।

নির্বাচনের পর ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে আইন পরিষদ আহবান করা হয়। এসময় পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সদস্যরা পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করেন। ভাষা ইস্যুতে তাদের ভিন্নমত পোষণ আর সম্ভব হয়নি। দুই পর্যায়ে এটা অর্জিত হয়। প্রথমতঃ মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের এক সভায় উর্দু ও বাংলা উভয়কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং ইংরেজী আরো ২০ বছর সরকারী ভাষা হিসেবে রাখার কথা বলা হয়।[১৪] এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৫৪ সালের ৯ মে আইন পরিষদ ভাষা প্রশ্নে নিম্নোক্ত ফর্মুলা গ্রহণ করে যা পরে বিপিসি রিপোর্টের সাথে যুক্ত করা হয়,

> "পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের সরকারী ভাষা হবে উর্দু ও বাংলা এবং অন্যান্য ভাষা যা প্রাদেশিক আইনসভার সুপারিশক্রমে রাষ্ট্র প্রধান ঘোষণা করেন। সাংসদগণ ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলা বা উর্দুতে কথা বলার অধিকার ভোগ করবেন।"[১৫]

এটা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে আইন পরিষদ গৃহীত ভাষা ফর্মুলা শুধু বাঙলী আঞ্চলিকতাবাদীদের সন্তুষ্ট করার জন্য নয় বরং সিন্ধী ও পাঠানদের শান্ত করার জন্যও প্রণীত হয়।[১৬] উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রভাবশালী মুসলিম লীগ নেতা খান

---

১৪. The Morning News, 21 April, 1954.

১৫. CAP Debates, op cit, Vol. XVI (May 7, 1954), P.72

১৬. পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন পাঠান ও সিন্ধী জাতীয়তাবাদীদেরও চাঙ্গা করে তোলে। বাঙালীদের দেখে পাঠান-সিন্ধীরাও নিজ নিজ ভাষাকে জাতীয় ভাষা করার দাবী তোলে। তারা সিভিল সার্ভিসে পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বের দাবী তুলে মনযোগ আকৃষ্ট করতে শুরু করে। তারা নিজেদের পশ্চাদপদ এলাকাগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও দাবী জানায়।

www.pathagar.com

আব্দুল কাইয়ুম খান কার্যতঃ এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন যে এই প্রস্তাব, "পাকিস্তানের ৮০ লাখ পশ্তুভাষী মানুষের স্বপ্ন পূরণ করেছে।"[১৭]

আইন পরিষদ চূড়ান্তভাবে সংবিধানের খসড়া বিল অনুমোদন করে। ১৯৫৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর এবং ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবি থাকে। পরবর্তী ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী থেকে নতুন সংবিধান কার্যকর এবং পাকিস্তানকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন।[১৮] ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর এক জরুরী প্রজ্ঞাপন দ্বারা গভর্ণর জেনারেল আইন পরিষদ ভেঙ্গে দেন।[১৯] ১৯৫৫ সালের জুন মাসে নতুন আইন পরিষদ গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে নব নির্বাচিত ৪০ জন সদস্যের মধ্যে ৩৯

---

১৭. CAP Debates, op cit, Vol. XVI (May 7, 1954) P. 91.

১৮. Report of the BPC (as adopted by the CAP on the 21 September, 1954) op cit, (Karachi, Government of Pakistan 1954)

১৯. তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সংবিধান বিলের চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদনের জন্যে আইন পরিষদ পুন আহবানের মাত্র বাহাত্তর ঘন্টা আগে আইন পরিষদ বাতিল ঘোষণা করা হয়। ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের চব্বিশ বছরে যে ক্ষমতাধর গোষ্ঠী দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃশ্যপটে প্রাধান্য বিস্তার করে তা সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র, শিল্পপতি ও আধাসামন্ত ভূ-স্বামীদের নিয়ে গঠিত ছিল। আবার তাদের অধিকাংশই এসেছিল প্রায় একই সামাজিক অবস্থান থেকে। তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চরিত্র ও আচরণই তাদেরকে গণতন্ত্র বিরোধী করে গড়ে তোলে। সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা - যেখানে বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়, যেখানে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সে ধরনের ব্যবস্থায় তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অনেকাংশে খর্ব হতে পারে, অনেকটা সেই কারণে ক্ষমতাধর গোষ্ঠী অগণতান্ত্রিক পন্থায় সমৃদ্ধশালী হওয়ার সুযোগের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার যে কোন প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা চালাতো। অনেকের মতে (১) ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে খাজা নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত করা, অথচ তিনি মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের নিরঙ্কুশ আস্থাভাজন ছিলেন; (২) ১৯৫৪ সালে আইন পরিষদ বাতিল করা, অথচ পরিষদ তখন খসড়া সংবিধান অনুমোদনের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল, এবং পরে (৩) ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করা; অথচ তখন ১৯৫৬ সালের আইন আওতায় দেশ সাধারণ নির্বাচনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত ছিল; এবং সব শেষে (৫) ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনতার ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্মম হামলা; অথচ এসময় একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্য পাকিস্তানের ২৪ বছরের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদকে কাজ করতে দেয়া হয়নি। এই সবকিছুর মূলে ছিল সেই শক্তিধর গোষ্ঠী যারা অবাধ নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 'জনগণের দায়িত্বহীন' আচরণের ফলে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ুক সেজন্য প্রস্তুত ছিল না। আগে না হলেও ১৯৫৩ সাল থেকে সেনাবাহিনী যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জড়িত ছিল জেনারেল আইয়ুব খান তা স্পষ্টভাবে স্বীকার করে বলেন তিনিই ১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এক ইউনিট প্রথা এবং শক্তিশালী কেন্দ্রের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন।

www.pathagar.com

জনই একুশ দফা কর্মসূচীকে সমর্থন করার অঙ্গীকার করেন। অন্যান্য আইন ইস্যুর সাথে ভাষার প্রশ্নটি তুলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে চাপ প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয় নতুন আইন পরিষদে। মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ আইন পরিষদে বাংলায় প্রথম বক্তব্য রাখেন। পরে স্পীকার রুলিং প্রদান করেন যে, উর্দু, বাংলা ও ইংরেজী পাকিস্তানের সরকারী ভাষা। এর যে কোনটির মাধ্যমে পরিষদে বক্তব্য গ্রহণযোগ্য।

১৯৫৬ সালের মার্চে সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৫৪ সালের প্রথম আইন পরিষদে (১৯৪৭-৫৪) গৃহীত ভাষা ফর্মুলা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটা ছিল বাংলা ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয়। সংবিধানের ২১৪ ধারায় বর্ণিত ফর্মুলায় বলা হয়েছে ,[২০]

২১৪ (১) পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও বাংলা, শর্ত থাকে যে, সংবিধান গ্রহণের দিন থেকে পরবর্তী ২০ বছর সকল সরকারী কর্মকান্ডে ইংরেজী ব্যবহার অব্যাহত থাকবে (যেমনভাবে তা সংবিধান দিবসের ঠিক পূর্বে পাকিস্তানে ব্যবহৃত হতো) এবং পার্লামেন্ট উল্লেখিত ২০ বছর সময়ের পর আইনের মাধ্যমে উল্লেখিত ক্ষেত্রে ইংরেজী ব্যবহার করতে পাররে।

(২) সংবিধান কার্যকর হওয়ার দিন থেকে ১০ বছর অতিবাহিত হবার পর প্রেসিডেন্ট ইংরেজীর বিকল্প সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করবেন।

(৩) উল্লেখিত ২০ বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার আগে কোন প্রাদেশিক সরকার যদি সে প্রদেশে ইংরেজীর পরিবর্তে যে কোন একটি রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করতে চায়, তাহলে এই ধারা তাতে বাধা হবে না।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর, ১৯৫৬ সালের সংবিধান স্থগিত করে সামরিক আইন জারি করা হয়।

ইতোমধ্যে লক্ষ্য করেছি যে কথিত কমিউনিস্টপন্থী প্রবণতা ও স্বায়ত্তশাসনের প্রতি ঝোঁকের কারণে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দেয়া হয়। এটা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি প্রথম বড় ধরনের আঘাত। সে সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অস্থির। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়; কিন্তু এটা ছিল তার এবং তার দল উভয়ের জন্য নাজুক অবস্থা। পূর্ব পাকিস্তানে

Safar A. Akanda, East Pakistan and Politics of Regionalism, University of Denver, 1970, PP. 236-282

Md. Ayub Khan, Friends not Masters : A Political Autobiography (New York : Oxford University Press, 1967).

২০. The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1956 (Karachi : Government of Pakistan, Ministry of Law, 1965) P.82.

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ ছিল সবচেয়ে সুসংগঠিত ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল একথা সত্য কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের জনসমর্থন ছিল না। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর জন্য উভয় অংশের সমর্থন দরকার ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে জনসমর্থন না থাকায় আওয়ামী লীগকে সেখানকার রিপাবলিকান পার্টির সাথে কোয়ালিশন করতে হয়। ৮০ আসন বিশিষ্ট পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগের সদস্য ছিল মাত্র ১৩ জন। রিপাবলিকান পার্টির ছিল ২৭ জন। কোয়ালিশন গঠন করেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় অন্যান্য দলকেও কোয়ালিশনে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। বেশীর ভাগ পূর্ব পাকিস্তানী তখন মনে করলেন যে সোহরাওয়ার্দীকে এ ধরনের কোয়ালিশনে যাওয়া ঠিক হবে না। কোয়ালিশনের ক্ষুদ্র শরীক দল আওয়ামী লীগ ছাড়া কোয়ালিশনে রিপাবলিকান পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানের সুবিধাভোগী ও ভূ-স্বামীদের প্রতিনিধিত্ব করতো। অন্য দিকে পূর্ব পাকিস্তানে সোহরাওয়ার্দীর দলের সামাজিক ভিত্তি ছিল অনেকাংশে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। সরকার গঠনের আগে পার্লামেন্টে সোহরাওয়ার্দীর অনুসারীরা বেশীর ভাগ সময় তাদের বক্তব্যে বাংলার সমস্যা তুলে ধরতেন। তারা প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থা ছাড়া বাকি সব ক্ষমতা প্রদেশের হাতে ছেড়ে দেবার দাবী জানাতেন এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার বিরোধিতা করতেন। মাঝে মধ্যে তাদের বক্তব্য শুনে তাদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে মনে হতো। এটা ছিল স্বাভাবিক কারণ। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সালের জন্মলগ্ন থেকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানিয়ে আসছিল। কোয়ালিশনের অপর দু'শরীক দলের নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ অবস্থায় দু'গ্রুপের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ছিল অসম্ভব। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে ব্যর্থ হন। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারী পার্টি প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন দেয়। কারণ প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সরকার মনে করেছিল কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থন ও সহানুভূতি পেলে তারা অধিকতর আস্থার সাথে কাজ করতে পারবে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর এতদিন পর্যন্ত মুসলিম লীগ সরকারের অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন, সামাজিক বঞ্চনা ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের কারণে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তারা পাকিস্তানে সেই বৈষম্যের ধারা অবসানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

রেডিওতে জাতির উদ্দেশ্যে প্রথম ভাষণে সোহরাওয়ার্দী একটি নতুন স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করবেন বলে ঘোষণা দেন। তিনি প্রথম বিদেশ সফরে চীন যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু প্রবীণ, যারা কমিউনিজমকে ছোঁয়াচে রোগ এবং মানবতার জন্য বিপজ্জনক বলে ভাবতেন, এই ঘোষণা তাদেরকে আহত করে। অন্য দিকে আমলারা সমস্যার সৃষ্টি করেন এবং মার্কিন সাহায্যের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ভূ-স্বামী, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা এতে প্রমাদ গুণলেন। সোহরাওয়ার্দী তাদের কথা শুনলেন না। সরকার গঠনের ৩ মাসের মধ্যে তিনি পিকিং গেলেন।

www.pathagar.com

এশিয়ায় ইরাক, তুরস্ক, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইন ছাড়া পাকিস্তানের আর কোন বন্ধু ছিল না। কারণ এ সবগুলো দেশ ছিল ইঙ্গ-মার্কিন সমর ব্লকের আওতাভুক্ত। অপরদিকে প্রতিবেশী ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও আফগানিস্তান ছিল শত্রুভাবাপন্ন। বার্মার সাথে সৌহার্দ গড়ে ওঠেনি আর শ্রীলংকা ছিল পাকিস্তানের ব্যাপারে নির্লিপ্ত। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে পকিস্তান স্ব-বিরোধিতায় ভুগছিল। জিন্নাহর স্ব-আরোপিত একাকী জীবনের মত পাকিস্তানকেও তার বৃহৎ প্রতিবেশীদের পাশে একাকী অবস্থায় ভীতির মধ্যে কাটাতে হয়। দেশটি এই ভৌগোলিক বাস্তবতায় তাকে সাহায্য করতে আগ্রহী বন্ধু সবসময় খোঁজ করেছে। এটা করতে গিয়ে সে যে এশিয়ায় তাও ভুলে গেছে। সোহরাওয়ার্দীর সফরের পর চীনা নেতা সফরে আসেন। পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ জনসভায় ভাষণ দানের সুযোগ দেয়া হয় চীনা নেতাকে। পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থীরা সোহরাওয়ার্দীর প্রতি চীন সরকারের বন্ধুসুলভ মনোভাব মেনে নিতে পারেনি। কারণ তারা সোহরাওয়ার্দীকে সবসময় কমিউনিস্টদের শত্রু হিসেবে জানত। এ সময় কোন কারণ ছাড়াই রাজনৈতিক কর্মীরা বিভ্রান্তিতে পড়ে। অথচ ১৯২১ সালে লেনিন জাতীয়তাবাদী অকমিউনিস্টদের সমর্থন দিয়েছিলেন। লেনিনের মতে, "আধা-উপনিবেশিক দেশগুলোতে এটা জরুরী। বুর্জোয়া বিপ্লবের পক্ষে কাজ করলেও জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে সমর্থন দেয়া দরকার। এটা সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি নড়বড়ে করে দেবে।" লেনিন তুরস্কে কামালের আন্দোলনকে সমর্থন করেন। যদিও সেখানে কমিউনিস্টদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল। কমিউনিস্টরা মনে করতো ধাপে ধাপে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে জাতীয় গণতন্ত্র দরকার। সোহরাওয়ার্দী চৌ এন লাই-এর মহান বন্ধুতে পরিণত হন। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে দু'দেশ পরস্পরের প্রতি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। সোহরাওয়ার্দীর লক্ষ্য ছিল কাশ্মীর ইস্যুতে এশিয়া ও রাশিয়ার সমর্থন লাভ। অন্যদিকে চৌ এন লাই ভারতকে বিছিন্ন করে এশিয়ার নেতৃত্ব দখল করতে চাচ্ছিলেন।

সাংস্কৃতিক সম্মেলন, কাগমারী

পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও মাওলানা ভাসানীর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ভাসানী মনে করতেন সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ না করে দেশকে পুঁজিবাদী ব্লকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য তিনি কাগমারীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল আহবান করেন। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই কাউন্সিল ডাকা হয়। একই সময়ে নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা চলছিলো।[২১] প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক ছিলেন এ, জেড শামসুদ্দীন।

---

২১. Kamruddin Ahmed. The Social History of East Pakistan (Dhaka, 1967) pp. 127-151.

www.pathagar.com

কাউন্সিলকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মিসর ও ভারত প্রতিনিধি পাঠায়। অন্যান্য দেশ সম্মেলনের সাফল্য কামনা ও যোগদান করতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করে বার্তা প্রেরণ করে। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন প্রফেসর হুমায়ুন কবির। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় একশ' সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকেও সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। কাগমারী যাবার জন্য ঢাকা থেকে কম ভাড়ায় বিশেষ বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হয়। অতিথিদেরকে সাথে শুধু বিছানা ও মশারী নিয়ে যেতে বলা হয়। আয়োজকরা তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলে জানানো হয়। মির্জাপুর থেকে কাগমারী পর্যন্ত রাস্তায় অর্ধশত মনোরম তোরণ স্থাপন করা হয়।[২২] দেশ-বিদেশের স্মরণীয় ব্যক্তি যেমন- জিন্নাহ, ইস্কান্দর মির্জা, জামালুদ্দীন আফগানী, জগলুল পাশা, সিরাজুদ্দৌলা, তিতুমীর, মাওলানা হালি, মোহাম্মদ আলী, আল্লামা ইকবাল, সৈয়দ আহমদ খান, জর্জ ওয়াশিংটন, লেনিন, সান ইয়াৎ সেন, গান্ধী, জর্জ বার্নার্ড শ, শেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ বসুর নামে তোরণগুলোর নামকরণ করা হয়। মাওলানা ভাসানী বলেন, "কাগমারীর পথ হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব ও মুক্তির পথ।"

কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে ৮ ফেব্রুয়ারী সম্মেলন শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক সম্মেলন উদ্বোধনের কথা থাকলেও তার অনুপস্থিতিতে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান সম্মেলন উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া দেশের গৌরবময় সংস্কৃতিতে রেঁনেসা সম্ভব হবে না। স্বাগত ভাষণ দেন মাওলানা ভাসানী। তিনি বলেন, সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সৌহার্দ গড়ে তোলা এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা। তিনি আরো বলেন যে দেশকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে কৃষি শিল্পের মত ক্ষেত্রগুলোর উন্নয়ন অতীব জরুরী।[২৩]

সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়ার লালন ফকিরের 'লালন গীতি', ঢাকার মুলুক চাঁদের 'সৎ মা' যাত্রা পরিবেশন এবং ভারতীয় তথ্য ব্যুরোর কাজী নজরুল ইসলামের উপর ছবি প্রদর্শিত হয়। তীব্র প্রতিবাদের মুখে মার্কিন তথ্য সার্ভিসের 'হাঙ্গেরী ফাইটস ফর ফ্রিডম' ছবিটির প্রদর্শন বাতিল করা হয়। ৯ ফেব্রুয়ারী সকালের অধিবেশনে সাহিত্য আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, এনামুল হক, পেশোয়ারের মাওলানা আবদুল কাদের এবং যুক্তরাষ্ট্রের ডেভিড পার্থ যথাক্রমে, 'পাকিস্তানের ভাষা', 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব' 'যুদ্ধোত্তর

২২. দৈনিক ইত্তেহাদ, ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।
২৩. দৈনিক সংবাদ, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।

www.pathagar.com

সাহিত্যের গতিধারা', এবং 'যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক জীবন' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের অভিন্ন দিকগুলো তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এটা ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে বৈজ্ঞানিক গণযোগাযোগের যুগেও মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।[২৪]

১০ তারিখের সাহিত্য আলোচনায় ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যরা প্রাধান্য বিস্তার করে। তারাশংকর বন্দোপধ্যায় বাংলা ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং মাওলানা ভাসানীর আন্তরিক সম্মান ভক্তি প্রদর্শন করেন।[২৫] এ ধরনের একটি সম্মেলনের আয়োজন এবং সম্মেলনের কর্মসূচী ও বক্তব্য পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

বিকেলে দু'শতাধিক লাঠিয়াল লাঠি, তরবারী ও রামদা খেলা প্রদর্শন করে। রাতে উন্মুক্ত মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সন্তোষের রাজবাড়ীতে দু'টি মঞ্চ তৈরী হয়। প্রথম মঞ্চে রমেশ শীলের 'ছড়া গান' এবং তশর আলী ও তার দলের 'জারী গান' চলে। দ্বিতীয়মঞ্চে চলে 'যাত্রা গান' ও 'কাঞ্চন পালা'। এছাড়াও ভারতীয় দল 'পথের পাঁচালী' ও মার্কিন তথ্য সার্ভিস 'কাউ বয়' চলচ্চিত্র এবং পূর্ব বাংলা তথ্য অধিদফতর কৃষি প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

মুসলিম লীগের মুখপত্র 'ডন', 'মনিং নিউজ' ও 'আজাদ' পত্রিকা, আওয়ামী লীগের সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের মুখপত্র 'দৈনিক ইত্তেফাক' এবং পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের পত্রিকা 'সাপ্তাহিক সৈনিক' সম্মিলিতভাবে এই সম্মেলনের ধ্যান-ধারণার বিরোধিতা করে। সম্পাদকীয়, ফিচার ও চিঠিপত্র কলামে সম্মেলনের বিভিন্ন দিক নানাভাবে সমালোচিত হয়। 'দৈনিক আজাদ' সম্মেলনকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করে।[২৬]

কাগমারী সম্মেলন বিশেষ গুরুত্ব পায় একই সাথে আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্য। সোহরাওয়ার্দী মনে করলেন মাওলানা ভাসানী কতিপয় কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের ইশারায় খেলছেন। তিনি এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সম্মেলনে যোগ দিতে কাগমারী গেলেন। তিনি প্রতিনিধিদের সামনে নিজের মত তুলে ধরে সামরিক চুক্তির পক্ষে বক্তব্য রেখে ছাত্র সমাজ ও জনগণের কাছ থেকে তার নীতির পক্ষে সমর্থন আদায়ে সক্ষম হলেন। তবে সম্মেলনের সাংস্কৃতিক দিকের তাৎপর্যও কম ছিল না। লক্ষনীয় যে এই আয়োজনে সাম্প্রদায়িকতা স্থান পায়নি। হিন্দু মুসলমান সকল বাঙালীর সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যের উন্নয়ন সম্ভব সম্মেলনের মধ্য

---

২৪. প্রাগুক্ত, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।

২৫. প্রাগুক্ত, ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।

২৬. দৈনিক আজাদ, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭, সম্পাদকীয় ঃ কাগমারি সম্মেলন (৩)।

www.pathagar.com

দিয়ে তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই বাংলার সংস্কৃতির শেকড় এক ও অবিচ্ছেদ্য তাও এতে প্রকাশ পায়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সম্মেলনে শহুরে ও গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যে সেতু বন্ধনের চেষ্টা চালানো হয়। সংস্কৃতিকে আরো শক্তিশালী করতে মানুষের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যে সম্ভাব্য সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্মেলনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সর্বোপরি সাহিত্য যে আন্তর্জাতিকতার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হতে হয় এই সত্যটি সম্মেলনের মাধ্যমে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যায়। এই সম্মেলন থেকে পাকিস্তান ও ভারত দু'দেশের জ্ঞানী ও শিল্পীদের মধ্যে মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সেমিনার-সিম্পোজিয়াম আয়োজন করার মূল ধারনা অর্জিত হয়।

সিপাহী বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তি

কাগমারী সম্মেলনের প্রভাব ঠেকাতে ইসলামী ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে গঠিত বেশ কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন সিপাহী বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। হাসান জামান ছিলেন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক। অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলোর মধ্যে ছিল তমদ্দুন মজলিস, পাকিস্তান মজলিস, পাক-বাংলা সাহিত্য মাহফিল, শিল্প-সংস্কৃতি পরিষদ এবং পূর্ব পাকিস্তান জমিয়ত-ই-তোলাবা। একশ' বছর পূর্বে উপমহাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পথে যে সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয় তার স্মরণে ২৯ মার্চ তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু হয়। আতাউর রহমান খান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীম।

সকাল ১০ টায় কোরআন তেলাওয়াত, নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবর, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ শ্লোগান এবং পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত- 'পাক সার জামিন সাদ বাদ' পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। জনাব খান তার বক্তৃতায় বলেন, ১৮৫৭ সাল মুক্তি সংগ্রামের অগ্রদূত হলেও মুক্তি আন্দোলন শুরু হয় অনেক আগে। বস্তুতঃ বিপ্লবী শহীদ মুজাহিদ সৈয়দ আহমদ হচ্ছেন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান অগ্রনায়ক।[২৭] সভাপতি বলেন, এসব শহীদ যে আদর্শ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের জন্য নিঃস্বার্থভাবে রক্ত দিয়েছিলেন আমরা এখনো সে ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকলে নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের দর্শন তার মূল তাৎপর্য হারিয়ে ফেলবে।

তিন দিনের অনুষ্ঠানে সাহিত্য সংস্কৃতির ওপর বহু প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। এগুলোর মধ্যে গোলাম ওয়াহেদের "পাকিস্তান আন্দোলনে ইসলামের প্রভাব", কাজী দীন মোহাম্মদ-এর 'বাংলা সাহিত্যে জাতীয় জাগরণ' এবং আমিনুল ইসলামের 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান' উল্লেখযোগ্য। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নজরুল সঙ্গীত ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমির ওপর কবি ফররুখ আহমদ রচিত গান পরিবেশিত হয় এবং

২৭. সাপ্তাহিক সৈনিক, ৫ এপ্রিল, ১৯৫৭।

www.pathagar.com

আসকার ইবনে শাইখের '১৮৫৭' নাটক মঞ্চস্থ হয়। এ ছাড়াও ছিল চুটকি ও খোশালাপের সমাহার। অনুষ্ঠানের শেষ দিনে মাহফুজুল হক অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে সমবেত সুধীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, সিপাহী বিপ্লবের মূল্যবোধ পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যা বিপ্লব পরবর্তীতে একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করেছিল।[২৮] কয়েকজন বুদ্ধিজীবী সিপাহী বিপ্লবকে 'প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলে আখ্যায়িত করেন।

রওনক সাহিত্য গোষ্ঠী

এরই পথ ধরে ১৯৫৮ সালের মার্চ ও এপ্রিলে পাকিস্তানপন্থী কিছু সাহিত্যিক 'রওনক' নামে একটি বেসকারী সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এর লক্ষ্য ছিল 'সমগ্র পাকিস্তান' চিন্তা চেতনার ভিত্তিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্যোগে সহায়তা করা।[২৯] সংগঠকরা সমমনা ২৫ জন সদস্যের মধ্যে সংগঠনটিকে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন। প্রাথমিক পর্যায়ে যাদেরকে নেয়া হয় তারা হচ্ছেন, সভাপতি মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, সহ-সভাপতি ইব্রাহীম খাঁ ও গোলাম মোস্তফা এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। পালাক্রমে প্রতি মাসে সদস্যদের বাড়ীতে আলোচনা সভা করার বিধান রাখা হয়। সভায় একজন সদস্য প্রবন্ধ পাঠ করবেন এবং অন্যরা তার ওপর আলোচনা করবেন। যার বাড়ীতে সভা হবে তাকে উপস্থিত সদস্যদের খাওয়ার আয়োজন করতে হবে বলেও বিধান রাখা হয়।[৩০]

গোলাম মোস্তফার বাড়িতে ১১ মে প্রথম সভা হয়। তিনি 'পাক-বাংলা ভাষা'র ওপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলোচনায় এই অভিমত বেরিয়ে আসে যে, অতীতে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হিন্দু সংস্কৃতির বাহক 'সংস্কৃত' শব্দ বাংলা সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে এসব শব্দ বাংলা ভাষা থেকে বিদায় করতে হবে ।[৩১] জুলাইয়ের সভায় আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী 'বাংলা ভাষার অভিধান' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় অবিলম্বে একটি 'পাক-বাংলা অভিধান' প্রণয়নের ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ, পুঁথি সাহিত্য এবং আঞ্চলিক লোক সাহিত্যের ওপর নির্ভর করার জন্যও এটা জরুরী। এমনকি প্রয়োজন হলে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ বিলোপের সুপারিশও করেন তারা। সভায় আরো প্রস্তাব করা হয় যে, 'পাক-বাংলা' সাহিত্যের ধাঁচে 'পাক-বাংলা'

---

২৮. প্রাগুক্ত।

২৯. দৈনিক আজাদ, ২৭ এপ্রিল, ১৯৫৭।

৩০. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি (ঢাকা ঃ ১৯৬৮), পৃঃ ৩৬৬-৩৬৯।

৩১. দৈনিক আজাদ, ১৩ মে, ১৯৫৮।

www.pathagar.com

ভাষার অভিধান লেখা হবে এবং এ কারণে বাংলা ভাষার সংস্কার দরকার।[৩২] খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন সংগঠনের আগষ্ট বৈঠকে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধের মূল বিষয় ছিল 'পাক-বাংলা' সাহিত্যে উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারার পরিবর্তন কারণ এগুলো সংস্কৃত থেকে এসেছে এবং পাকিস্তানী সংস্কৃতির পরিপন্থী।[৩৩] আলোচনায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে জাতীয় দর্শন ও সাংস্কৃতিক সংহতির আলোকে এবং সর্বোপরি পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে পরিভাষা তৈরী করতে হবে। প্রয়োজনে আরবী ফার্সি শব্দেরও ব্যাপক ব্যবহার করা যাবে।[৩৪] বিদেশী সাহিত্য আমদানির গুরুত্ব সম্পর্কিত একটি সভা বসে নভেম্বরে। অংশগ্রহণকারীরা বিদেশী বই বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার বই আমদানি নিষিদ্ধ করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। তাদের মতে পাকিস্তান বিরোধী চিন্তা-চেতনার এসব বই দেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের বিপথগামী করবে এবং পাকিস্তানী লেখকদের ভবিষ্যতের জন্যও তা বিপজ্জনক।[৩৫]

'রওনকে'র সভা ক্রমেই অনিয়মিত হয়ে পড়ে। অনেকেই তাদের বাড়ীতে সভার ব্যাপারে আপত্তি করেন। রওনক সাহিত্য গোষ্ঠীর তৎপরতাকে একটি ভিন্ন ধারা হিসেবে দেখা যেতে পারে; কিন্তু সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য কোন প্রভাব ছিল না। কারণ সংগঠনের আলাপ-আলোচনা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ; তাই বৃহত্তর পরিসরে তা কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবে এই সংগঠন ভারত বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও ছায়াছবি আমদানি নিষিদ্ধ করার লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সাহিত্য সেমিনার

এ সময় ১৯৫৮ সালে সমসাময়িক সাহিত্য নিয়ে আলোচনার জন্য রকফেলর ফাউন্ডেশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩ হাজার ৭শ ডলার প্রদান করে।[৩৬] ইংরেজী বিভাগ এই দায়িত্ব নেয়। এই উদ্দেশ্যে মাসে একটি করে ৮টি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সভায় এক বা একাধিক প্রবন্ধ পাঠ ও তার উপর আলোচনা হয়। প্রথম সেমিনারটি হয় ফজলুল হক হল মিলনায়তনে এবং আলোচকরা বাংলা ও ইংরেজী উভয় সাহিত্যের উপর আলোচনা করেন।

২৭ ফেব্রুয়ারী ছিল প্রথম আলোচনা সভা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সভা উদ্বোধন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, পশ্চিমা সাহিত্যের আলোকে বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়ন, বাংলা সাহিত্যের সাথে বিদেশী রাষ্ট্রগুলোকে পরিচিত করা এবং রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা

---

৩২. প্রাগুক্ত, ২২ জুলাই, ১৯৫৮।
৩৩. প্রাগুক্ত, ১৯ আগষ্ট, ১৯৫৮।
৩৪. প্রাগুক্ত, ১১ আগষ্ট ১৯৫৯।
৩৫. প্রাগুক্ত, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৫৯।
৩৬. প্রাগুক্ত, ১৪ জানুয়ারী, ১৯৫৮।

www.pathagar.com

সাহিত্যের উন্নয়ন ছিল এই সেমিনারের প্রধান ইস্যু।[৩৭] সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, 'পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের বর্তমান মান', 'পূর্ব পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের সমসাময়িক রহস্য উপন্যাস', 'ইংল্যান্ড ও পূর্ব পাকিস্তানের সমসাময়িক লেখনীতে বিচ্যুতি; 'বাংলা সাহিত্যে ভাবালুতা', 'সমকালীন কথা সাহিত্যে ও নাটকে ভাবালুতা', 'বাংলা কথা সাহিত্যে সমাজ চেতনা' ও 'বিমূর্ত চিন্তার বাহন হিসেবে বাংলা গদ্য'। প্রবন্ধকারদের মধ্যে ছিলেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, নূরুল মোমেন, আবুল হোসেন, খান সরোয়ার মোর্শেদ, হাসান জামান, মুনীর চৌধুরী, আসকার ইবনে শাইখ, কবির চৌধুরী ও সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন।

আলোচকগণ বিভিন্ন দিক থেকে সাহিত্যের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু এটা এক ধরনের পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় পরিণত হওয়ার কারণে কেউ সাহিত্যের আসল সমস্যার গভীরে যাননি এবং সমাধানও দেননি। পূর্ব বাংলার সমসাময়িক কবিতার ঐতিহ্য বলতে গিয়ে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী দেখান যে ইসলামী ধারা ও বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে সফল সমন্বয়ের মধ্যে এই ঐতিহ্য নিহিত। তাঁর বক্তব্য কেউ সমর্থন করেনি।

হাসান জামান ও আবদুর রশীদ খান বুঝতে পারলেন যে, শব্দ চয়ন নিয়ে বিতর্ক নিষ্ফল হবে না। এর ফলে জাতীয় ও সাহিত্য ঐতিহ্যের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক চিন্তাধারা পরিষ্কার হবে। কয়েকজন বক্তার মতে পূর্ব পাকিস্তানের লেখকদের লক্ষ্য ছিল জাতীয়তাবাদী চরিত্রের সাহিত্য সৃষ্টি এবং এই বৃহৎ উদ্দেশ্যের সবকিছু হবে গৌণ।[৩৮] দেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ কিভাবে ঘটেছিল তা দেখিয়ে দেয় সম্রাজ্যবাদ সমসাময়িক বাস্তবতা থেকে সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কিভাবে চেষ্টা করছে তাও এই সেমিনারে উদ্‌ঘাটিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সেমিনার, চট্টগ্রাম

একই সময়ে ১৯৫৮ সালে চট্টগ্রামে পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য মাহফিলের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মৌলভী আবদুর রহমান ও মৌলভী নূরুল ইসলাম চৌধুরী।[৩৯] সম্মেলনের পূর্ব কথা সম্পর্কে আবদুর রহমান তার জীবনীতে লিখেছেন, যুক্তফ্রন্টের বিজয় পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা বৃহত্তর বাংলার

---

৩৭. S. Sajjad Hossain (Ed.) Report : Dhaka University Seminars on Contemporary Writing in East Pakistan (Department of English, University of Dhaka) P.2

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

৩৯. মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ ১৩৬৫ বাংলা, পৃঃ ৮৯৮।

www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছিল। তার মতে, পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী এ ক্ষেত্রে সব বাধা প্রতিহত করে পাকিস্তানী আদর্শের অনুকূল পরিবেশ তৈরীর জন্য এই সম্মেলনের আয়োজন করে।[৪০]

সম্মেলনে পাক-বাংলা আদর্শ ও সাহিত্য, পাক-বাংলার ভাষণ ও সংস্কৃতি, পাক-বাংলার চারুকলা ও পাক-বাংলার চিত্রকলা নামে ৪টি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ছিলেন প্রধান সভাপতি এবং সভাগুলোর সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে ইব্রাহীম খাঁ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও জয়নুল আবেদীন। যাত্রা মোহন সেন হলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রবেশ পথে আলাওল, নজরুল, ইকবাল ও কায়েদে আজমের নামে তোরণ নির্মাণ করা হয়। বিভিন্ন চিত্রকর ও শিল্পীর ছবি দিয়ে সাজানো হয় মঞ্চ। সেখানে ছিল পূর্ব পাকিস্তনের এক বিশাল মানচিত্র এবং মঞ্চের পশ্চাৎপটে নজরুল ও ইকবাল এবং কোরআন ও হাদীসের বাণী উৎকীর্ণ ছিল।

বিশাল জনসমাগমের মধ্য দিয়ে ২ মে সম্মেলন উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত সাহিত্যামোদীদের স্বাগত জানিয়ে মতিউল ইসলাম ও আব্দুস সালাম কবিতা পাঠ করেন। এরপর সভাপতির বক্তব্যে মাওলানা আকরাম খাঁ বলেন যে, "ইসলামী জীবন দর্শন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান অর্জনের পর সবাই পাকিস্তনের মূল চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। লেখক ও গীতিকার হাত মিলিয়েছেন কমিউনিস্টদের সাথে। কুমিল্লা, ঢাকা ও কাগমারীতে এ ধরনের সম্মেলন হয়েছে। আমি একজন মুসলমান এবং পূর্ব পাকিস্তানী, এখন আর আমি বাঙ্গালী নই।" তিনি এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটি সাহিত্য সৃষ্টির আহবান জানান।[৪১]

৩ মে ইব্রাহীম খা, গোলাম মোস্তফা ও আশরাফ সিদ্দিকী প্রবন্ধ পাঠ করেন। আশ্চর্যের বিষয় ছিল বাংলা ভাষার উৎপত্তি, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও পূর্ব বাংলার আধুনিক কবিতা ও ভবিষ্যৎ সাহিত্য ও কবিতার উপাদান সম্পর্কে গোলাম মোস্তফার বক্তব্য। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়নি। সেমিটিক ভাষা থেকে এর উৎপত্তি এবং তা ইসলামী সভ্যতার স্মৃতি বহন করে। তিনি আরো বলেন যে বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সি শব্দের বিপুল আগমন ভাষার সংস্কারে একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। মধ্যযুগে মুসলিম কবিরা এ ধরনের একটি ব্যতিক্রমি ও শক্তিশালী গীতিধর্মী ভাষার জন্ম দিতে সক্ষম হন। তাদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে কেননা তারা বাংলা ভাষাকে একটি চমৎকার ইসলামী কাঠামো দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৪২] বাংলা ভাষার সেই গৌরবময় যুগে তারা বাংলাকে আরবী হরফে লেখা

৪০. আবদুর রহমান, এতটুকু মনে পড়ে (জীবনী), চট্টগ্রাম, ১৯৭২, পৃঃ ৪৮২।

৪১. মাসিক মোহাম্মদী, ১৩৬৫ বাংলা, পৃঃ ৮৫৭-৬০।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮৫।

www.pathagar.com

শুরু করেন কিন্তু পরবর্তীকালে কতিপয় হিন্দু পন্ডিত ও খৃষ্টান মিশনারীর চক্রান্তে তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাংস্কৃতিক সংস্কারের জন্য আমাদেরকে পুঁথির ভাষা ও মুখের ভাষার মধ্যে যেতে হবে।[৪৩]

উপসংহারে গোলাম মোস্তফা পাকিস্তানী আদর্শের ভিত্তিতে একটি নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি, ভাষা সংস্কার ও সাহিত্যের বিষয়বস্তু সংগ্রহের আহ্বান জানান। তার মতে, ইসলাম হচ্ছে পাকিস্তানের ভিত্তি তাই সাহিত্যের লক্ষ্য হবে পাকিস্তানবাদ। সকল আদর্শে তার প্রতিফলন ঘটতে হবে।

আবুল মনসুর আহমদের সভাপতিত্বে অপরাহ্নের অধিবেশন বসে। মঈনুদ্দীন, আজহারুল ইসলাম ও সুলতান আহমদ ভূঁইয়া প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি নিজেও 'পাক-বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তবে তিনি ইসলামকে পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতির একমাত্র নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেননি। তিনি পূর্ব বাংলার নিজস্ব ধর্ম, দুঃখ দুর্দশা, নৃত্য ও সঙ্গীতের ভিত্তিতে সংস্কৃতি গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। ভাষার ব্যাপারে তার মত ছিল রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে সাহিত্যের ভাষায়ও পরিবর্তন ঘটবে। ভাষা ও সাহিত্যে ঢাকার প্রভাব ছিল ব্যাপক। এতদাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা হতে হবে।[৪৪]

পরের দিন সকালের অধিবেশনে চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের আবদুস সোবহান খান চৌধুরী, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, এবং মোহাম্মদ আজরফ প্রবন্ধ পাঠ করেন। আজরফের প্রবন্ধটি ছিল বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। তিনি ভারতে ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় বিশ্লেষণ করেন। তিনি পাকিস্তানে তিনটি কার্যকর সাংস্কৃতিক আন্দোলন চিহ্নিত করেন। এগুলো হচ্ছে, জামায়াতে ইসলামী আন্দোলন, তমদ্দুন মজলিস আন্দোলন ও বিশ্ব-ভারতী-মস্কো গ্রুপের আন্দোলন। প্রথম আন্দোলনটির উপাদান সীমিত। এটি শিক্ষা ও চারুকলা সম্পর্কে নিশ্চুপ ছিল। এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে দ্বিতীয়টির ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। অন্যদিকে তৃতীয়টির সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সহায়ক নয়। উপসংহারে তিনি বলেন যে, ইসলামী চিন্তা-দর্শন প্রসারের জন্য বাংলাকে আরবী ভাষায় রূপান্তর ঘটাতে হবে।[৪৫]

সমাপনী অধিবেশন হয় ৫ মে। মাওলানা আকরাম খাঁ বুদ্ধিজীবীদের দেয়া পরামর্শ ও সুপারিশ বাস্তবায়নের চেষ্টা চালানোর জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয় ঃ

১। "পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য মাহফিল " নামে একটি স্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলা;
২। সরকার পরিচালিত সমবায় প্রকাশনা উদ্যোগের মাধ্যমে লেখকদের বই প্রকাশ;

---

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯০।
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৭।
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০২।

www.pathagar.com

৩। সেরা সাহিত্য কর্মের জন্য প্রতি বছর বাংলা একাডেমীর পুরস্কার প্রদান;
৪। জ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মিশনে প্রেরণ; এবং
৫। মুনাফালোভী প্রকাশকদের কবল থেকে লেখকদের স্বার্থ সংরক্ষণ।[৪৬]

উদ্যোক্তাদের বিচারে আয়োজকদের এই সম্মেলন নিঃসন্দেহে সফল হয়। পাকিস্তানপন্থী সাহিত্যকর্মী ও শিল্পীরা আর কোন সম্মেলনে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমস্যা নিয়ে এত ব্যাপক আলোচনা করেননি।

রোমান হরফ প্রচলন ও জাতীয় ভাষা সৃষ্টির উদ্যোগ

সামরিক আইন জারির পর জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য একটি উচ্চাভিলাষী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খান এক ধর্ম, এক ভাষা, এক সংস্কৃতি ও অভিন্ন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে একটি জাতি গঠনের প্রয়াস চালান। যদিও প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের তেমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি কিন্তু ভাষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়। এজন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করা হয়, "ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকন্সট্রাকশন" নামে একটি সংস্থা। কিন্তু এসব পদক্ষেপ বিপরীত ফল বয়ে আনে। পূর্ব বাংলার পৃথক সত্তা, স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের পুরনো দাবী আরো জোরদার হয়। সে সময় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল পরিচিতি তার ভিত্তিতেই গড়ে উঠে।

নতুন সরকার প্রথম থেকেই সমগ্র পাকিস্তানের জন্য একটি ভাষা প্রচলনের চেষ্টা চালায়। পরিকল্পনা ছিল বাংলা ও উর্দূর সমন্বয়ে রোমান হরফে লিখিত একটি ভাষা প্রচলন করা।[৪৭] আইয়ুব খান বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রিদের সাথে বৈঠক করেন, সাংবাদিক সম্মেলন এবং পত্রিকা সম্পাদকদের সাথে বৈঠকে এ সম্পর্কে আভাস দেন। এক সরকারী তথ্য বিবরণীতে বলা হয় দেশের জনগণের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সরকার গোটা দেশের মানুষের জন্য সহজবোধ্য একটি ভাষা তৈরীর চেষ্টা করছে।[৪৮] আইয়ুব খান তার "প্রভু নয় বন্ধু" বইয়ে লিখেছেন,[৪৯]

> "আমার কাছে এটা পরিষ্কার যে দু'টি রাষ্ট্রভাষা নিয়ে আমরা কখনো একজাতি রাষ্ট্র হতে পারবোনা। আমাদেরকে বহুজাতিক রাষ্ট্র হিসেবে থাকতে হবে। আমি বিরোধিতার খাতিরে বিরোধতা করছি না আমি শুধু জীবনের একটি সত্য দিকের কথা বলছি যার স্বীকৃতি প্রয়োজন। এটা ঠিক যে একটি ভাষা সমগ্র দেশের

৪৬. দৈনিক আজাদ, ৭ মে, ১৯৫৮।
৪৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ২ সংখ্যা ডিসেম্বর, ১৯৭৪, পৃঃ ১৮৫-২০৩।
৪৮. দৈনিক আজাদ, ২ এপ্রিল, ১৯৬০।
৪৯. Md. Ayub Khan. Friends not Masters (Oxford University Press, Karachi) P.102.

www.pathagar.com

ওপর চাপিয়ে দেয়া যায় না; বাংলা বা উর্দু কোনটিই গোটা পাকিস্তানের ভাষা হতে পারে না। এটাও সমানভাবে সত্য যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ যদি সংহতি বৃদ্ধি করতে চায়, তাদের পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য অবশ্যই একটি মাধ্যম থাকতে হবে। সেই মাধ্যমকে অবশ্যই জাতীয় মাধ্যম হতে হবে। সে রকম মাধ্যম সৃষ্টির জন্য আমাদেরকে বাংলা ও উর্দুর অভিন্ন উপাদানগুলো চিহ্নিত করে একটি অভিন্ন বর্ণমালার মধ্য দিয়ে তাকে একসাথে গড়ে তুলতে হবে।"

এই প্রকল্প বাস্তবে রূপায়নের জন্য ১৯৫৯ সালে নবগঠিত শিক্ষা কমিশন সুপারিশ পেশ করে। কমিশন দু'টি প্রস্তাব দেয়। প্রথমত ঃ রোমান বর্ণমালার প্রচলন ও বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের চেষ্টায় নিয়োজিত ব্যক্তি বা সংস্থাগুলোর জন্য অর্থ যোগানো; দ্বিতীয়তঃ ছাপার উপযোগী আদর্শ উর্দু বর্ণমালা নির্ধারণ, বাংলা বর্ণমালা সংস্কার এবং ভাষা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন যারা উর্দু ও বাংলা বর্ণমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রোমান বর্ণমালা তৈরী করবেন। প্রস্তুতি পর্ব শেষ হবার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমিশন মত প্রকাশ করে।[৫০]

সরকার ইতোমধ্যে ১৯৪৯ সালের পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্টে বাংলা ভাষার ব্যাপক সংস্কারের সুপারিশ করা হয়। বাংলা একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান এ লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান। ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমী "বাংলা ও উর্দু ঃ এক সাহিত্যের মুখোমুখি" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। জাতীয় সংহতি জোরদার করাই ছিল এর লক্ষ্য। বাংলা একাডেমীর পরিচালক বাংলা ও উর্দুর অভিন্ন শব্দ চিহ্নিত করে সেগুলো জনপ্রিয় করে তোলার আহবান জানান। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত "আরবী-ফার্সি-উর্দু-তুর্কী' শব্দের একটি অভিধান এবং উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত-পালি-বাংলা শব্দের একটি অভিধান প্রকাশ করা গেলে দুই রাষ্ট্রীয় ভাষার মধ্যেকার দূরত্ব কমে আসবে।[৫১]

তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্ণর আজম খান সেমিনার উদ্বোধন করেন। তিনি দুই প্রদেশের ভাষাগত ব্যবধান দূরীকরণের জন্য একটি ইতিবাচক সমাধান খুঁজে বের করার আহবান জানান। তিনি আরো বলেন যে, দু'টি ভাষার মূলেই যেহেতু ইসলাম রয়েছে তাই সমাধান খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না।[৫২]

---

৫০. National Education Commission Report (Government of Pakistan) 1959 P. 373.

৫১. Bengali and Urdu : A Literary Encounter : A Seminer (Dhaka, Bangla Academy, 1964), P. 9.

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ-৯।

www.pathagar.com

সে বছরই বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য সৈয়দ আলী আহসানকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি কয়েকটি বর্ণ বিলোপ এবং কিছু সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের পরামর্শ দেয়। বাংলা একাডেমীর চতুর্থ বার্ষিক সভায় গভর্ণর আবদুল মোনেম খান এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে একটি সমঝোতায় আসার জন্য বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আহবান জানান।[৫৩]

কিন্তু এ ধরনের উদ্যোগের বিরুদ্ধে শীঘ্রই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। রোমান বর্ণমালা সম্পর্কে শিক্ষা কমিশনের মতামত চাওয়া হলে দৈনিক ইত্তেফাক তার বিরোধিতা করে দু'টি 'সম্পাদকীয়' লিখে।[৫৪] 'মাসিক মোহাম্মদী'ও তার বিরোধিতা করে।[৫৫] ১৯৫৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সম্মিলিত ছাত্র সভায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয় এবং রোমান হরফ প্রচলনের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয়। মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে রোমান বর্ণমালা প্রত্যাখান করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবের যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন এনামুল হক ও মোঃ আবদুল হাই।[৫৬] মোঃ ফেরদৌস খানও অভিন্ন মত প্রকাশ করেন।

১৯৬০ সালের শহীদ দিবসেও ছাত্ররা রোমান হরফ চালুর উদ্যোগের প্রতিবাদ জানায়। ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনে এটা ছিল একটি বড় ইস্যু। পাশাপাশি অন্যান্যরাও এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। বাংলা একাডেমীর এক সভায় পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটির সুপারিশমালা প্রত্যাখান করা হয়। রফিকুল ইসলাম এক নিবন্ধে বাংলা একাডেমী কর্তৃক সুপারিশেরও নিন্দা করেন।

পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড প্রতিষ্ঠা

পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা সচিব ও উর্দু ছোট গল্প লেখক কুদরতুল্লাহ সাহাব এবং আরো কয়েকজন উর্দু লেখকের উদ্যোগে ১৯৫৯ সালের ২৯-৩১ জানুয়ারী করাচীর 'গোয়ানিস হলে' বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যিকদের নিয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের ব্যয় বহনের জন্য বাংলা একাডেমী, 'ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিট ফান্ড' এবং লাহোর ও করাচীর বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী প্রায় ৫০ হাজার রূপি দান করে।[৫৭] প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান লেখকদের উগ্যোগ এবং পাকিস্তানের সংহতির জন্য তাদের আগ্রহে সন্তোষ প্রকাশ করে সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। তিনি লেখকদের প্রতি তাদের চিন্তা ও

---

৫৩. বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা ১৩৭০ বাংলা, পৃঃ ১১৫।
৫৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯-২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯।
৫৫. মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র ১৩৬৫ বাংলা, পৃঃ ৫০১।
৫৬. মাসিক সমকাল, চৈত্র, ১৩৬৫ বাংলা।
৫৭. মাসিক মোহাম্মদী, ফাল্গুন, ১৩৬৫ বাংলা, পৃঃ ৩৭৯।

www.pathagar.com

সাহিত্যকর্মে ইসলামী আদর্শের বিকাশ ঘটানোর পরামর্শ দেন।[৫৮] কুদরতুল্লাহ সাহাব লেখকদের উদ্দেশে বলেন,

> "লেখক আইনের উর্ধে নয়। একদেশে বাস করে সে অন্য দেশের প্রতি আনুগত্য দেখাতে পারে না। নিজ আদর্শের বেলায় অন্য বিশ্বাস থেকেও সে উপাদান গ্রহণ করতে পারে না। তিনি লেখকদের প্রতি 'পাকিস্তানী দর্শন'[৫৯] প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা পালনেরও আহবান জানান। তিনি প্রকৃত স্বাধীনতাদানের জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে ধন্যবাদ জানান, যা সামরিক শাসনপূর্ব সময়ে দেয়া হয়নি। সম্মেলনে আল্লামা ইকবালের পুত্র জাভেদ ইকবালও শ্রেণী সংগ্রাম এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের বিরোধিতা করে লেখনী চালনার আহবান জানান। তিনি সাহিত্যকর্মে 'ইসলামী দর্শন' বাস্তবায়নের জন্য লেখকদের প্রতি অনুরোধ জানান।[৬০]

সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে 'পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড' গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটিতে পূর্ব বাংলার ১১ জন প্রতিনিধি নেয়া হয়। তারা হলেন, ইব্রাহীম খাঁ, গোলাম মোস্তফা, জসিমুদ্দীন, আবদুল কাদির, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, আবুল হোসেন, আসকার ইবনে শাইখ, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ও মোহাম্মদ আবদুল হাই।[৬১]

প্রথম বছরে সরকার 'রাইটার্স গিল্ডকে' এক লাখ রুপি সুদমুক্ত ঋণ দেয়। এই অর্থে গিল্ড বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নেয়। এগুলোর মধ্যে ছিল করাচী, লাহোর ও ঢাকায় প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন, ৬০ বছর বয়সের নীচের সদস্যদের জন্য ৫ হাজার রুপি'র জীবন বীমা করা, রেল স্টীমারে সদস্যদের অর্ধেক ভাড়ায় ভ্রমণ সুবিধা দেয়া, প্রতিবছর বিদেশে সাংস্কৃতিক মিশন প্রেরণ, পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষায় সদস্যদের লেখা অনুবাদ, লেখকের জীবনীসহ বই প্রকাশ এবং সংগঠনের একটি মুখপত্র প্রকাশ।[৬২] পরবর্তীতে এই মুখপত্রের নাম দেয়া হয় 'পূরবী'। মাতৃভূমির সীমানা ছাড়িয়ে বৃহত্তর মানব প্রেমের বিকাশ ছিল এর লক্ষ্য। পরে এর নামকরণ করা হয় 'দি জার্নাল অব দি রাইটার্স গিল্ড'।

গিল্ড বেশ কিছু সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন করে। এগুলোর মধ্যে ছিল আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, দাউদ সাহিত্য পুরস্কার, ন্যাশনাল ব্যাংক পুরস্কার। শিল্পপতি আদমজীর অর্থ সহায়তায় আদমজী, শিল্পপতি দাউদের অর্থে দাউদ এবং পকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাংকের অর্থ সহায়তায় ন্যাশনাল ব্যাংক পুরস্কার দেয়া হতো। এছাড়া সামরিক আইন জারির পর

---

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ-৩৫০, মোঃ আইয়ুব খান, পাকিস্তানের সংহতি ও লেখকদের ভূমিকা।
৫৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৫।
৬০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৫।
৬১. প্রাগুক্ত, জ্যৈষ্ঠ ১৯৬৬ বাংলা, পৃঃ ৬১৫-২৩
৬২. পূরবী, শ্রাবণ ১৩৬৫ বাংলা, পৃঃ ৩৮-৩৯।

www.pathagar.com

শিল্প সাহিত্যে দেশের সর্বোচ্চ খেতাব 'প্রেসিডেন্ট'স এওয়ার্ড ফর প্রাইড এন্ড পারফর্মেন্স' প্রবর্তন করা হয়।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশত বার্ষিকী পালন

এ সময় সারা বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শত বার্ষিকী পালন করা হয়। কিন্তু পূর্ব বাংলা ছিল ব্যতিক্রম। সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা না করলেও এ সময় নানা অজুহতে আলাউদ্দীন আল-আজাদ, কে জি মোস্তফা, আনোয়ার জাহিদ সহ সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনের বেশ কিছু প্রখ্যাত ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করা হয়। সংস্কৃতি অঙ্গনে গুমোট পরিবেশ বিরাজ করছিল। এ পরিস্থিতিতেও মফস্বলের বিভিন্ন শহরে জন্মবার্ষিকী উদযাপনের কিছু কিছু খবর পত্রিকায় আসে। বগুড়া ও ফরিদপুরের অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসকগণ সভাপতিত্ব করেন বলেও জানা যায়। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের গুমোট পরিবেশ কেটে যেতে থাকলে জন্মবার্ষিকী উদযাপনের খবর প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হতে থাকে। এমনকি ঢাকাতেও কয়েকটি ছোট-বড় সংগঠন এ উপলক্ষে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে।

সামরিক সরকার এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকলেও পাকিস্তানমনা বুদ্ধিজীবীরা তখন নিশ্চুপ বা নিষ্ক্রিয় থাকেননি। তারা এসব স্বতঃস্ফূর্ত অনুষ্ঠানসমূহে দুই বাংলাকে একত্রিত করা, পাকিস্তানী দর্শন ও ইসলামী আদর্শ বিরোধী শক্তি গাঁটছাড়া বাঁধার ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে তার মেকাবেলায় এগিয়ে আসেন। দৈনিক আজাদ ছিল তাদের মুখপত্র। ১ বৈশাখের সম্পাদকীয়তে দৈনিক আজাদ সবাইকে এতে জড়িত না হবার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়।[৬৩]

১২ বৈশাখ (১৩৬৮ বাংলা) দৈনিক আজাদে 'রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তান' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে বলা হয় মুসলমানদের রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী পালন মৃত্যুদন্ডযোগ্য মহাপাপ। দু'দিন পর আরেক সম্পাদকীয়তে বলা হয় রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের জাতীয় আদর্শ, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না, বরং অনেক ক্ষেত্রে অসহিষ্ণু ছিলেন। বৈশাখ মাসের এই তিনটি সম্পাদকীয় ছাড়াও রবীন্দ্র সাহিত্যের ব্যর্থতা, মুসলমানদের কাছে তার অগ্রহণযোগ্যতা এবং রবীন্দ্র বার্ষিকী উদযাপনকারীদের পাকিস্তান বিরোধী মানসিকতার সমালোচনা করে আরো তেইশটি প্রবন্ধ ও চিঠি প্রকাশিত হয়।

এসব লেখক ও শিল্পীরা পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথকে মূল্যায়নের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ফেনীতে কয়েকটি সেমিনারের আয়োজন করে। ২৪ বৈশাখ ঢাকা জেলা পরিষদ হলে এ ধরনের এক সেমিনারে ফজলুল হক সেলবর্ষী, কবি মঈনুদ্দীন, দেওয়ান আবদুল হামিদ, বিশ্বেশ্বর চৌধুরী, গোলাম আযম, মাওলানা মুহিউদ্দীন ও হাফেজ

৬৩. দৈনিক আজাদ, ১ বৈশাখ, ১৩৬৮ বাংলা (সম্পাদকীয়)।

www.pathagar.com

হাবিবুর রহমান বক্তব্য রাখেন। সঞ্জয় বড়ুয়া ও আবদুল মান্নান তালিব 'বন্দীবীর' ও 'শিবাজী উৎসব' কবিতা দু'টি আবৃত্তি করেন। তারা রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তান বিরোধী চিহ্নিত করে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথকে তারা বঙ্কিম চন্দ্রের উত্তরাধিকারী ও প্রতিক্রিয়াশীল চেতনার ধারক হিসেবেও চিহ্নিত করেন ঃ

১। এই সভা সে সব তথাকথিত সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের কর্মকান্ড উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে তারা রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসেবে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ক্ষতিকর সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড শুরু করেছেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ধ্বংস করে অখন্ড ভারত ও রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছেন।

২। এই সভা দেশপ্রেমিক সকল পাকিস্তানী ও সরকারকে এসব লোকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহবান জানায়। অপ্রত্যাশিতভাবে স্বচ্ছল ও ধনী এসব লোক একটি শত্রু সংস্কৃতি ও দর্শনের ধ্বজাধারী এবং গোপনে আরেকটি দেশের কাছে পাকিস্তানকে বিক্রি করে দেবার চক্রান্ত করছে।

৩। এই সভা পূর্ব পাকিস্তান রেডিও, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিদেশী সঙ্গীত ও সাহিত্য থেকে মুক্ত করে পাকিস্তানের শিশু ও যুবকদের জাতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনের আলোকে গড়ে তুলতে গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহবান জানায়।[৬৪]

কিন্তু সরকারের ভ্রূকুটি ও সহযোগীদের প্রপাগান্ডায় কোন ফল হয়নি। গোটা প্রদেশে ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসব্যাপী সেমিনার, সাহিত্য প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, সঙ্গীতানুষ্ঠান, নাটক, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি অনুষ্ঠান চলতে থাকে। এর ফলে দীর্ঘ দিনের স্থবিরতা কাটিয়ে সাংস্কৃতিক অঙ্গন সজীব হয়ে ওঠে। ডাকসুর নেতৃত্বে ঢাকায় তিনটি মূল কমিটি এসবের আয়োজন করে। কার্জন হলে ১১ বৈশাখ ছিল প্রধান অনুষ্ঠান। বেগম সুফিয়া কামাল এতে সভাপতিত্ব করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে রাজনৈতিক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে এক মহান কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। দ্বিতীয় দিনের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আবদুল হাই। বিভিন্ন বক্তা রবীন্দ্র সাহিত্যের বিশ্বজনীনতা, মুসলমানদের সমস্যার ব্যাপারে তার সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার মহান সাহিত্য কর্মে পূর্ববাংলার গ্রামীন জীবন ও প্রকৃতির ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন।[৬৫]

ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এস, এম মোর্শেদকে সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক খান সরোয়ার মোর্শেদকে সম্পাদক করে রবীন্দ্রবার্ষিকী উদযাপন

৬৪. প্রাগুক্ত, ২৩-২৪ এপ্রিল, ১৯৬১।
৬৫. প্রাগুক্ত, ২৩-২৪ এপ্রিল, ১৯৬১।

www.pathagar.com

(১৩৬৮ বাংলা) কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ২৪ বৈশাখ থেকে টেকনিক্যাল কমিউনিটি সেন্টারে চার দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু করে। প্রথম দিনের সভায় প্রধান বিচারপতি ইমাম হোসেন চৌধুরী অংশ নেন। তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যকে মানুষের জন্য এক মূল্যবান সম্পদ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন সমস্যা জর্জরিত আধুনিক বিশ্ব কবির চিন্তা ও আদর্শ থেকে উপকৃত হতে পারে। রবীন্দ্র সাহিত্য প্রদেশের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে এবং তা পাক-ভারত ঐতিহ্যের সাথে একাকার হয়ে গেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় দিন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন দ্ব্যর্থহীনভাবে রবীন্দ্রনাথকে চসার, সেক্সপিয়ার, বালজাক, ভল্টেয়ার এবং অন্যান্য বিশ্বখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের মত মহান সৃষ্টিশীল কবি হিসেবে অভিহিত করেন। সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নাট্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দু'দিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।[৬৬] রাজধানী ঢাকার প্রেসক্লাবে শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ছাত্রদের নিয়ে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উদযাপন যৌথ কমিটি গঠন করা হয়। সিম্পোজিয়াম, নাটক মঞ্চায়ন, চিত্র ও বই প্রদর্শনী এবং শিশুদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কমিটি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে।[৬৭]

ছায়ানট প্রতিষ্ঠা

ব্যাপক সাফল্যের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রবার্ষিকী অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর কতিপয় সাহিত্য কর্মী সঠিকভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন চালিয়ে নেবার লক্ষ্যে একটি স্থায়ী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ঢাকা ও জয়দেবপুরে অনুষ্ঠিত দু'টি সভায় তারা একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এভাবে 'ছায়ানটের' জন্ম। বেগম সুফিয়া কামাল ও ফরিদা হাসান যথাক্রমে ছায়ানটের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন।

ছায়ানট মূলতঃ একটি সঙ্গীত সংগঠন। এর লক্ষ্য ছিল সংস্কৃতি ও সঙ্গীতকে পুরোপুরি দেশের প্রকৃতির ধাঁচে গড়ে তোলা। টেকনিক্যাল কমিউনিটি সেন্টারে ছায়ানটের প্রথম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়া অন্যান্য কর্মকান্ডের মধ্যে ছিল নজরুল ও রবীন্দ্র বার্ষিকী পালন, বাংলা নববর্ষ উদযাপন, বর্ষা মঙ্গল হেমন্ত ও বসন্ত উৎসব। বাংলা নববর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান হতো রমনা বটমূলে। অন্যদিকে হেমন্ত উৎসব হতো বলধা গার্ডেনে। এসব অনুষ্ঠানে দেশীয় জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হতো।

১৯৬৩ সালে ছায়ানট একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।[৬৮]

---

৬৬. প্রাগুক্ত, ৮ মে, ১৯৬১।

৬৭. ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন এই কমিটিকে অর্থ যোগান দেয়। সাইদুর রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা, ১৯৮৩ পৃঃ ৮১, (ফুটনোট)।

৬৮. ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তনঃ ১৩৬০ বাংলা (পুস্তিকা), ঢাকা।

www.pathagar.com

ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী মিলনায়তনে ১৯৬৩ সালের ২২ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' পালন করা হয়। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় সংস্কার বোর্ডের অর্থানুকূল্যে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলা বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি পুঁথি বিদ্যার শৃঙ্খল ও গবেষণাগারের মাইক্রোস্কোপের বাইরে বিস্তৃত করার মাধ্যমে ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা, মনযোগ ও সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[৬৯]

সপ্তাহের কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো- আলোচনা সভা, কবিতা আবৃত্তি, নাটক গান, প্রদর্শনী ইত্যাদি। প্রদর্শনীর চারটি শাখা ছিল। এগুলো হচ্ছে ভাষার ক্রমবিকাশ, সাহিত্যের উন্নয়ন, বর্ণমালার পরিবর্তন ও চিত্রকলার ইতিহাস। প্রাচীনকালের রেখাচিত্র, নকশা, খোদাই করা নকশা, হাতে লেখা পুঁথি এবং ছাপানো বইয়ের মাধ্যমে প্রদর্শনীতে জনগণের কাছে ঐতিহাসিক তথ্য পৌছানোর প্রয়াস চালানো হয়। শিল্পকর্মের মধ্যে ছিলো সিদ্ধাচার্যের বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন, বাংলায় মুসলমানদের আগমন, বৈষ্ণব সাহিত্য, রোসাংয়ের রাজপ্রাসাদ, ইংজেরদের বঙ্গ বিজয় ইত্যাদি। প্রদর্শনীর প্রবেশ পথে সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত কবি আবদুল হাকিমের কবিতার বিভিন্ন চরণ উৎকীর্ণ ছিল।[৭০] ২২ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় সম্মেলন শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণে আবদুল হাই বলেন, পূর্ববাংলায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। উপমহাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম পৃথক বাংলা বিভাগ খোলা হয়। এদেশে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। এখানেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে।' এসবের তাৎপর্য হচ্ছে যে, "আল্লাহ এদেশবাসীর ওপর বাংলাভাষার বহুমুখী উন্নয়নের মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।"[৭১]

সে সময় ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনায় পরিণত হয়। প্রতিদিন হাজার হাজার লোক প্রদর্শনী দেখতে আসে। তারা মনযোগ সহকারে আলোচনা শুনে এবং অনুষ্ঠান উপভোগ করে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রতিটি দৈনিক ও সাপ্তাহিকে এ রিপোর্ট ও নিবন্ধ ছাপা হয়।

---

৬৯. মোহাম্মদ আব্দুল হাই (সম্পাদিত), ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), বাংলা বিভাগ, ১৩৭০ বাংলা, পৃঃ- ১০৯।

৭০. 'যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মন ন জুড়ায়
নিজ দেশত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।'

৭১. প্রাগুক্ত, পৃঃ-১৮-২০।

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যের গুরুত্ব ও ঐতিহ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রদানের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান ব্যাপক গুরুত্ব লাভ করে। মধ্যযুগের মুসলিম সাহিত্যের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হলেও অনুষ্ঠানের কর্মসূচী সাম্প্রদায়িক চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। সে সময় ধর্ম নিরপেক্ষ মনোভাব ও ঐতিহ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা সৃষ্টির জন্য এ ধরনের একটি উদ্যোগ জরুরী ছিল।

পহেলা বৈশাখ (বাংলা নববর্ষ) ঃ

বাঙালীর জন্য বাংলা নববর্ষ একটি অর্থবহ দিন। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন বাঙালী সংস্কৃতির বহুদিনের রেওয়াজ। ব্যবসায়ীরা এদিন 'হাল খাতা' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন হিসেব পত্র খোলে। গ্রামেগঞ্জে মেলা বসে। পাকিস্তানের প্রথম দিকে এই উৎসব ক্রমেই গুরুত্ব হারাতে থাকে। ইসলামীমনারা এটাকে হিন্দুদের অনুষ্ঠান বলে প্রচার করায় বৈশাখী উৎসবে ভাটা পড়ে। কিন্তু ১৯৬০ সালের পর পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৪ সাল তথা ১৩৭১ বঙ্গাব্দে মহাসমারোহে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান সরকার দিনটিকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করে এবং ঢাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নজিরবিহীন জনসমাগম হতে থাকে। বাংলা একাডেমী, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, ছায়ানট, পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, নিক্কন ললিত কলা কেন্দ্র, সমাজ কল্যাণ কলেজ ছাত্র সংসদ, মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাত্র সংসদ, কলা ও সঙ্গীত সংসদ প্রভৃতি সংগঠন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে 'ঐকতান গোষ্ঠী'র অনুষ্ঠানে ভীড়ের চাপে কয়েকজন আহত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গোলযোগের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও অনুষ্ঠানগুলোতে ব্যাপক দর্শকের আগমনে অনেক পত্র-পত্রিকায় বিস্ময় প্রকাশ করা হয়।[৭২]

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধ বাঁধে। পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর সেক্টরে পূর্ব পাকিস্তানী জওয়ান বিশেষ করে বিমান ও স্থল বাহিনীর সদস্যদের নৈপুন্য ছিল আসলেই অপূর্ব। তাদের সাহস, রণকৌশল প্রতিটি পাকিস্তানী বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানীদের গর্বিত করে। এতদিন পশ্চিম পাকিস্তানী বিশেষতঃ পাঞ্জাবীরা পূর্ব পাকিস্তানীদের কাপুরুষ বলে অবজ্ঞা করত কিন্তু এবার তারা বুঝতে পারলো বাঙালীরা সাহসের দিক দিয়ে কারো চেয়ে কম নয়। পূর্ব পাকিস্তানী সৈনিকদের নৈপুন্য পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়, যা কিছু দিনের জন্য বাঙ্গালীদের মনে পাকিস্তানী জাতীয়তাবোধ গভীরভাবে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। অনেক লেখক-শিল্পী তাদের গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক ও গানে এই সংঘাতের নিন্দা করে 'জিহাদী চেতনা' জাগিয়ে তোলার প্রয়াস পায়। তারা ভারতীয়দের আগ্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে। রেডিও পাকিস্তান এসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সাম্প্রদায়িক

৭২. পাকিস্তান অবজারভার, ২ বৈশাখ, ১৩৭১ বাংলা।

www.pathagar.com

চেতনা জাগিয়ে তুলতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করে। সরকার লেখকদের এই স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনায় সন্তোষ প্রকাশ করে তা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী থেকে রেডিও পাকিস্তানের নতুন নির্দেশিকা গৃহীত হয় এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানী আদর্শ প্রতিফলনের নির্দেশ দেয়া হয়। প্রগতিশীল মুসলিম সমাজের শক্তি হিসেবে ইসলাম রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের দিশারী হিসেবে কুরআনকে তুলে ধরা, কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের প্রস্তুতি এবং মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তি তুলে ধরার জন্য রেডিওকে নির্দেশ দেয়া হয়।[৭৩] যুদ্ধের সময় রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এই নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকে।

কেন্দ্রীয় সরকারের আঞ্চলিক প্রকাশনা এবং তথ্য ও সম্প্রচার বিভাগ পুস্তিকা, প্রচারপত্র ও সিনেমা স্লাইড প্রকাশ করে। এসবে নগ্ন ভারতীয় হামলার অসারতা, জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানের দাবীর যৌক্তিকতা, পাকিস্তানের ওপর ভারতীয় হামলার ব্যাপারে বিশ্ব জনমত ইত্যাদি তুলে ধরা হয়। দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা এবং কোরআন ও হাদিসের বাণীও প্রচার করা হয়।

লেখক ও শিল্পীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাও শুরু হয়। প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে ইসলামী চেতনা পুরোপুরি জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে গান, কবিতা ও সাহিত্যে ইসলামী দর্শণের পূর্ণ প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। 'ন্যাশনাল রাইটার্স ওয়ার ফ্রন্ট আব্দুল্লাহ একাডেমী' ও 'কো-অপারেটিভ রাইটার্স গিল্ড' গঠন করা হয় এবং এখান থেকে প্রথমবারের মতো বই ও মাসিক জার্নাল প্রকাশ করা হয়।[৭৪] জাতীয় উদ্দীপনামুলক গান ও কবিতা রচনার বিষয়টিও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।[৭৫]

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। ১৯৬৭ সালের ৭ অক্টোবর ঢাকাস্থ পাকিস্তান পরিষদের শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের চেতনা সংরক্ষণের উপায়-উপকরণ খুঁজে বের করতে এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। ১৭ অক্টোবর ইসলামিক একাডেমী 'জিহাদের তাৎপর্য ও তার বাস্তব প্রয়োগ'-এর মত বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। ডিসেম্বরে নিক্কন ললিতকলা একাডেমী 'কাশ্মীর' গীতি নাট্যটি মঞ্চস্থ করে। ১৯৬৬ সালের শেষ দিকে ইসলামিক একাডেমী এক বক্তৃতামালার আয়োজন করে। বক্তারা সবাই এ বিষয়ে একমত হন যে, পাকিস্তান আন্দোলনের মূল দর্শন ছিল ইংজেরদের অধীনতা ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি এবং ইসলামী নীতির ভিত্তিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবন গঠন করা। যুদ্ধের পর কতিপয় বাঙালী বুদ্ধিজীবীকে পশ্চিম রণাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তারা যুদ্ধের বাস্তব অনুভূতি সম্পর্কে চাক্ষুস অভিজ্ঞতা নিতে চেষ্টা করেন।[৭৬]

---

৭৩. মাসিক মাহে নও, জানুয়ারী ১৯৬৬ পৃঃ ৬৬।
৭৪. প্রাগুক্ত, নবেম্বর ১৯৬৬, পৃঃ ৩৮-৪০।
৭৫. প্রাগুক্ত, অক্টোবর, ১৯৬৬, পৃঃ ৭৭-৭৮।
৭৬. প্রাগুক্ত, মার্চ, ১৯৬৭, পৃঃ ১৪৩-৪৪।

www.pathagar.com

১৯৬৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড বিভিন্ন পুরস্কার প্রবর্তন করে। পাকিস্তানের জাতীয় বীর বা পাকিস্তানের সংহতি বিষয়ে বাংলা ও উর্দুতে লেখা বই এই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে কবি হাসান হাফিজুর রহমান প্রথম এই পুরস্কার লাভ করেন।

নজরুল একাডেমী ঃ প্রতিষ্ঠা ও তৎপরতা

নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার একটি উদ্যোগ ১৯৬৪ সালে নেয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু হয় ১৯৬৭ সালে। মুসলিম রেনেসাঁর পথিকৃৎ হিসেবে নজরুলের ভূমিকাকে চিরস্মরণীয় করার জন্য তিনটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। পাকিস্তানী দর্শনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সকল আধুনিক ও প্রগতিশীল আদর্শ আত্মস্থ করা এবং মুসলিম ঐতিহ্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানী সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা। একাডেমীর কর্মসূচীর মধ্যে ছিল কবির সাহিত্য ও কবিতা প্রচার, বাঙালী মুসলমানদের নবজাগরণে তার অবদানের মূল্যায়ন করা এবং পাকিস্তান আন্দোলন ও ইসলামী সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। বিচারপতি আবদুল মওদুদ একাডেমীর কার্যকরী পরিষদের প্রথম সভাপতি, আবুল কালাম শামসুদ্দিন অন্যতম সহ-সভাপতি এবং কবি তালিম হোসেন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

১৯৬৮ সালের ২৪ মে একাডেমী উদ্বোধন করা হয় এবং দুদিন পর কবির স্মৃতি বিজড়িত দরিরামপুর গ্রামে তার জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।[৭৭] এই বছরের ১ জুলাই ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে হামদ্ ও নাতের এক জলসার আয়োজন করা হয়। জলসায় নজরুলের ১৮টি হামদ ও নাত পরিবেশন করা হয়। প্রধান অতিথি গভর্ণর আবদুল মোনেম খান ইসলামী দর্শনকে[৭৮] তুলে ধরার জন্য তরুণদের প্রতি আহবান জানান।

চারমাস পর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমানে শেরাটন হোটেল) প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সম্মানে নাচ-গান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের বক্তব্য ছিলো নজরুল প্রদর্শিত আলোকবর্তিকা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে বিভ্রান্ত মুসলমানরা জীবনের যাবতীয় কুসংস্কার, নৈরাজ্য ও কাপুরুষতা থেকে মুক্ত হয়ে শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হতে পারে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে একটি গানের মাধ্যমে নবজাগরণের[৭৯] চেতনা সঞ্চার করার চেষ্টা করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে পাকিস্তানে একটি নতুন জাতি, সংস্কৃতি ও ভাষা তৈরী করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

---

৭৭. নজরুল একাডেমী পত্রিকা, ১ বর্ষ সংখ্যা গ্রীষ্ম, ১৩৭৬ বাংলা।

৭৮. দৈনিক পাকিস্তান ২ জুলাই, ১৯৬৭।

৭৯. মাসিক মাহে নও, কার্তিক ১৩৭৬ বাংলা, পৃঃ ৮১-৮২।

www.pathagar.com

এই একাডেমীর তৎপরতা আর এগুতে পারেনি। গণ অভ্যুত্থানের সময় একাডেমীর কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়।

রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে বিতর্ক

১৯৬৭ সালের জুনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশনে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে পূর্ব-বাংলার সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ নিয়ে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। ক্রমান্বয়ে এই বিতর্ক জাতীয় পরিষদের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে অনেক তিক্ততা সৃষ্টি হয়।

২০ জুন সরকারী দলের নেতা খান এ সবুর বলেন, "সম্প্রতি তিনি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছেন যে পহেলা বৈশাখ ও রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপনের নামে বিভাগ-পূর্ববর্তী পূর্ববাংলার সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত করার অশুভ তৎপরতা চলছে। বিদেশী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ইসলামী আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের ভিত্তিমূলে আঘাত হানার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ভারতে সাধারণ নির্বাচনের পর এই ধরনের তৎপরতা আশংকাজনক ভাবে বেড়ে গেছে। বিষয়টির দিকে যথাযথ মনযোগ না দেয়া হলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।"[৮০]

২২ জুন পরিষদের একজন সদস্য তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীনের কাছ থেকে জানতে পারেন যে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে সপ্তাহে দুইবার রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার করা হয়। এসময় পরিষদের সদস্য মোখলেসুজ্জামান জানতে চান, যেখানে পরিষদের নেতা রবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন সেখানে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার করা হয় কেন? জবাবে মন্ত্রী বলেন তিনি সদস্যদের মনোভাব সম্পর্কে সচেতন এবং এজন্য ভবিষ্যতে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচারের সময় আরো কমিয়ে দেবেন। বিরোধীদলীয় সদস্য ডঃ আলীম আল রাজীর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি আরো বলেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারের সময় ইতোমধ্যে কমিয়ে ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে এবং কবির যেসব গ্রন্থ পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী তা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হবে।[৮১]

এই ঘোষণা বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ঘোষণার পক্ষে-বিপক্ষে বিবৃতি শুরু হলে প্রসঙ্গটি আবার পরিষদে উত্থাপিত হয়। ২৭ জুনের অধিবেশনে ইউসুফ আলী এ সম্পর্কিত বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন এই নীতি অনুসরণ করা হলে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। ৬ কোটি বাঙালীর রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি, যা যুগ-যুগান্তর ধরে লালিত হয়ে এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে,

---

৮০. National Assembly of Pakistan Debates, Official Report,4th July 1967 P. 2663.

৮১. প্রাগুক্ত, ২২ জুন ১৯৭৬, পৃঃ-১৯৪০।

www.pathagar.com

জোরপূর্বক এই সংস্কৃতি ধ্বংস করে নতুন সংস্কৃতি চালু করার চেষ্টা করা হলে তা হবে সমগ্র জাতির জন্য আত্মঘাতী। তিনি সাংস্কৃতিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করার আহ্বান জানান।[৮২]

বিতর্কে সরকারী দলের কয়েকজন সদস্য অংশ নেন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা পাঠ করে তারা দেখানোর চেষ্টা করেন যে কবি রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের নিকৃষ্ট শ্রেণী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তাই তিনি পাকিস্তানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারেন না। এ সময় বিরোধী দলীয় সদস্য এ. কে. সোলায়মান এই ঘোষণা নিয়ে ঢাকায় আসার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করলে পরিষদে এক বিশৃংখল দৃশ্যের অবতারণা হয়।

বাজেট অধিবেশনের সমাপনী বক্তৃতায় খান এ সবুর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন মুসলিম সুলতান বিশেষ করে সুলতান হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে। সে সময় বাংলা ভাষায় বহু আরবী-ফার্সি শব্দ ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে বিদ্যাসাগর, মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টায় বাংলাকে সংস্কৃতায়ন করা হয। খান এ সবুর এই পরিবর্তনকে দুঃখজনক বলে উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন যে, "যারা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ওকালতি করছে সে সব নির্বোধের চিৎকারে তার কোন মহানুভূতি নেই।"[৮৩]

খাজা শাহাবুদ্দীনের ঘোষণার সমর্থনে দুই বা তিনটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তার একটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন শিক্ষক এবং দ্বিতীয়টিতে চল্লিশজন সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি স্বাক্ষর করেন। তাদের কয়েকজন হচ্ছেন– এম, বরকতুল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, ইব্রাহীম খাঁ, কবি তালিম হোসেন, কবি ফররুখ আহমদ, হাসান জামান এবং মুজিবুর রহমান খাঁ প্রমুখ।[৮৪] এছাড়াও সেখানে ত্রিশ জন মাওলানাও ছিলেন। চল্লিশ জন গায়ক অপর একটি বিবৃতি দেন।[৮৫]

কিন্তু সরকারী ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল সার্বজনীন ও জোড়ালো। প্রথম প্রতিবাদ লিপিতে উনিশ জন বুদ্ধিজীবী স্বাক্ষর করেন। তারা সরকারের সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত দুঃখজনক বলে উল্লেখ করেন।[৮৬] মাওলানা ভাসানী ছাড়াও ঢাকার এগার জন উর্দু কবি, তিনটি উর্দু প্রতিষ্ঠান, খুলনার সতের জন বুদ্ধিজীবী সরকারের এই নীতির বিরোধিতা করেন। অন্যান্য সংগঠনও এই নীতির বিরোধিতা করে– যেমন ক্রান্তি,

৮২. প্রাগুক্ত, ২৭ জুন, ১৯৬৭, পৃঃ ২২৩৮।
৮৩. প্রাগুক্ত, ২৯ জুন, ১৯৬৭, পৃঃ ২৩৮১-৮৩।
৮৪. আজাদ, ৩০ জুন, ১৯৬৭।
৮৫. প্রাগুক্ত, ১ জুলাই, ১৯৬৭।
৮৬. প্রাগুক্ত, ২৮ জুন, ১৯৬৭।

www.pathagar.com

ছায়ানট, সৃজনী, অপূর্ব সংসদ প্রতিষ্ঠান ও ঐকতান, সংস্কৃতি সংসদ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ), আমরা কয়জনা, বাংলা ভাষা সংগ্রাম পরিষদ, বাণীচক্র, পূরবী এবং খুলনার ১৪টি সাংস্কৃতিক সংগঠন। তাদের সবাই রবীন্দ্র সাহিত্যকে বাঙালী ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবী করে।[৮৭]

প্রতিবাদ লিপির পাশাপাশি প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) প্রতিবাদ সভা ও মিছিলের আয়োজন করে। কবি জসিমুদ্দীনের বাসবভনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হয়। পরদিন ঢাকা প্রেস ক্লাবে ক্রান্তি ও সমমনা লোকদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা দাবী করেন যে রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুষ্ঠান ও পহেলা বৈশাখ বাঙ্গালী সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা ব্যাখ্যা করেন যে, ভূগোল ও ইতিহাসই সংস্কৃতি নির্ধারণ করে। তারা হুশিয়ার করে দেন যে, বাঙালী সংস্কৃতির ওপর আঘাত আসলে ১৯৫২ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। বেগম সুফিয়া কামাল এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। কুদরাত-ই-খোদার সভাপতিত্বে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অপর একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আবুল হাশিম ও বদরুদ্দিন ওমর এতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তারা বলেন, সংস্কৃতির ওপর আঘাতের অর্থ হচ্ছে রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর আঘাত হানা। তারা বলেন, সরকার পাকিস্তানের সংহতির নামে অব্যাহতভাবে এই আঘাত করে যাচ্ছেন। তারা আরো বলেন পাকিস্তান একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। সভাশেষে কুদরাত-ই-খোদাকে সভাপতি করে 'সাংস্কৃতিক অধিকার পরিষদ' গঠিত হয়। খুলনায়ও একই ধরনের সাংস্কৃতিক অধিকার পরিষদ গঠিত হয়।[৮৮]

পূর্ব বাংলায় আন্দোলন দ্রুত বিস্তারে সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ৪ জুলাই তথ্যমন্ত্রী জাতীয় পরিষদে এক বিবৃতি দিয়ে পূর্ববর্তী ঘোষণা প্রত্যাহার করেন। আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন সংবাদ মাধ্যমে তার বিবৃতিকে বিকৃত করা হয়েছে। সব রবীন্দ্র সঙ্গীত আদর্শের দিক থেকে পাকিস্তান বিরোধী এমন কথা তিনি কখনো বলেননি। তিনি শুধু একজন উর্দু কবির বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের কোন গান যদি পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী হয় তাহলে সেটা পাকিস্তান রেডিওতে প্রচার করা হবে না।[৮৯]

---

৮৭. The Pakistan Observer,25th June to 4th July, 1967.

৮৮. The Pakistan Observer, 2nd July to 13th July, 1967.

৮৯. National Assembly of Paksitan Debates, Official Report, 4th July, 1967, P. 2663.

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা সংস্কার এবং জাতীয় ভাষা প্রণয়নের উদ্যোগ ঃ

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎপরতা

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর প্রস্তাবক্রমে পরিষদ প্রস্তাবের পর পরই বাংলা ভাষা সংস্কার এবং জাতীয় ভাষা প্রণয়নের কাজ শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রারের কাছে তিনি বাংলা ভাষা বর্ণমালা ও বানান সংস্কারের জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত কলেজ সমূহকে সংশোধিত বাংলা গ্রহণের নির্দেশ দেয়ার প্রস্তাব দেন।[৯০]

একাডেমিক কাউন্সিল সেই অনুযায়ী ১৯৬৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী মুহাম্মদ শহীদুল্লাহকে সভাপতি এবং ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদকে সম্পাদক করে একটি সাব-কমিটি গঠন করে। সাব-কমিটির সুপারিশমালা গৃহীত হয়। এম, এনামুল হক, এম, আব্দুল হাই এবং মুনির চৌধুরী ভিন্নমত প্রকাশ করেন। ১৯৬৮ সালের ৩ আগষ্ট একাডেমিক কাউন্সিলের অধিবেশনে সুপারিশমালা গৃহীত হয়। এইবারও আবদুল হাই ও কবীর চৌধুরী তার বিরোধিতা করেন। 'ক্ষ' এর পরিবর্তে 'খ্য' লেখা ছাড়া সাব-কমিটির বাকি সুপারিশ ছিল বাংলা একাডেমীর অনুরূপ। একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্যে কাজী দীন মোহাম্মদকে আহ্বায়ক করে একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়।[৯১]

পত্রিকায় এ খবর প্রকাশিত হলে দরুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। একদিকে বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানমনা বুদ্ধিজীবী তার সমর্থনে এগিয়ে আসে। আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আবুল মনসুর আহমদ, ইব্রাহীম খাঁ, আবুল কাসেম, কবি তালিম হোসেনসহ প্রায় ৫৮ জন এর সমর্থনে বিবৃতি দেন। এর সমর্থনে ২৫ জনের আরো একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়, যাদের অধিকাংশই ঢাকা কলেজের অধ্যাপক। অন্যদিকে বিরোধিতাও বাড়তে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) উদ্যোগে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি প্রতিবাদ মিছিল ঢাকার কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ করে। ৪১ জন বুদ্ধিজীবী বাংলা অক্ষর পরিবর্তনের প্রতিবাদ জানিয়ে যুক্তি দেখান যে এর ফলে বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলা দেখা দিবে। এ ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তান 'নীহারিকা সংসদ' এবং 'ভৈরব সংস্কৃতিক সংসদ'ও প্রতিবাদ জানায়। আওয়ামী লীগ নেতা মাওলানা তর্কবাগীশও এই উদ্যোগের প্রতিবাদ জানান। বিভিন্ন পত্রিকায় এই প্রস্তাবের ত্রুটি নির্দেশ করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

---

৯০. Dhaka University Registrar Office. General Section SL. No. 1A. File No 26/2-12 (66-67) Collection No 26/C.

৯১. একাডেমিক কাউন্সিরেল সভার কার্যবিবরণী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ০৩.০৮.৬৮ তারিখে অনুষ্ঠিত।

www.pathagar.com

খ. আবার রোমান অক্ষর প্রসঙ্গ

১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে রোমান বর্ণমলার পক্ষে তুমুল প্রচারণা চলতে থাকে। ১৮ ফেব্রুয়ারী পশ্চিম পাকিস্তানের হাজরা জেলায় অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রেসিডেন্টের পুত্র গওহর আইয়ুব পাকিস্তানের বৃহত্তর সংহতির স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানে বাধ্যতামূলক উর্দু এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বাধ্যতামূলক বাংলা শিক্ষার সুপারিশ করেন। ২৭ তারিখে পাকিস্তান অবজারভারে লেখা এক চিঠির মারফত তিনি বাঙালীদের কাছে এই প্রস্তাব পেশ করেন। ২ মার্চ এ আর এইচ এনামুল হক নামক এক প্রকৌশলী আরেকটি চিঠিতে রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব দেন। পরের দিন মুমিনুল হক নামক এক চিকিৎসক 'বাংলার জন্য রোমান হরফ' নামক এক প্রবন্ধে একই ধরনের প্রস্তাব দেন। ২২ মার্চ প্রকৌশলী এনামুল হক আরেকটি চিঠিতে উর্দুও রোমান হরফে লেখার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। এই চিঠির পরপরই বেশ কিছু চিঠি প্রকাশিত হয়। সবগুলিতে রোমান হরফ চালুর বিরোধিতা করা হয়। এসব চিঠির কোন কোন লেখক মন্তব্য করেন যে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষার হরফ বদল করে সংহতি অর্জন করা যাবে না। তারা এজন্য সৎ ও আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

গ. পাকিস্তানী ভাষা প্রণয়নের জন্য পুনরায় প্রেসিডেন্টের সুপারিশ

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তার ক্ষমতা গ্রহণের এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর পুনরায় একটি পাকিস্তানী ভাষা প্রণয়নের কথা বলতে শুরু করেন। ১৯৬৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকার নজরুল একাডেমীতে এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষার সমন্বয়ে একটি পাকিস্তানী ভাষা নির্মাণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যেহেতু পাকিস্তান ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র এবং একই ধরনের একটি সংস্কৃতিও রয়েছে তাই এই কাজ কঠিন হবে না। কয়েকদিন পর আন্তঃ প্রাদেশিক ছাত্র সংসদের বার্ষিক সাময়িকীতে প্রদত্ত এক শুভেচ্ছা বাণীতেও তিনি একই অভিমত ব্যক্ত করেন। অক্টোবরের মাসিক বাণীতে তিনি এ ব্যাপারে তার অভিমত সবিস্তারে তুলে ধরেন।[৯২]

পূর্ব বাংলায় তার তীব্র ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রথমে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিবাদে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট এক ভাষা, এক সংস্কৃতি ও এক ধর্মের শ্লোগান তুলে বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মের লোকদের জাতিসত্তা নির্মূল করার কৌশল গ্রহণ করেছেন।[৯৩]

নূরুল আমিন ও মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ বলেন আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতি ইসলাম পরিপন্থী নয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ প্রতিবাদ গড়ে তোলে

---

৯২. দৈনিক আজাদ, ৩ অক্টোবর, ১৯৬৮।

৯৩. প্রাগুক্ত, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮।

www.pathagar.com

এবং দৈনিক আজাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের নিন্দা জানানো হয়।[৯৪] মাওলানা ভাসানী তাঁর বিবৃতিতে বলেন এটা হচ্ছে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র। আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটি সরকারের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে এই প্রয়াসকে জাতীয় ভাষা নির্মাণের ধুঁয়া তুলে রাষ্ট্রীয় সংহতি বিনষ্ট করার পাঁয়তারা বলে মন্তব্য করে। পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মস্কো) এ সম্পর্কিত এক প্রস্তাবে বলা হয়, ভাষা বিরোধ পাকিস্তানের সংহতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। নারায়ণগঞ্জ মোখতার আইনজীবী পরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা ঘোষণার দাবী জানায়। পাকিস্তান তমদ্দুনিক আন্দোলন রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে দায়িত্বহীন উক্তির নিন্দা করে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৯৫] শেষ পর্যন্ত সরকার এই পরিকল্পনা ত্যাগ করে।

রাইটার্স গিল্ড পূর্বাঞ্চলীয় শাখার তৎপরতা ঃ

১৯৬৮ সালে রাইটার্স গিল্ড পূর্বাঞ্চলীয় শাখার তৎপরতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এই বছরের দু'টি অনুষ্ঠান থেকে বুঝা যায় সে দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন অনেকদূর এগিয়ে গেছে। প্রথম অনুষ্ঠানটি ছিল মহাকবিদের স্মরণ সভা; আর দ্বিতীয়টি আফ্রো-এশীয় দেশসমূহের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ক. মহাকবিদের স্মরণ অনুষ্ঠান

১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে বাংলা ও উর্দু ভাষার পাঁচজন মহাকবি স্মরণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এরা হচ্ছেন– আল্লামা ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, মির্জা গালিব ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত। পাঁচ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পাঁচজন কবির মহাত্ম তুলে ধরা হয়। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা, কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত, মোশায়েরা ও নৃত্যনাট্য। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে এসব অনুষ্ঠান চলতো।

অনুষ্ঠানমালার প্রথম দিন ৫ জুলাই ছিল রবীন্দ্র দিবস। এদিনের সভাপতি ছিলেন ইসলামিক একাডেমীর পরিচালক আবুল হাশিম। কবি রবীন্দ্রনাথের ওপর আনিসুজ্জামান এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কর্মে বিভিন্ন চিন্তাধারা ও বিষয় বৈচিত্র্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের[৯৬] মহান নির্মাতা হিসেবে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সভাপতি তাঁর ভাষণে সরকার ও বিভিন্ন সরকারী সংস্থার রবীন্দ্রনাথ বিরোধী কর্মকান্ডের মূল উদ্দেশ্য তুলে ধরার চেষ্টা

৯৪. প্রাগুক্ত, ৩ অক্টোবর, ১৯৬৮।

৯৫. প্রাগুক্ত, ৩ থেকে ২১ অক্টোবর, ১৯৬৮।

৯৬ মাসিক পরিক্রম, মহাকবি স্মরনোৎসব সংখ্যা, জুলাই-আগষ্ট, ১৯৬৮, পৃঃ-৭।

www.pathagar.com

করেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে, এই বিদ্বেষ কোন উন্নত আদর্শ বা সাহিত্যের বিচার বিবেচনা থেকে উদ্ভূত নয় বরং এটা সাম্প্রদায়িক[৯৭] মনোভাবের ফসল।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিন উদযাপিত হয় যথাক্রমে ইকবাল, গালিব ও মধুসূদন দিবস হিসেবে। শেষ দিনে পূর্ব বাংলায় প্রথম বারের মত একটি হাসির নাটক মঞ্চস্থ। শেষ দিন নজরুল দিবস হিসেবে নির্ধারিত ছিল। রফিকুল ইসলাম নজরুলের ওপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেন যে এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক মুসলমান দেশ বিভাগের পূর্বে নজরুলকে সহজ ও উদারভাবে গ্রহণ করেনি। এমনকি পূর্ব বাংলায়ও এজন্য সংগঠিত উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।[৯৮]

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মহাকবিদের স্মরণ অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। বিরূপ পরিস্থিতির মুখেও প্রতিদিন অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম হত। ঢাকার সংস্কৃতিমনা নাগরিকরা প্রতি সন্ধ্যায় অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সাথে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। ঢাকার প্রায় সব পত্রিকা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানায়।[৯৯]

অনুষ্ঠানের ব্যাপক সাফল্যে প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানপন্থী মহল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারাও এই ক্ষোভ থেকে রক্ষা পাননি যদিও তারা ইকবাল এবং গালিবের উপরও আলোচনার আয়োজন করেন। এই মহলটি সন্দেহ ও আশংকামুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা এবং নজরুলকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণের দাবীকে গ্রহণ করতে পারেনি। বিশেষ করে আবুল হাশিমের বক্তৃতা তাদের জন্য সুখকর ছিল না। তাই তারা নোংরা ভাষায় প্রতিবাদ করে। সমালোচনায় নেতৃত্ব দেয় প্রাদেশিক গভর্ণর আবদুল মোনেম খান পরিচালিত দৈনিক পয়গাম। রবীন্দ্র দিবসের পরের দিন এই পত্রিকার এক দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে বলা হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গকে কবর দেয়া হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথকে পুনর্বাসনের জন্য এই রবীন্দ্র দিবস উদযাপন হচ্ছে ইসলামমনা পূর্ব পাকিস্তানীদের ওপর এক বেপরোয়া আঘাত। পাকিস্তানীদেরকে এ জন্য পাল্টা আঘাত হানার প্রস্তুতি নিতে হবে। নজরুল দিবস উদযাপিত হওয়ায় তাদের মর্মজ্বালার কারণও স্পষ্ট। দৈনিক পাকিস্তানে লেখা এক চিঠিতে জনৈক নজরুল ইসলাম আবুল হাশিমের ভাষণকে রাজনৈতিক চমক ও স্ববিরোধী বলে বর্ণনা করে।[১০০]

খ. অফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠান

এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামী জনগণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই অনুষ্ঠান

---

৯৭ প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৫৯।

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬।

৯৯. দৈনিক পাকিস্তান, ১১ জুলাই, ১৯৬৮।

১০০. প্রাগুক্ত, ১২ জুলাই, ১৯৬৮।

www.pathagar.com

১৯৬৮ সালের ২০ ও ২১ ডিসেম্বর ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে সম্পন্ন হয়। একে অফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠান নাম দেয়া হয়।

উদ্বোধনী পর্বে শ্বেত কপোত ও লাল সূর্যের সুসজ্জিত পটভূমিতে কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। মাও সে তুং, হো চি মিন এবং চীন-কেনিয়া-কঙ্গো-কোরিয়ার অনূদিত কবিতা আবৃত্তি করা হয়। পরে খুলনার 'সন্দীপন সঙ্গীত গোষ্ঠী' সাম্রাজ্যবাদ ও নব্য উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামী জনগণের সংগ্রামের ওপর গণসঙ্গীত পরিবেশন করে।[১০১]

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আহমদ শরীফ। হাসান আজিজুল হক ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাংবাদিক সফদার মীর প্রবন্ধ পাঠ করেন। হাসান আজিজুল হক তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, এই দুই মহাদেশের সাহিত্যের প্রধান ধারা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী। সভাপতি তার ভাষণে বলেন শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট জনগণের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণই হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণ সাধনের পূর্বশর্ত। তিনি এক্ষেত্রে লেখকদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন কারণ লেখকরা সাধারণত উন্নত আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বৈষয়িক স্বার্থের পেছনে দৌড়ে নিজেদের মর্যাদাহানি করেন না।[১০২]

দ্বিতীয় দিনে আফ্রো-এশীয় সাহিত্যের ধারা নিয়ে আলোচনা হয়। সাংবাদিক আহমেদ হুমায়ুন এ সম্পর্কিত তার নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে দেখান যে আফ্রো-এশীয় সাহিত্য জনগণের স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে সম্পূর্ণ নতুন মর্যাদা অর্জন করেছে। অনুষ্ঠানের সভাপতি সিকান্দর আবু জাফর আফ্রো-এশিয়ার নির্যাতিত জনগণের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শোষকদের দুর্গ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য পাকিস্তানের নিপীড়িত জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁর মতে কেবলমাত্র জনগণের আন্দোলনই ভীতির পরিবেশ পাল্টে দিতে পারে এবং তখনই লেখকরা গণমানুষের সাহিত্য সৃষ্টির সাহস পাবে।[১০৩] অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চীনা মিলনান্তক নাটকের বাংলা সংস্করণ 'শ্বেতকেশী বালিকা' মঞ্চস্থ হয়। নাটকের মূল বিষয়বস্তু ছিল প্রাচীন সামন্তবাদী সমাজ কাঠামো মানুষের প্রেতাত্মা তৈরী করেছে আর নতুন সমাজ কাঠামো প্রেতাত্মাকে মানুষে পরিণত করেছে।[১০৪] অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা সাংস্কৃতিক দিক থেকে খাঁটি মার্কসবাদী ছিলেন। তারা সুকান্তের জন্মবার্ষিকী পালন করেন এবং ব্যাপক ভিত্তিক গণসঙ্গীত ও নাটকের আয়োজন করেন।

---

১০১. প্রাগুক্ত, ২৮ অক্টোবর, ১৯৬৮।

১০২. মাসিক পরিক্রম সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃঃ-২১৭।

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১০।

১০৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১০-১১।

www.pathagar.com

নবরূপে ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকন্সট্রাকশন

১৯৬৯ সালের গনঅভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পতন ঘটে। তার উত্তরসূরী প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের প্রধান লক্ষ্য ছিল জীবনের সর্বস্তরে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে পাকিস্তানকে অক্ষত রাখা। এই উদ্দেশ্যে তিনি ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকন্সট্রাকশনকে সংস্কার করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণার পরপরই এই সংস্থা গঠন করেন। উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্য এক জাতি, একধর্ম, এক ভাষা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলা। শুরু থেকেই এই সংস্থা ধর্মকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে, কিন্তু জনমনে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারেনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক হাসান জামানকে সংস্থার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যদিও তাকে নতুন কোন দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়নি তথাপি তিনি দুটি লক্ষ্য স্থির করেন– সাম্প্রদায়িক, রক্ষণশীল ও বাংলা ভাষা বিরোধী গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশ করা এবং সেগুলি অর্ধশিক্ষিত লোকদের মধ্যে বিলি করা। হাসান জামান সচেতনভাবে এই ধরনের বই লেখার দায়িত্ব এমন লেখকদের হাতে অর্পণ করেন যাদের ক্ষেত্রে 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্কর' প্রবাদটি প্রযোজ্য। দ্বিতীয়ত, তিনি সতর্কভাবে দেশের প্রখ্যাত লেখকদেরকে ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরে উন্নত মানের ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধ বিষয়ক বই লেখার অনুরোধ জানান। এসব লেখককে পর্যাপ্ত সম্মানী দেয়া হয়। অনেক লেখক এই বৈষয়িক লোভ সামলাতে পারেননি। সাময়িকভাবে জামান তার পরিকল্পনায় সফল হন এবং বিপুল সংখ্যক নামী লেখকের মন জয় করতে সক্ষম হন।[১০৫] কিন্তু ১৯৭০ সালে অর্থাৎ স্বাধীনতা যুদ্ধের কয়েক মাস আগে ছাত্ররা তার দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করে দেয়।

বই বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে আন্দোলন

১৯৬৯ সালের শেষ দিকে কয়েকটি বইয়ের প্রকাশককে তাদের প্রকাশিত বইগুলি কেন নিষিদ্ধ করা হবে না মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়। বইগুলির মধ্যে ছিলো, 'দি সোশ্যাল হিস্ট্রি অব ইস্ট পাকিস্তান' লেখক কামরুদ্দিন আহমদ, 'দি ক্রাইসিস অব কালচার এন্ড কালচারাল কমিউনালিজম' লেখক বদরুদ্দিন ওমর, 'থার্টি ইয়ার্স ইন জেইল' লেখক ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, 'আলবেরুনী' লেখক সত্যেন সেন এবং 'নটরিয়াস এজ ট্রুথ' লেখক আবদুল মান্নান সৈয়দ। মাওলানা ভাসানীর লেখা একটি পুস্তিকার জন্যও একই ধরনের নোটিশ জারি করা হয়।

---

১০৫. Bureau of National Reconstruction in new Form-People's Opinion, 1970 (Dhaka : BNR July, 1970) PP. 20-21.

www.pathagar.com

সরকারের এই সিদ্ধান্তে সাংস্কৃতিক কর্মীরা চিন্তিত হয়ে পড়ে। ত্রিশজন বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতিতে সরকারের এই পদক্ষেপকে বিপজ্জনক বলে বর্ণনা করে দাবী করেন যে বাংলা সাহিত্যে উক্ত বইগুলোর মূল্যবান অবদান রয়েছে। কয়েকজন রাজনীতিক, শ্রমিক নেতা ও সাংবাদিক মাওলানা ভাসানীর লেখা পুস্তিকার জন্য নোটিশ জারির নিন্দা করে এই পদক্ষেপকে রাজনৈতিক দলের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক নীতিমালায় উদ্দেশ্যমূলক হস্তক্ষেপ বলে মন্তব্য করেন। 'সাম্প্রতিক গোষ্ঠীর' লেখকরা এই নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেগম সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন আবুল হাশিম। তিনি বলেন আমরা একই সাথে বাঙ্গালী, মুসলমান এবং পাকিস্তানী। আমাদের বাঙালীত্ব অপরিবর্তনীয়। তিনি আরো বলেন যে স্বাধীন চিন্তাকে উৎসাহিত করার মধ্যেই পাকিস্তানের সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব নিহিত এবং লেখকের স্বাধীনতায় দায়িত্বহীন হস্তক্ষেপের ফলে এই সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব বিপন্ন হতে পারে।[১০৬]

আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে 'লেখকদের অধিকার রক্ষা কমিটি' গঠিত হয়। ঢাকা শহরের বিশটি সাংস্কৃতিক সংগঠন কমিটিতে যোগ দেয়। সিকান্দর আবু জাফর, হাসান হাফিজুর রহমান এবং সৈয়দ আতিকুল্লাহ কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। কমিটি ঢাকায় কয়েকটি পথ সভা করে। আন্দোলনের সমর্থক সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পৃথক বিবৃতিতে মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপ্রতি) লেখকদের মৌলিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করা এবং তথ্য ও প্রকাশনা অধ্যাদেশ বাতিলের দাবী জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ জন শিক্ষক, ছাত্রশক্তির সভাপতি, ১২ জন চিত্রকর-শিল্পী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯২ জন শিক্ষক, ৩০ জন চলচ্চিত্র শিল্পী এবং গণ সাংস্কৃতিক সংঘ লেখকদের সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বিবৃতি দেয়। ১৩ জন প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্য ব্যক্তিত্ব খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস লিখিত 'ভাসানী যখন ইউরোপে' বইয়ের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী জানান। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সরকারী নীতির সমালোচনা করে।[১০৭]

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। ছাত্র নেতারা বাঙালী সংস্কৃতি, বাঙালী জাতি এবং মুক্ত চিন্তার ওপর হামলা থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। বাংলা ছাত্রলীগ, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন, ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন এই সভার আয়োজন করে।[১০৮] ১৯৭০ সালের ১৫ জানুয়ারী বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে লেখকদের অধিকার

---

১০৬. দৈনিক পাকিস্তান, ৬ জানুয়ারী, ১৯৭০।

১০৭. প্রাগুক্ত, ২ থেকে ১৬ জানুয়ারী, ১৯৭০।

১০৮. প্রাগুক্ত, ১৫ জানুয়ারী, ১৯৭০।

www.pathagar.com

রক্ষা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় তথ্য ও প্রকাশনা অধ্যাদেশ বাতিল, সব বইয়ের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, সংস্কৃতির ওপর থেকে সব ধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার, রেডিও এবং টেলিভিশনকে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা, ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকন্সট্রাকশন-এর মাধ্যমে সংস্কৃতির ওপর গুপ্তচরবৃত্তি বন্ধ করা, পাকিস্তান কাউন্সিল ও পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিল-এর মাধ্যমে সংস্কৃতি ও সাহিত্যে হস্তক্ষেপ বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।[১০৯] আন্দোলনের মুখে সরকার দূরভিসন্ধিমূলক নীতি গ্রহণ করে এবং বাংলা একাডেমীর পরিচালক কবীর চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে বিভিন্ন বই পর্যালোচনার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে। কমিটিতে মোহাম্মদ এনামুল হক, কাজী দীন মোহাম্মদ, হাসান জামান এবং আশরাফ সিদ্দিকীও ছিলেন।

সরকারের কৌশল সফল হয়। আন্দোলনের তীব্রতা কমতে থাকে। কমিটি গঠনের বিরুদ্ধে সে সময় কোন চিঠি ছাপা হয়নি। তবে ১৯৭০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী দৈনিক পাকিস্তানের সংবাদ ফিচার হিসেবে একটি চিঠি ছাপা হয়। তাতে বলা হয় কোন মহৎ উদ্দেশ্যে কমিটি গঠিত হয়নি কেননা কমিটির শেষোক্ত তিন ব্যক্তি সর্বদা রবীন্দ্র বিরোধী তৎপরতায় জড়িত। তারা সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিকে সহযোগিতা করেন এবং বাঙালী সংস্কৃতির বিরোধিতা করে থাকেন।

পাকিস্তান ঃ দেশ ও কৃষ্টির বিরুদ্ধে আন্দোলন

এ সময় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের আদর্শ নিবিষ্ট করার জন্য পাঠ্য বইয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর এ আর মল্লিককে সভাপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সিরাজুল ইসলামকে সদস্য করে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। তারা 'পাকিস্তান ঃ দেশ ও কৃষ্টি' নামে দুই খন্ডের একটি বই রচনা করেন। ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড বইটি প্রকাশ করে এবং পরের বছর তা নবম ও দশম শ্রেণীতে পাঠ্য করা হয়।

বইয়ের প্রথম খন্ডে ভারতে মুসলিম জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি এবং পাকিস্তান অর্জনের মধ্য দিয়ে তার চূড়ান্ত বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয় খন্ডে প্রধানত পাকিস্তানী সংস্কৃতির ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং ভাষা, সাহিত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চারের প্রয়োজনীয়তা এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐক্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়।[১১০]

---

১০৯. প্রাগুক্ত, ১৬ জানুয়ারী, ১৯৭০।

১১০. পাকিস্তান ঃ দেশ ও কৃষ্টি, ২ খন্ড, পৃঃ ১-২।

www.pathagar.com

স্কুল-ছাত্ররা বইটি পাঠ্যসূচী থেকে প্রত্যাহারের জন্য সম্মিলিতভাবে আন্দোলন শুরু করে। দুটি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নেতৃত্বে এবং অপরটি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে। উভয় পরিষদ ১৯৭০ সালের আগষ্ট থেকে স্কুল ধর্মঘট, প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ শুরু করে এবং তা ১৭ সেপ্টেম্বর (শিক্ষা দিবস) পর্যন্ত চলে। ইতোমধ্যে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন এবং বাংলা ছাত্র ইউনিয়নও আন্দোলনে শরীক হয় এবং বইটি প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে ১৬ জন বুদ্ধিজীবী পত্রিকায় একটি বিবৃতি দেন।[১১১]

আন্দোলনের মুখে সরকার নমনীয় নীতি গ্রহণ করে। ২১ আগষ্ট এক প্রেসনোটে ঘোষণা করা হয় যে বইয়ের প্রথম খন্ডের একটি অংশ এবং পুরো দ্বিতীয় খন্ড ১৯৭১ সালের এস এস সি পরীক্ষার্থীদের জন্য বাদ দেয়া হবে আর ১৯৭২ সালের এস এস সি পরীক্ষার্থীদের জন্য বইটি ১০০ পৃষ্ঠার মধ্যে পুনরায় লেখা হবে। আন্দোলন তখনো চলছিল। সেপ্টেম্বরের পর আন্দোলন গতি হারিয়ে ফেলে এবং সবাই আসন্ন সাধারণ নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বাঙালীদের দমনের জন্য পাকিস্তানীদের শেষ চেষ্টা

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা দিয়ে নিষ্কৃতি পান। তিনি দ্বিতীয় বারের মত দেশে সামরিক আইন জারি করে শীঘ্রই দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান হবে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে ঘোষণা করেন।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস পূর্ব পাকিস্তানের সামুদ্রিক উপকূলে আঘাত হানে। এতে প্রায় ৫ লাখ লোকের প্রানহানি হয়। পাকিস্তান সরকার তখন সংকটের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারেনি। যদিও ১৯৭০ সালের ১৪ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান চীন থেকে ফেরার পথে ঢাকায় যাত্রাবিরতি করেন। তিনি বিমানে দুর্গত এলাকা সফর করেন, সামান্য কিছু সাহায্যের কথা ঘোষণা করেন এবং সংকট সামাল দেয়ার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়ে ১৯৭০ সালের ১৬ নভেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান।

এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মৃতদের দাফন করা এবং জীবিতদের রক্ষা করা ছিল বিরাট সমস্যা। বহির্বিশ্ব থেকে ত্রাণ সামগ্রী দ্রুত ঢাকায় এসে পৌঁছালেও পাকিস্তান সেনাবাহিনী দশ দিন ঘটনাস্থলে কোন পরিবহন বিমান বা

---

১১১. দৈনিক পাকিস্তান, ২৯ আগষ্ট, ১৯৭০।

www.pathagar.com

হেলিকপ্টার পাঠাতে পারেনি। অপ্রতুল আর্থিক ও সীমিত সম্পদ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান সরকার তেমন কিছু করতে পারেনি। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমেও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো ত্রাণ সাহায্যের আবেদন জানায় কিন্তু পাকিস্তান সরকার সাহায্যের জন্য আবেদন করার আগে প্রকৃত প্রয়োজনের পরিমাণ যাচাই করার মিথ্যা অজুহাতে সাহায্যের জন্য তাৎক্ষণিক কোন আবেদন জানায়নি। মোট কথা ইয়াহিয়া সরকার বিপর্যয়কে গুরুত্বহীন করা এবং ত্রাণ কাজে বাধা দেয়ার জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালায়।

এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বাঙালীদের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা এই ঘটনায় আরেকবার প্রমাণিত হয়। অবশেষে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৭১ সালের জানুয়ারীতে দেশব্যাপী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদীরা এই পরিস্থিতিতে বিপদ গোনে। রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনী শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বাঙালীদের মধ্যে বিভেদ থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানীরা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। জনগণের শাসন ব্যর্থ হলে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। সে অবস্থায় আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত নির্বাচনী বিজয় পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থের মূলে আঘাত হানে। নির্বাচনের ফলাফলে বিস্মিত ও হতাশ ক্ষমতাভোগী অভিজাতরা তাই পর্দার অন্তরালে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের ইন্ধন যোগাতে থাকে।

১৯৭১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় নতুন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। কিন্তু নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যক আসন অর্জনকারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জেড,এ ভুট্টো এ সময় সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের সাথে তার চূড়ান্ত বুঝাপড়া সেরে ফেলে এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার জন্য প্রেসিডেন্টকে ভীষণভাবে চাপ দিতে থাকে। প্রেসিডেন্ট ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। বাঙালীরা এই পদক্ষেপকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর পরিকল্পিত হামলা বলে বিবেচনা করে। উপায়ান্তর না দেখে শেখ মুজিব ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল এবং ৭ মার্চ জনসভার ডাক দেন।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খানের ঘোষণার পর পরই জনগণের হতাশা ও অসন্তোষ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ শুরু হয়। সশস্ত্র বাহিনী বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করলে তা সহিংস রূপ নেয়। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ থেকে আওয়ামী লীগ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে এবং তা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে। ঐদিন মাঝরাতে

www.pathagar.com

পাকিস্তানী সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনতার ওপর হামলা শুরু করে এবং এখান থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়।[১১২]

এভাবে আমরা দেখি যে ১৯৫৪ সাল থেকে পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানে মার্কিন প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়, পাক-মার্কিন মৈত্রী চুক্তি, সিয়াটো ও সেন্টো চুক্তির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পাকিস্তানে তাদের নিয়ন্ত্রণ সংহত করে। পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন যুক্তফ্রন্ট সরকার এসব চুক্তির তুমুল বিরোধিতা করে। পরিণতিতে তাদেরকে ক্ষমতা হারাতে হয়। পরবর্তীতে দমন ও কূটকৌশলের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্টকে বিভক্ত করা হয়। রাজনীতিতে আনা হয় বিশৃংখলা, হতাশা ও অনৈক্য। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নিজেদের ভিত্তি মজবুত করেছে। রকফেলার ফাউন্ডেশনের অর্থ সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমকালীন সাহিত্যের ওপর এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। রেনেসাঁ সোসাইটির প্রধান সদস্যরা 'রওনক' নামে একটি সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। তমদ্দুন মজলিস ও সমমনা সংগঠন সমূহের উদ্যোগে সিপাহী বিদ্রোহ বার্ষিকী পালিত হয়। এর পরপরই পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের জন্মস্থান বলে পরিচিত চট্টগ্রামে পাকিস্তানমনা সাহিত্য কর্মী ও শিল্পীদের এক বিশাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বক্তৃতা থেকে সম্মেলনের লক্ষ্য সম্পর্কে অনুমান করা যায়। কবি গোলাম মোস্তফা বলেন বাংলা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ভান্ডার থেকে সৃষ্ট নয়। বাংলা প্রধানত দ্রাবিড় ও সেমিটিক ভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যের লক্ষ্য অবশ্যই হতে হবে 'পাকিস্তানীবাদ'। অধ্যক্ষ এম আজরফের পরিকল্পনা ছিল সংস্কৃতিকে পুনর্গঠন করার জন্য বাংলা ভাষাকে ফার্সির মত আরবীতে রূপান্তরিত করা। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি আবদুর রহমান ঘোষণা করেন, "আমি এখন আর বাঙালী নই, আমি একজন পাকিস্তানী।"

এই সময় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট শক্তি সংস্কৃতির ওপর হামলার বিরুদ্ধে কোন কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। ১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত কাগমারী সম্মেলনে তারা নিজেরাই বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শক্তি পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে একটি সমঝোতায় পৌছে। পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়। দুই প্রদেশের সমতার ভিত্তিতে পাকিস্তানে ইসলামী সংবিধান রচিত হয়। প্রশাসনসহ জাতীয় জীবনে বাংলা ও উর্দু

---

১১২. A. M. A. Muhith, Bangladesh : Emergence of a Nation (Bangladesh Books International Ltd. Dhaka, 1978).
Mohammed Ayub & K. Subrahmanyam, The Liberation war (S. Chand & Co. Pvt.) Ltd. Delhi, 1972.

www.pathagar.com

সমান মর্যাদা লাভ করে এবং বাংলা সাহিত্যে পাক-বাংলা মনোভাব অনেকাংশে এগিয়ে যায়। এভাবে পূর্ব-বাংলার সংস্কৃতি চিন্তায় পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়।

কিন্তু সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে পাক-বাংলা আদর্শের প্রভাব স্থায়ী হতে পারেনি। ১৯৫৮ সালের শেষ দিকে দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান রাজনীতি ও সংস্কৃতির ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রয়াস চালান। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সূচিত আদর্শের লক্ষ্য ছিল এক ভাষা, এক জাতি, এক ধর্ম, এক সংস্কৃতি এবং এক আদর্শ তথা পাকিস্তানের আদর্শভিত্তিক সাহিত্য রচনা করা। সব লেখককে একক নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়াস চালানো হয়। তাদের প্রতি যে নির্দেশ ছিল তা আইয়ুবের ভাষায়, 'আধুনিক মন, চিন্তা ও ভাষায় ইসলামের আদর্শ প্রচার করা।' ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা ও উর্দুর সমন্বয়ে রোমান হরফে একটি পাকিস্তানী ভাষা উদ্ভাবনের চেষ্টা চালানো হয়। বাঙালী সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী কর্মীরা এসব কর্মকান্ডে শংকিত হয়ে ওঠে। ফলে প্রতিবাদ ও বিরোধিতাও আসন্ন হয়ে ওঠে। ১৯৬১ সালে রবীঠাকুরের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপনকালে এই বিরোধিতা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যায়। সমগ্র প্রদেশে প্রায় দু'মাস ধরে এই অনুষ্ঠান চলে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে জনপ্রিয় করার জন্য 'ছায়ানট' প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় পহেলা বৈশাখ, ২৫ বৈশাখ, ১১ জ্যৈষ্ঠসহ অন্যান্য দিবস পালিত হয়। এসব অনুষ্ঠান জাতীয় রূপ লাভ করে। শহর এলাকায় যাত্রা পালা চালু হয়, লোক সাহিত্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়, এবং লোককথা ভিত্তিক চলচ্চিত্র 'রূপবান' অবিশ্বাস্য বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জন করে।

সাহিত্যের সঠিক উপাদানের জন্য লেখকরা পল্লী জীবনের দিকে নজর দেন। স্থান, দোকান-পাট ও ছেলেমেয়েদের নামকরণে বাংলা শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। বলাকা, মধুমিতা, হংস, জোনাকি ধরনের নামকরণ করা হয় সিনেমা হলের এবং বনানী, উত্তরা, শ্যামলী, বারিধারা ধরনের নাম রাখা হয় উপশহরের। দোকানের নাম রাখা হয় সাগরিকা, সাগর থেকে ফেরা, সাগর সম্ভার ইত্যাদি ইত্যাদি।[১১৩]

১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধের ফলে বাঙালীদের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য পাকিস্তানীবাদের চেতনা জাগে। এসময় সঙ্গীত, কবিতা ও নৃত্য নাট্যের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা, ভারত বিরোধী মনোভাব ও জিহাদের চেতনা সৃষ্টির প্রয়াস চালানো

---

১১৩. সে সময়ের বহুল শ্রুত গান ছিল ঃ
'আবার তোরা মানুষ হ,
অনুকরণ খোলস ভেদী কায়োমনে বাঙ্গালী হ,
আবার তোরা মানুষ হ'।

www.pathagar.com

হয়। ইসলামী আদর্শ প্রচারের জন্য রাইটার্স গিল্ড '৬ সেপ্টেম্বর' পুরস্কার চালু করে। জেহাদী গান প্রকাশ করা হয়।[১১৪] 'নজরুল একাডেমী' নজরুল ইসলামকে ইসলামের কবি হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। ১৯৬৭ সালে রেডিও পাকিস্তানকে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়।

ফলে আবার প্রতিবাদ ওঠে। এবারের প্রতিবাদ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, সার্বজনীন ও সংগ্রামী চেতনাদীপ্ত। ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল ও কৃষক সংগঠনসমূহ সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ জানায়।

সুতরাং ষাটের দশকের সূচনা থেকেই বাঙালী জাগরণ ও আত্ম আবিষ্কারের সূত্রপাত ঘটে। ক্রমশ তা বিস্তৃত ও শাণিত হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়ারা এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে কমিউনিস্টরা তাদের সাথে আপোস রফায় উপনীত হয়। বাম চিন্তাধারাও শক্তিশালী হতে শুরু করে। সুকান্তের কবিতাবলী অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। গণসঙ্গীত ও গণনাট্য চালু করা হয়, কমিউনিস্ট কবিদের কবিতার অনুবাদ শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ইয়াহিয়া খানের সামরিক আইনের সময় সাহিত্যের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে লেখক ও শিল্পীরা শহীদ মিনারের পাদদেশে সমবেত হয়ে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য অব্যাহত সংগ্রাম এবং নিজেদেরকে বাঙালী হিসেবে পরিচয় দেয়ার শপথ গ্রহণ করেন।

---

১১৪ গীতি কবিতা ঃ চির দুর্জয়, জেহাদের গান, চির উন্নত শির।

www.pathagar.com

উপসংহার

প্রায় ত্রিশ বছর আগে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তার স্মৃতিকথা 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম'-এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "জিন্নাহ এবং তার অনুসারীরা মনে হয় উপলব্ধি করেননি যে ভূগোল তাদের বিপক্ষে। .....দুই অঞ্চলের (পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তান) মধ্যে কোন ক্ষেত্রেই বাস্তব যোযাযোগ নেই। একমাত্র ধর্ম ছাড়া দুই অঞ্চলের জনগণ সবদিক দিয়ে পরস্পর থেকে ভিন্ন। ধর্মীয় সাদৃশ্য ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিকভাবে পৃথক বিভিন্ন অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে এমন কথা বলা জনগণের সাথে একটি বড় ধরনের প্রতারণার শামিল। ....পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান তাদের সব পার্থক্য দূরীভূত করে একটি জাতি গঠন করবে এমন আশা কেউ করতে পারে না।"[১] এটা ছিল একটি রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী এবং তিনি পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে কতিপয় পার্থক্য চিহ্নিত করেন। তন্মধ্যে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার পেছনে ভাষা ও সংস্কৃতি শক্তিশালী কারণ হিসেবে কাজ করেছে। আমাদের গবেষণা মূলত এই ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে। বিশেষ করে পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তানে সংস্কৃতির সংঘাতই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এই সংঘাতকে বুঝতে গিয়ে আমাকে বাঙালী মুসলমানদের বিগত সময়ের রাষ্ট্রীয় চিন্তা-চেতনা বিশদভাবে অধ্যয়ন করতে হয়েছে।

(এক)

বাংলা সাহিত্যের বিকাশে মধ্যযুগের মুসলমান শাসক ও কবিদের অবদানের জন্য বাঙালী মুসলমানরা গর্ববোধ করে। কিন্তু ১৯ শতকে অবস্থা অনেকাংশে পাল্টে যায়। তখন মুসলমানদের মনোভাব এক ধরনের ছিল না। বাংলার মুসলমানদের তখন দুটি বিভাজন ছিল– আশরফ (উচ্চ শ্রেণী) এবং আতরফ (নিম্ন শ্রেণী)। তাদের মনোভাব ছিলো পরস্পর থেকে ভিন্ন। 'আশরফরা' সাধারণত বাইরে থেকে আসা, তাদের সংস্কৃতি বিদেশী। তারা নিজেদেরকে উঁচু স্তরের বলে দাবী করতো। পক্ষান্তরে ইসলাম গ্রহণকারী বাংলার আদিবাসীরা আতরফ হিসেবে পরিচিত। আশরফদের মুখের ভাষা ছিল উর্দু আর আতরফদের বাংলা। এখান থেকেই বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা প্রশ্নে বিরোধ দেখা

১. Maulana Abul Kalam Azad. India Wins Freedom : An Autobiographical Narrative. Bombay. 1959. P. 227

www.pathagar.com

দেয় এবং তা বর্তমান শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ দশক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বস্তুত উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষার মর্যাদার বিষয়টি নিয়ে বাঙালী মুসলিম পত্র-পত্রিকায় বারবার উত্তপ্ত আলোচনা হয়। উর্দু সমর্থকরা শুধু বাঙালীদের স্বার্থবিরোধী ছিলনা তারা নিজেদেরকে উঁচু মর্যাদার অধিকারী বহিরাগত বলে জাহির করতো। ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্য ছিল বাংলার প্রতি তাদের ভালবাসার চাইতে অনেক বেশী।

অন্যদিকে বাংলার বিপুল সংখ্যক মুসলমানের তেমন কোন ইংরেজী বা বাংলা শিক্ষা ছিলনা। এর প্রধান কারণ দারিদ্র্য। অবশ্য তাদের মধ্যে বাংলা ভাষার অনুরাগী কেউ কেউ মক্তবে যৎকিঞ্চিত বাংলা শিখে দোভাষী পুঁথি রচনা করতো। এসব মক্তবে প্রাথমিক পর্যায়ের বাংলা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। নতুন শতাব্দীর সূচনায় কোন কোন লেখক প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এটা ঠিক তথাপি বাংলার মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায় সামগ্রিকভাবে হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ে। এসব মুসলমান লেখক নিজেদের একটি ছোট ভুবন তৈরী করে নিয়েছিলেন যেখানে প্রকৃতপক্ষে আরবীর তেমন প্রভাব ছিলনা এবং তাদের প্রবণতাও তেমন ইসলামমুখী ছিল না। কিন্তু সেটা ছিল এক স্বপ্নপুরী, যেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ একটি গোষ্ঠী আশ্রয়ের সন্ধান পায় এবং মানসিকভাবে স্বস্তিবোধ করতে থাকে।

(দুই)

উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আধুনিক ভারতের ভাষা ও সাহিত্যে অত্যন্ত উন্নত মানসম্পন্ন বলে বিবেচিত হতে থাকে। কিন্তু উদয় লগ্নে হিন্দু সাহিত্যিকদের ভূমিকার কারণে বাংলা সাহিত্যে প্রধানত হিন্দু জীবনচিত্রই ভেসে ওঠে। উনিশ শতকের কয়েক দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে এই রূপটিই ক্রমবর্ধমানভাবে ধরা পড়ে। সময়টা ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থান পর্বের। পক্ষান্তরে মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠার আগ পর্যন্তও পৃথক সাম্প্রদায়িক পরিচিতির ব্যাপারে তারা সচেতন ছিল । তৎকালীন হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের লেখায় এই বিরোধ স্পষ্ট ধরা পড়ে।

এই বিরোধের ফলে মুসলমানরা নিজেদের পরিচিতিকে বিশ্বব্যাপী মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে এবং তারা আরবী ভাষার সাথে সান্নিধ্য গড়ে তুলে। কেননা ইসলাম ধর্ম ও ইসলামের বিভিন্ন ধারণা ও প্রত্যয় মূলত আরবীতেই প্রকাশ পেয়েছে। ফলে বাংলা ভাষার সাথে তাদের ব্যবধান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

www.pathagar.com

(তিন)

বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বাঙালী সংস্কৃতির প্রতিনিধিরা দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে বিভক্ত ছিল এবং ধর্ম এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এই বছর লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয় যাতে বলা হয় শুধুমাত্র মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হবে। এই প্রস্তাবে বলা হয়নি যে রাষ্ট্রটি হবে ইসলামী বা তার নাম হবে পাকিস্তান। কিন্তু বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিকদের একটি অংশ সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে একটি নতুন বিষয়বস্তু সংযুক্ত করতে প্রয়াসী হন যা ছিল একান্তভাবে ইসলামী প্রকৃতির। এতে আংশিকভাবে পাকিস্তান আন্দোলনের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৪২ সালে কলকাতায় ইষ্ট পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি এবং ঢাকায় ইষ্ট পাকিস্তান লিটারারি অর্গানাইজেশন নামে দুটি সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সোসাইটির লক্ষ্য ছিল জাতীয় রেনেসাঁকে ত্বরান্বিত করতে পাকিস্তানের ধারণাকে সাহিত্যে রূপ দেয়া, এই ধারণার বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক নিয়ে সেমিনার আয়োজন এবং সাহিত্যে পাকিস্তান বিরোধী মনোভাবকে প্রত্যাখান করা। পক্ষান্তরে এই সংগঠন পুঁথি সাহিত্যকে অধিকতর বিশুদ্ধ করা এবং তাকে ইসলামী সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করার জন্য ইসলামী ঐতিহ্য থেকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং সাহিত্যে পল্লী জীবনকে আরো বেশী প্রতিফলিত করার নীতি গ্রহণ করে। এই গ্রুপ বেশী লোকের সমর্থন পায়নি সত্য কিন্তু তারা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা সংযোজন করতে পেরেছিল।

(চার)

বঙ্গ বিভাগের পরপরই পূর্ব বাংলার মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা একটি জটিল প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব খোঁজার তীব্র প্রয়োজন অনুভব করেন। প্রশ্নটি ছিলো ভাষা ও সংস্কৃতিতে পশ্চিমবঙ্গের সাথে পূর্ব বাংলা কতখানি সম্পর্ক রক্ষা করবে। অন্যদিকে কট্টর পাকিস্তানপন্থীরা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে কতখানি গ্রহণ করবে তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলো। এভাবে পূর্ব বাংলার সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি দেখা দেয় এবং বিভিন্নমুখী চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়। একটি ধারায় বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং অমুসলিম লেখকদের অবদানকে খাট করে দেখা কিংবা উপেক্ষা করার প্রবণতা দেখা দেয়। দ্বিতীয় ধারায় এই অভিমত দেয়া হয় যে, বাংলা ভাষা আর্য-পূর্ববর্তী সময়ে প্রচলিত দ্রাবিড় ভান্ডার থেকে এসেছে সুতরাং সংস্কৃত বা আর্য ঐতিহ্যের সাথে বাংলার কোন সম্পর্ক নেই। শেষোক্ত চিন্তার ধারকরা বাংলার সাংস্কৃতিক

www.pathagar.com

জীবন ধারা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে সচেতন ছিলেন যে যুগ-যুগান্তর ধরে প্রধান দুই সম্প্রদায়ের অবদানে আবহমান বাংলার সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে। যদিও পরস্পর বিপরীত এই ধারা দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল কিন্তু শেষোক্ত ধারণাই পরবর্তীতে প্রাধান্য পেয়ে যায়।

সে সময় রক্ষণশীল মুসলিম নেতৃবৃন্দ পূর্ব বাংলায় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তারা রেনেসাঁ সোসাইটি এবং বিভাগ পূর্ব সময়ের সাহিত্য সংগঠন নির্দেশিত নীতিমালা অনুসরণ করেন। বাংলা ভাষাকে ইসলামী বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করার জন্য আরবী, ফার্সী ও উর্দু শব্দের ব্যবহারকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা হয়। তদুপরি কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষায় পরিণত করার চেষ্টা চালায়।

এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে পূর্ব বাংলায় প্রচলিত বাংলা ভাষার মানোন্নয়ন, সহজীকরণ ও সংস্কারের বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৯ সালে একটি ভাষা কমিটি গঠন করে। কমিটির রিপোর্ট সে সময় প্রণীত হলেও অজ্ঞাত কারণে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

(পাঁচ)

এ সময় জাতীয় ভাষার প্রশ্নটিও এসে পড়ে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল জিন্নাহ পূর্ব-বাংলা সফর করেন। ঢাকা রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন যদিও পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩ দশমিক ৩ শতাংশের মাতৃভাষা ছিল উর্দু। নিজেদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত বাঙালীরা এই ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত করে। ইতোমধ্যে বাংলা ভাষার পক্ষে যে আন্দোলন গড়ে ওঠেছিল জিন্নাহর ঘোষণায় তা আরো জোরদার হয়। এইভাবে পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিরোধী সংগ্রামে রূপ নেয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলী বর্ষণের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে। উপায়ান্তর না দেখে সরকার ১৯৫৪ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম জাতীয় ভাষা ঘোষণা করে।

(ছয়)

১৯৫২ সালের ভাষা অন্দোলনের পর বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ ধারণা পুনরুজ্জীবিত হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা বিকাশে ভাষা আন্দোলনের অবদান ছিল

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য। ১৯৫২ সালে কুমিল্লায় পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন এবং ১৯৫৭ সালে কাগমারী সংস্কৃতি সম্মেলন ধর্মনিরপেক্ষতার ধারাকে জোরদার করে। সরকার সমর্থক মহলের বাংলা বিরোধী মনোভাবের বর্ণনায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, "আমাদের সাহিত্যিকদের একটি দল আরবী হরফে বাংলা লেখার পদ্ধতি চালু করার অতি উৎসাহী ধারণায় আবিষ্ট হয়ে আছেন। ...কেউ কেউ আবার এতদূর চলে গেছেন যে তারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং পশ্চিম বাংলার অন্যান্য লেখকের বই পড়া এবং তা নিয়ে আলোচনাকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কাজ বলা শুরু করে দিয়েছেন। কেউ কেউ অবিভক্ত বাংলার জুজুর ভয়ে নির্বোধের মত কথা বলে দারুণভাবে নিন্দিত হচ্ছেন।"

১৯৬১ সালে রবীঠাকুরের জন্মশত বার্ষিকীর সময় বাংলা বিরোধী এই মনোভাব আবার প্রকাশ পায়। সরকার এই অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালায়। জনগণও এর তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এক্ষেত্রে যে ধারণায় জনগণ উজ্জীবিত ছিল তা হচ্ছে বাংলা সাহিত্যকে তারা দীর্ঘ সময়ের বিবর্তনের ফলশ্রুতি বলে মনে করতো। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের উদ্যোগে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা গভীর মনযোগ সহকারে দুর্বোধ্য চর্যাগীতি থেকে আধুনিক কবিতা পর্যন্ত উপভোগ করেন। সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠানে যে সব কবি ও লেখকের কবিতা পাঠ, গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা, এবং গান পরিবেশিত হয় তারা ছিলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের মধ্যে জীবনানন্দ দাস, যিনি জন্মসূত্রে পূর্ব পাকিস্তানী ছিলেন কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছেন ভারতীয় হিসেবে। পূর্ব বাংলার যে রূপ তিনি কবিতায় তুলে ধরেছেন তা জীবনানন্দ দাসকে জনপ্রিয় করেছে এবং দেশব্যাপী বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিকাশের সাথে সাথে তার জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পায়।

এই পরিবেশে পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা আবুল মনসুর আহমদ ১৯৬২ সালে লিখেন, "পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলার বাঙালীদের ভাষা ও বর্ণমালা এক ও অভিন্ন। আমাদের সাহিত্য-ঐতিহ্যও একই। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম এবং সত্যেন দত্ত সবাই বাঙালীদের গৌরব ও অনুপ্রেরণা।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের মুনির চৌধুরী আরো জোরালোভাবে বলেন, "বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হাজার বছরের পুরানো। এই ভাষার মহান সৃষ্টিগুলো আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ।" এই ঘোষণা এমন এক সময় দেয়া হয় যখন পাক-ভারত যুদ্ধের (১৯৬৫) ফলে পাকিস্তানের পক্ষে প্রবল চেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল। গান, কবিতা, নাটক ও নৃত্যে তখন সাম্প্রদায়িকতা, ভারত বিরোধী মনোভাব এবং জেহাদের চেতনা পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চালানো হয়। ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার বন্ধ করার জন্য রেডিও

www.pathagar.com

পাকিস্তানকে নির্দেশ দেয়া হয় কারণ তা ছিল পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক প্রতিপাদ্যের বিরোধী।

এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে আবার প্রতিবাদ ওঠে ফলে সরকারকে সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করতে হয়। তথাপি এই প্রশ্নে ১৯৬৭ সালের ১ জুলাই নতুন করে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। ঢাকায় সাংস্কৃতিক কর্মীদের সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তী বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় পূর্ব পাকিস্তানে প্রথমবারের মত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় বাংলা নববর্ষ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান পালিত হয়। এসব অনুষ্ঠান জাতীয় রূপ লাভ করে। শহর এলাকায় যাত্রা পালা প্রদর্শিত হয় এবং লোক সাহিত্যের জনপ্রিয়তা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। লেখক ও কবিরা গ্রামীণ জীবন থেকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতে থাকে। স্থান, দোকান-পাট ও নবজাতকের নামকরণে বাংলা শব্দ ও বিশেষণ ব্যবহৃত হতে থাকে। এভাবে ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির পর হিন্দুদের হুমকি দূরীভূত হলে সাংস্কৃতিক পরিচয় বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন দেখা দেয়। এই প্রশ্ন হচ্ছে তারা কোন সংস্কৃতি অনুসরণ করবে– ইতিহাস নির্ধারিত ভাষাভিত্তিক স্থানীয় সংস্কৃতি নাকি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রাজনৈতিকভাবে নির্ধারিত ইসলামী ধারণাভিত্তিক সংস্কৃতি? এই প্রশ্নে সৃষ্ট বিরোধে ভাষাভিত্তিক বিবেচনা ধর্মীয় বিবেচনাকে ছাড়িয়ে যায়। এতে আঞ্চলিক সত্তা জোরদার হয় এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে তা পরিণতি লাভ করে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ড০ফজলুর রহমানের জন্ম ১৯৪৪ সালের ২৪ এপ্রিল পটুয়াখালীর গলাচিপা থানার কাউখালীতে। মরহুম অধ্যক্ষ আলী আকবর-এর দ্বিতীয় পুত্র ডঃ রহমান স্থানীয় জুবিলী হাইস্কুল থেকে ১৯৫৯ সালে এস এস সি, পটুয়াখালী কলেজ থেকে ১৯৬২ সালে এইচ এস সি পাশ করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে বি এ (সম্মান) এবং ১৯৬৬ সালে প্রত্নতত্ত্বসহ ইতিহাসে মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি লাভ করেন।

ঢাকা যাদুঘরের গবেষণা সহকারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৭০ সালে তিনি শিক্ষকতা পেশায় সরকারী চাকুরীতে যোগদান করে জগন্নাথ কলেজ, বি এম কলেজ, সা'দত কলেজ, পটুয়াখলী সরকারী কলেজ, বগুড়া মুজিবুর রহমান সরকারী মহিলা কলেজ এবং ঢাকা কলেজসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। তিনি ঢাকা সরকারী বাংলা কলেজের উপাধ্যক্ষ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবীনগর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের প্রোগ্রাম অফিসার, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিশেষজ্ঞ ও উপ সচিব (প্রশাঃ)-এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে শিক্ষা পরিদর্শক, গণশিক্ষা কার্যক্রমে উপ-পরিচালক (প্রশিঃ) এবং ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্টে উপ-পরিচালক (অপারেশন) হিসেবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের নবায়ন ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক।

পি এইচ ডি অভিসন্দর্ভ হিসেবে লেখা বর্তমান গ্রন্থ ছাড়াও তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকাশনা হচ্ছে বাংলাদেশে গণহত্যা, নবাব সিরাজদ্দৌলা-ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, ইংল্যান্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস ১৪৫৩-১৯৪৫। লেখকের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গাইডটি সর্বস্তরের শিক্ষা প্রশাসক, গবেষক, শিক্ষানুরাগী এবং প্রতিটি বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সাথে সম্পৃক্ত সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বিশেষ সমাদৃত হয়েছে।

১৯৯৭ সালে তিনি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন। চলতি সালে আন্তর্জাতিক সংস্থা আমেরিকান বায়োগ্রাফিক্যাল ইন্সটিটিউট ডঃ রহমানকে শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ম্যান অব দ্যা ইয়ার '৯৮ সম্মানে ভূষিত করেছে।

ISBN : 984-31-0234-3